শরীয়ত ও মা'রেফত

শরীয়ত ও মা'রেফত

বাংলা-ভারতের শ্রেষ্ঠ হাদী মুজাদ্দেদ-ই-জমান ফুরফুরা শরীফের
আ'লা হজরত পীর সাহেব কেবলার দোওয়া ও এজাজতে

শর্ষিণা আলীয়া মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পীর ও মোর্শেদ
মরহুম মওলবী মোঃ এমদাদ আলী সাহেব
এর সুযোগ্য সাহেবজাদা

মোঃ শামছুল হক
প্রোপ্রাইটর
করিম চেম্বার
..., মতিঝিল, বা/এ,
ঢাকা—১০০০

শর্ষিণা আলীয়া লাইব্রেরী
৩১, নবরায় লেন - ঢাকা-১

মোজাদ্দেদ-ই-জমান ফুরফুরা শরীফের হজরত পীর সাহেব-এর
খাছ দোওয়া ও এজাজতে

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবদুল মতীন কৃত

শরীয়ত ও মা'রেফত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বইখানি সংকলন ও সংশোধনে সুসাহিত্যিক মাওলানা
নূরুদ্দীন আহমদ সাহেবের অশেষ সাহায্যের জন্য
আমরা তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রকাশিকা ঃ
মোসাম্মৎ আয়শা খাতুন
২৬, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১

পরিবেশক ঃ
শর্ষিণা আলীয়া লাইব্রেরী
৩১, নবরায় লেন, ঢাকা-১
ফোন ঃ ২৫৭৩৭০

পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ঃ ১৩৮২ বাং

[সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত]

হাদিয়া ঃ সাড়ে সাত টাকা মাত্র।

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

* আমল ও তদ্‌বীর ৭'৫০
* খাব ও তা'বীর ৭'৫০
* মৃত্যুর আগে ও পরে ৭'৫০
* বেহেশত ও দোজখ ৭'৫০
* আদম ও শয়তান ৭'৫০
* দুন্‌ইয়া ও আখেরাত ৭'৫০
* ওয়াজ ও নছীহত ৭'৫০
* নামাজ ও রোজা ৭'৫০
* ওয়াজে ইছলাম ৭'৫০
* ওজিফায়ে আওলিয়া ৫'০০

॥ বাংলাদেশের সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে খোঁজ নিন ॥

মুদ্রনে ঃ আয়াজ খান, গুড লাক প্রেস, ২৫, আহ্‌সান উল্লাহ্‌ রোড, ঢাকা-১

কিতাবের পাতা মুক্তিযোদ্ধা

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
শরীয়ত	...	১—৮
ঈমানের রোকন দুইটি	...	৮—১১
ঈমান ও ইস্‌লাম	..	১১
মুসলমানের প্রতি সাতটি কাজ ওয়াজেব	...	১১—১২
ইস্‌লামে দশটি কাজ সুন্নাৎ	...	১২
ইস্‌লামে ছয়টি কলেমা	...	১২—১৪
ইস্‌লামী আকায়েদ	...	১৫—১৭
তরিকতের বয়ান	...	১৮—২০
তরিকা একটি জেহাদ	...	২০—২৩
হক্কুল ইবাদ বা মানুষের হক	...	২৪—২৫
হালাল ও হারাম	...	২৬—৩৩
সগীরাহ ও কবীরা গুনাহ	...	৩৪
সগীরাহ গুনাহ	...	৩৪—৩৫
কবীরা গুনাহ	...	৩৫—৩৬
বান্দার আমল-নামা	...	৩৭—৩৮
তওবা	...	৩৮—৪২
তওবার হকিকত	...	৪২—৪৩
তওবার অপরিহার্যতা	...	৪৩—৪৫
তওবা কবুল হওয়ার আলামত	...	৪৬—৪৯
তওবার-শর্ত	...	৪৯—৫১
তওবা হামেশা কায়েম হওয়া চাই	...	৫২
গুনাহের কাফ্‌ফারা এবং তওবার শ্রেণী বিভাগ	...	৫২—৫৩
কান্না-কাটি ও বিনয়	...	৫৩
তওবা না করিবার কারণ	...	৫৪—৫৬
আল্লাহর ভয়, রহমতের উম্মিদ	...	৫৬—৫৭
রহমতের প্রতি উম্মিদের ফজিলত	..	৫৭—৬০

বিষয়		পৃষ্ঠা
রজার তাৎপর্য	...	৬০—৬১
রজা ও রহমত	...	৬১—৬৫
আল্লাহর খওফ বা ভীতি	...	৬৫
ভীতির শ্রেণী বিভাগ	...	৬৫—৬৮
খওফ সম্পর্কে বুজুর্গানের উক্তি	...	৬৮—৬৯
খোদা-ভীতি হকিকত	...	৬৯—৭১
অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার উপায়	...	৭১—৭৩
পয়গম্বর ও ফেরেশতার খোদা-ভীতি	...	৭৩—৭৪
সাহাবীগণের খোদা-ভীতি	...	৭৪—৭৭
অর্জন ও বর্জনের বিষয়	...	৭৮—৮০
সৎ-স্বভাবের তাৎপর্য	...	৮০—৮২
সৎ-স্বভাব অর্জনের আরো তিনটি উপায়	...	৮২—৮৩
নফ্সের খাহেশ ও অনিষ্টকারিতার পরিচয়	...	৮৩—৮৭
নিয়ত	...	৮৭—৯০
নিয়তের রহস্য	...	৯০—৯২
নেক নিয়ত এবং বদ্ নিয়ত	...	৯২—৯৩
প্রথম দুই অবস্থার পরিচয়	...	৯৪—৯৫
কাজ নিয়তের সংগে	..	৯৬—৯৭
"মুবাহ" কাজের নিয়ত	...	৯৮—৯৯
নিয়ত দেলের বিষয়	...	৯৯—১০১
নিয়তের অন্যান্য দিক	...	১০২
খাঁটি নিয়ত ও উহার মর্ম	...	১০৩—১০৪
আবেদ ও শয়তান	...	১০৪—১০৬
ইখলাসের তাৎপর্য	...	১০৬—১০৭
ইখলাস অর্জনের উপায়	...	১০৮—১০৯
ইখলাসের দৃষ্টান্ত	...	১০৯—১১০
রিয়া এবং ইখ্লাস	...	১১০—১১১
সিদ্ক বা সততা	...	১১১—১১৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
মুহাসিবা ও মুরাকিবা	...	১১৪—১২০
মুরাকিবার প্রকার ভেদ	...	১২১—১২২
গুনাহের মুরাকিবা	...	১২৩
নিয়ামতের মুরাকিবা	...	১২৩
সৃষ্টি ও মখ্‌লুক সম্পর্কে মুরাকিবা	...	১২৩—১২৪
যুহদ বা সংযম	...	১২৪
মুহাসিবা	...	১২৪—১২৬
চতুর্থ মন্‌জিল মুয়াতিবা	...	১২৬—১২৯
পঞ্চম মন্‌জিল মুজাহিদা	...	১২৯—১৩০
রিয়াজত বা কৃচ্ছ্র সাধন	...	১৩০—১৩৫
আল্লাহর ধ্যান ও জিক্‌র	...	১৩৫—১৩৭
মুরাকিবা ধ্যানের রহস্য	...	১৩৭—১৩৮
চিন্তার বিষয় বস্তু	...	১৩৮—১৪১
বাতেনী বিষয়ের প্রতি চিন্তা	...	১৪১
ক্ষতিকর রিপু সমূহ	...	১৪১—১৪৬
মানুষের সৃষ্টি নৈপুণ্য	...	১৪৭—১৫৩
আল্লাহর নিদর্শন	...	১৫৪—১৫৬
জীব জগতে আল্লাহর নিদর্শন	...	১৫৬—১৬৪
তাওয়াক্কুল	...	১৬৫—১৬৮
তাওয়াক্কুলের হাকিকত	...	১৬৮—১৭১
তাওয়াক্কুল ও কাজ	...	১৭১—১৭২
তাওয়াক্কুল হারাম	...	১৭২—১৭৪
তাওয়াক্কুল ও সংযম	...	১৭৪—১৭৯
পরিবার পরিজনওয়ালা ব্যক্তির তাওয়াক্কুল	...	১৭৯—১৮১
ঘরে খাদ্য সঞ্চয় করা	...	১৮১—১৮২
তাওয়াক্কুলের নীতি	...	১৮২—১৮৭
রোগ ব্যাধির চিকিৎসার বেলায় তাওয়াক্কুল	...	১৮৭—১৮৯
চিকিৎসা পরিত্যাগ করা	...	১৮৯—১৯২

বিষয়		পৃষ্ঠা
রোগ গোপন রাখা	...	১৯৩—১৯৪
আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত ও সন্তুষ্টি	...	১৯৪—১৯৬
আল্লাহর মুহাব্বতের হাকিকত	...	১৯৭
মানুষের প্রকৃতি ও পঞ্চেন্দ্রিয়	...	১৯৭—১৯৯
আল্লাহর মুহাব্বত অর্জনের তরিকা ও উপায়	...	১৯৯—২০১
সৌন্দর্যের রহস্য	...	২০১—২০২
মানুষের ভালবাসার একমাত্র লক্ষ্য	...	২০৩—২০৯
আল্লাহর মা'রেফত ও মুহাব্বতের জন্য মানুষের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক নাই	...	২০৯—২১২
আল্লাহর মুহাব্বতের উপকরণ	...	২১২
ইশকে হাকিকীর শর্ত	...	২১২—২১৪
পূর্ণ মা'রেফত অর্জনের উপায়	...	২১৪—২১৬
মুহাব্বতের লক্ষণ	...	২১৬—২১৯
আল্লাহর প্রতি আগ্রহ	...	২১৯—২২২
উন্‌স ও এশ্‌তিয়াকের পার্থক্য	...	২২২—২২৪
রেজার ফজিলত ও হাকিকত	...	২২২—২২৪
রেজায়ে এলাহীর হাকিকত	...	২২৪—২২৯
কাজায়ে এলাহীর প্রতি ভিন্ন ধারণা	...	২২৯—২৩১
মৃত্যুর ইয়াদ	...	২৩১—২৩২
বুজুর্গানে দ্বীনের স্মরণ	...	২৩২—২৩৪
মৃত্যুকে ইয়াদ করার উপায়	...	২৩৪—২৩৫
মৃত্যুর ভীতি অন্তরে স্থান লাভ করা	...	২৩৫—২৩৬
হাদীস শরীফের নসিহত	...	২৩৭—২৪৪
আল্লাহর মারেফতের রহস্য	...	২৪৪—২৪৬
তাসাওয়াফের পরিচয়	...	২৪৬—২৪৭
আটটি বিশেষ গুণ	...	২৪৮—২৪৯
প্রকৃত সুফীর পরিচয়	...	২৪৯—২৫২
সুফীদের শ্রেণী	...	২৫২

মোঃ শামছুল হক
প্লাম্বার
করিম চেম্বার
৯৯, মতিঝিল, বা/এ,
ঢাকা—১০০০

বিষয়		পৃষ্ঠা
তাসাওফের জরুরত	...	২৫৩
তাসাওফ অর্থনীতি নিষ্ঠা	...	২৫৪
সুফীদের পোষাক-পরিচ্ছদ	...	২৫৪—২৬০
আত্ম-নিগ্রহ ও নিন্দার পথ	...	২৬০—২৬২
নিন্দা ভাজন হওয়ার শর্ত	...	২৬৩—২৬৪
খাঁটি পথ	...	২৬৪—২৬৫
চারি তরিকার সবক ও ওজিফা মুরীদ গণের কর্তব্য	...	২৬৫—২৬৬
নক্শবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সংক্ষিপ্ত ওজিফা		২৬৭—২৬৮
দরূদ শরীফ পড়িবার নিয়ত	...	২৬৮
ছওয়াব রেছানীর নিয়ম	...	২৬৮—২৬৯
লা হাওলা পড়ার ফজিলত	...	২৬৯—২৭০
লতীফা সমূহের পরিচয়	...	২৭০
লতীফার মোরাকাবার নিয়ম	...	২৭০—২৭১
ছোল্‌তানুল আজকার	...	২৭১
পাছে-আন্‌ফাছ	...	২৭১
তরিকত পন্থীদের নিম্ন বিষয় সমুহের প্রতি খেয়াল রাখিতে হইবে	...	২৭২
তওবার ফায়েজের নিয়ত	...	২৭২—২৭৩
নফি এছ্‌বাত করিবার তরতীব	...	২৭৩—২৭৪
দায়েরায়ে এমকানের মোরাকাবার নিয়ত	...	২৭৫—২৭৭
রহমতের ফায়েজের নিয়ত	...	২৭৭
দায়েরায়ে বেলায়েতে ছোগরার নিয়ত	...	২৭৭—২৭৯
দায়েরায়ে বেলায়েতে কোবরা	...	২৮০
কওছ বা শরহাচ্ছুদূরের মোরাকাবার নিয়ত	...	২৮০—২৮১
দায়েরায়ে বেলায়েতে উল্‌ইয়ার নিয়ত	...	২৮১
দায়েরায়ে কামালাতে নবুয়তের নিয়ত	...	২৮১—২৮২
দায়েরায়ে কামালাতে রেছালাতের নিয়ত	...	২৮২—২৮৩
চিশ্‌তিয়া তরিকার ওয়াজিফা	...	২৮৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফ পড়িবার নিয়ম	...	২৮৫
চিশ্‌তিয়া তরিকার লতীফা সমূহ	...	২৮৫
জেকের করিবার তরতীব	...	২৮৬
চিশতিয়া তরিকার পাছে-আন্‌ফাছ	...	২৮৬
চিশতিয়া তরিকার দশ মোকামের মোরাকাবা	...	২৮৭—২৮৮
চিশতিয়া তরিকার আয়াতের মোরাকাবা	...	২৮৮—২৯২
তৌহিদে আফ্‌য়ালীর মোরাকাবা	...	২৯৩
কাদেরিয়া তারিকার ওজিফা	...	২৯৩—২৯৪
কাদেরিয়া তারিকার লতিফার বিবরণ	...	২৯৪
জরবী জেকেরের নিয়ম সমূহ	...	২৯৪—২৯৬
রহমতের ফায়েজ	...	২৯৬—২৯৭
হাকিকতে ছোলতান্নাছিরা	...	২৯৭
হাকিকতে মাকামাম্‌ মাহ্‌মুদা	...	২৯৭
খাছ তাওয়াজ্জোহ ইলাল্লাহ	...	২৯৮
দাওরে কাদেরী	...	২৯৮—২৯৯
হুজুরী ও মাইয়্যাতের মোরাকাবা	...	২৯৯
মাইয়্যাতের মোরাকাবা	...	২৯৯
ওজিফার তাৎপর্য	...	৩০০
ওজিফা ও জিক্‌রের ফজিলত	...	৩০০—৩০৩
জেক্‌র ও ওজিফা	...	৩০৩
ওজিফা তরক্‌কারীদের আফ্‌সুস	...	৩০৩—৩০৪
গননা করিয়া তস্‌বীহ পাঠ	...	৩০৪
রসুলুল্লাহ্‌ (দঃ) এর তস্‌বীহ পাঠ	...	৩০৪—৩০৫
ওজিফা নিয়মিত পাঠ	...	৩০৫—৩০৬
আওলিয়াগণের ওজিফা	...	৩০৬—৩০৭
ওজিফার সওয়াব রেছানী	...	৩০৭
দোওয়া-মোনাজাতের ফজিলত ও নিয়ত	...	৩০৮—৩১২

بسم الله الرحمن الرحيم

বিস্‌মিল্লাহের রাহ্‌মানির রাহিম

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুছাল্লি আলা রাছুলিহিল কারীম

প্রথম অধ্যায়

শরীয়ত

পবিত্র কোরআন এবং হাদীস শরীফ দ্বারা ইসলামের যে বিধান আমাদের উপর বিধিবদ্ধ হইয়াছে উহাই এক কথায় শরীয়ত নামে অভিহিত।

কলেমা অর্থাৎ ঈমান, নামাজ, রোজা, জাকাত এবং হজ্জ, শরীয়তেরই নির্দেশ কোরআন ও হাদীস দ্বারা উপরোক্ত আদেশগুলি মুসলমানের প্রতি ফরজ হইয়াছে।

উহা ব্যতীত জেন্দেগীর অন্যান্য কাজ কারবার, যেমন ব্যবসা বাণিজ্য, ক্রয়, বিক্রয় লেনদেন, বিবাহ শাদী, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি যত রকম কাজ, কারবার আছে—উহাও শরীয়তের অন্তর্গত—মোট কথা, জেন্দেগীর কোন কাজই শরীয়তের বাহিরে নাই। প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জীবন শরীয়তের বিধানের অন্তর্গত।

এই হিসাবে শরীয়তের দুই দিক। এক হইল আমর, অর্থাৎ যাহা করণীয় অর্থাৎ যাহা করিতে হইবে। আর একটি হইল নেহী, অর্থাৎ যাহা বর্জনীয় আর আল্লাহুর রসূলের নিষেধ অনুসারে যাহা ফিরিয়া থাকিতে হইবে। উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে। কিন্তু সে আলোচনা এখানে সম্ভব হইবে না। যেহেতু এই পুস্তকে মারেফতের আলোচনার প্রধান বিষয় সুতরাং শরীয়ত সম্পর্কে সংক্ষেপ কিছু আলোচনা করা হইবে।

ঈমান—শরীয়তের সর্বপ্রথম নির্দেশ হইল ঈমান। ঈমান সম্পর্কে জ্ঞান থাকাই মুমেনের পরিচয়। যদি কাহারও ঈমানে ত্রুটি থাকে, তবে সে মোমেন হইতে পারে না। সেই হিসাবে ঈমানই হইল দ্বীনের মূল ভিত্তি। ঈমান ব্যতীত কোন নেকী এবং এবাদত খোদার নিকট কবুল হইবে না। কোন পুরুষ বা স্ত্রী যদি ঈমান সম্পর্কে বে-খবর থাকে তবে তাহাদের নিকাহ্ অবৈধ হইয়া যাইবে। সেই অবস্থায় অর্থাৎ ঈমান সম্পর্কে অজ্ঞতার অবস্থায় সন্তান জন্মগ্রহন করিলে অবৈধ সন্তান হইবে। তাহার হাতের জবেহ খাওয়া জায়েজ হইবে না। ঈমান সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি যদি হালাল পশু জবেহ করে উহা হারাম হইয়া যাইবে।

অবশ্য বয়সে না বালেগ হইলে তাহার প্রতি কোন কিছু ফরজ নহে। তবে সন্তানকে সাত বৎসরের সময় নামাজের জন্য তাম্বিহ্ করিবে। আর দশ বৎসর বয়স হইলে তখন ছেলেকে

নামাজের জন্য প্রহার করিবে। বালেগ হওয়ার পরে সর্বপ্রথম খোদাকে চিনা ফরজ হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য বালেগ, বুদ্ধিমান অর্থাৎ পাগল না হয়। পাগলের প্রতি না বালেগের হুকুম হইবে।

খোদার পরিচয় এই ভাবে জানিতে হইবে। আল্লাহুর কোন তুলনা নাই। তিনি কোন কিছুর ন্যায় নহেন। কোন বস্তুর সহিত আল্লাহুর তুলনা হয় না। আল্লাহর দশটি সেফাতের সহিত আল্লাহকে চিনা দরকার। আল্লাহর গুণাবলী বা গুণ-বাচক নাম ৯৯টি উহাই সংক্ষেপে সাতটির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেই সাতটি সেফাত হইল:—

(১) হায়াত, (২) কুদ্‌রত, (৩) কালাম, (৪) বাছার (৫) সামাউ, (৬) তাক্‌বীন, (৭) এরাদা,—

আল্লাহর উপরোক্ত সেফাত সমুহের মোটামুটি পরিচয় হইল এই—

১। হায়াত অর্থ জেন্দা কিন্তু আমাদের মত আত্মা, মন প্রাণ এবং শরীর বিশিষ্ট নহে।

২। কুদরত অর্থ:—কাদের বা শক্তির মালিক।

৩। কালাম অর্থ কথা বলা, আল্লাহু তায়ালা কালাম করেন কিন্তু জিহ্বার সাহায্যে নহে। কালাম তাহার একটি অবিচ্ছেদ্য সেফাত।

৪। বাছার অর্থ দর্শন বা দেখা, ইহাও আল্লাহর পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৫। সামাউন বা শ্রবণ হইতে আল্লাহর সেফাত যাহা কখনও তাঁহার জাত হইতে পৃথক হয় না।

৬। তাক্‌বীন অর্থাৎ সৃষ্টি করা। ইহা আল্লাহর সেফাত ইহা ব্যতীত কখনও খোদার পরিচয় সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

৭। ইরাদা অর্থ ইচ্ছা—ইহাও আল্লাহর জাতের পরিচয় সেফাত। উপরোক্ত সাতটি সেফাত ব্যতীত আল্লাহর আর দুইটি সেফাত আছে। সেই দুইটি সেফাতকে তনজিহী সেফাত বলে। উহা আল্লাহ বে-আয়েব অর্থাৎ সকল দোষত্রুটি হইতে পবিত্র এবং আর একটি হইল আল্লাহর বেমেছেল হওয়া অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির কোন কিছুর তুল্য নহেন।

উপরোক্ত জাতও সেফাতের পরিচয়ের সাথে আল্লাহুর প্রতি ঈমান আনা ফরজ। ঈমানের অর্থ হইল হযরত রাসূলে করীম (দঃ) আল্লাহর নিকট হইতে যাহা আনায়ন করিয়াছেন উহা মুখে স্বীকার এবং দেলে বিশ্বাস করা। ঈমান কোন অবস্থায় মোমেন হইতে পৃথক হয় না। যেমন ধরুন, স্ত্রীলোকের হায়েজ নেফাছ অবস্থায় তাহার উপর হইতে রোজা রহিত হয়। কিন্তু শেরেক এবং কোফরী না করা পর্যন্ত ঈমান কখনও মু'মেন হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না।

ঈমান দুই প্রকার :—এক প্রকার হইল মুজমাল। কলেমায়ে মুজমালে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

অর্থঃ আল্লাহ তায়ালা তাহার স্বত্ত্বা বা জাত এবং সেফাত বা পরিচয়ের সহিত যেরূপ রহিয়াছেন তেমনি তাহার প্রতি ঈমান আনিতেছি এবং তাহার হুকুম আহকাম মানিয়া লইতেছি।

আল্লাহর বিশেষ সেফাত সমূহ উপরে মোটামুটি উল্লেখ করিয়াছি। আল্লাহর জাত ও সেফাত সম্পর্কে মোটামুটি শিক্ষা না থাকা ঈমানের পক্ষে বিপদজ্জনক কেননা সঠিক জ্ঞান না থাকার দরুন আল্লাহ সম্পর্কে মনে কোন বস্তুর কল্পনাও আসিতে পারে। ইহা শেরেকী এবং কোফরী। সুতরাং আল্লাহর জাত এবং সেফাত সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা উপরে করিয়াছি।

দ্বিতীয় প্রকারের ঈমান হইল, ঈমানে মুফাস্‌সল। উহার অর্থ হইল জাত ও সেফাত সহ আল্লাহর প্রতি, তৎপর ফেরেশতা, আল্লাহর কেতাব সমূহ, আল্লাহর প্রেরিত পয়গাম্বর, কেয়ামতের দিন, তকদীরের ভাল মন্দ এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান আনা।

তকদীর একটি অতি জটিল বিষয়, এই সম্পর্কে আলোচনা করা চাই না। জ্ঞানী বুজর্গেরা বলিয়াছেন তকদীর একটি গভীর সমুদ্র যে ইহাতে ডুবিয়াছে সে হারাইয়া গিয়াছে। ফেরেশতাদের মধ্যে হযরত জিব্‌রীল, মিকাইল, আজরাইল এবং ইস্রাফীল প্রধান। ইহা ছাড়া বেহেশতের দ্বার রক্ষক রেদওয়ান এবং দোজখের দারোগা মালেক ফেরেশতার নাম জানা যায়।

ফেরেশতাদের পরিচয় আল্লাহ কোরআন শরীফে দিয়াছেন।

"তাহারা আল্লাহর আদেশ লঙ্গন করেনা—সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনেই রত থাকেন। ইহা ব্যতীত ফেরেশতাদের আরও বহু পরিচয় কোরআন শরীফে রহিয়াছে। তাহাদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

আল্লাহর কেতাবের মধ্যে প্রধান চারিখানি অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) প্রতি তওরাত, হজরত দাউদ (আঃ) এর প্রতি জব্বুর, হজরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি ইঞ্জিল এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর প্রতি কোরআনই প্রধান। ইহা ব্যতীত বহু পয়গাম্বরের প্রতি আল্লাহ সহীফা নাজিল করিয়াছেন। উহারও সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে আল্লাহর প্রেরিত জ্ঞাত সকল কেতাবের প্রতিই ঈমান আনিতে হইবে।

এইরূপ আল্লাহ প্রেরিত নবীও রসূলগণের সংখ্যাও একমাত্র আল্লাহই জানেন। তাহাদের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর। তাঁহার প্রতি আল্লাহ কোরআন যোগে দ্বীন ইসলাম নাজিল করিয়াছেন।

ঈমানে মুফাস্‌সলের মধ্যে বর্ণিত ঈমানের বিষয়গুলির মধ্যে চারিটি বিষয় হইল গায়র মখ্‌লুক অর্থাৎ যাহা স্মৃষ্ট নহে। যেমন আল্লাহর, জাত, তিনি সারা জাহানের স্মৃষ্টিকর্তা। দ্বিতীয় আল্লাহর সেফাত উহা খোদাও নহে আবার সূর্য্যের আলো সূর্য্য নহে আবার সূর্য্য হইতে পৃথকও নহে।

ঈমানে মুফাস্‌সলে যে সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান আনিতে হইবে, উহার মধ্যে চারিটি গায়র মখ্‌লুক, অর্থাৎ স্মৃষ্ট জিনিস নহে। যথা—১। আল্লাহর জাত, ২। আল্লাহর সেফাত, ৩। খোদার কালাম, ৪। তকদীর, অপরগুলি মখলুক অর্থাৎ স্মৃষ্ট পদার্থ। যেমন ফেরেশতা পয়গাম্বর ও কেয়ামত।

আল্লাহর প্রতি তিনটি বিষয়ে ঈমান রাখা ফরজ।

১। আল্লাহর জাত বা স্বত্বার প্রতি ঈমান, ২। আল্লাহর বেমেসেল অর্থাৎ কোন সৃষ্ট বস্তুর সহিত তুলনীয় না হওয়ার প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর সেফাত সমুহের প্রতি ঈমান।

ঈমানের শর্ত ঃ—

ঈমানের শর্ত ছয়টি। ১। গায়েবের প্রতি ঈমান আনা। ইলমে গায়েব আল্লাহর সেফাতের অন্তর্গত বিশ্বাস করা।

৩। আল্লাহর রহমতের প্রতি ভরসা রাখা। ৪। আল্লাহর আজাবের প্রতি ভয় রাখা। ৫। হালালকে হালাল জানা, হারামকে হারাম জানা।

গায়েবের প্রতি ঈমান আনার অর্থ—আল্লাহকে না দেখিয়া ঈমান আনা। গায়ব—আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য ইহার তাৎপর্য এই যে, যদি কেহ গণনা করিয়া বা ফল দ্বারা গায়েব বলে, উহার প্রতি বিশ্বাস করিলে কাফের হইতে হইবে।

খোদার রহমতের প্রতি ভরসা রাখার অর্থ এই যে, কেহ গুনাহ্ করিয়া আল্লাহর রহমত ও বখশেষ হইতে নিরাশ না হওয়া। আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হওয়া কোফরী। কেননা, আল্লাহতায়ালা ফরমাইয়াছেন—

"তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইওনা।" আল্লাহর আজাব হইতে নির্ভয় হইবে না। আল্লাহর আজাব হইতে নির্ভয় হওয়া কুফরী। এইরূপ আল্লাহ যাহা হালাল করিয়াছেন উহাকে

হারাম মনে করা কুফরী। আবার আল্লাহ যাহা হারাম করিয়া দিয়াছেন উহা হালাল মনে করাও কুফরী।

ঈমানের রোকন দুইটি

ইকরার এবং তস্‌দীক। ইক্‌রার অর্থ মুখে স্বীকার করা। তস্‌দীক অর্থ দেলে বিশ্বাস করা। কোন কেতাবে লিখিত আছে।

কোন স্ত্রী লোকের নিকট ঈমানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে যদি সে উহা বলিতে না পারে, তবে সে তার স্বামীর জন্য হারাম হইবে। এইরূপ যদি কোন কসাইর নিকট ঈমানের সেফাত জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে না পারে তবে তাহার জবেহ করা জানোয়ার হারাম—উহা খাওয়া জায়েজ হইবে না।

মুসলমানের প্রতি কর্তব্য ঃ—

১। মুসলমানের খুন হারাম অর্থাৎ মুসলমানকে হত্যা করা হারাম। ২। উহার মাল হারাম অর্থাৎ কোন মুসলমানের মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ হারাম। অকারণে কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া জায়েজ নহে। ৩। কোন মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারনা পোষণ করা হারাম।

মুসলমান চিরকাল দোজখে থাকিবে না। কেননা, সকলে শাফায়াত লাভ করিবে এবং বেহেশতে দাখেল হইবে। তবে

শর্ত এই যে, দুনইয়া হইতে তাহার ঈমানের সহিত বিদায় হওয়া চাই। কাফের অনন্তকাল দোজখে থাকিবে।

ঈমানের ফরজ দুইটি :—

১। ঈমান আনা, ঈমান রক্ষা করা। অর্থাৎ মুখে কোন কুফরী কালাম উচ্চারণ না করা।

ঈমান সম্পর্কে ১২টি কাজ ওয়াজেব :— । আলেম লোকের সঙ্গ লাভ করা, ২। ফাসেক বদকার লোক হইতে দূরে থাকা, ৩। পিপাসিত ব্যক্তিকে পানি দান করা, ৪। রুগীর পরিচর্য্যা, ৫। ইয়াতিমের মাথায় স্নেহের হাত স্পর্শ করান, ৬। দরিদ্রের প্রতি দয়া করা, ৭। কাহারও আগুনের প্রয়োজন হইলে তাহাকে আগুন দেওয়া, ৮। মৃতকে গোসল দেওয়া, ৯। রাস্তা হইতে পাথর, কাঁকর, কাঁটা ইত্যাদি দূর করা, ১০। পথে কোন ময়লা নাপাকী থাকিলে উহা দূর করা, ১১। কাবা গৃহ দর্শন করিলে জেয়ারত করা ১২। নিজ পরিবার বর্গকে সালামের নিয়ম কানুন শিক্ষা দেওয়া। উপরোক্ত কাজগুলি প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি ওয়াজেব। এই অর্থে উহা ঈমানের ওয়াজেব অর্থাৎ মু'মেনের প্রতি ওয়াজেব রূপে পরিগনিত।

ঈমান রক্ষার ৩টি শর্ত :—১। ঈমানের প্রতি খুশী থাকা, ২। ঈমান লোপ পাইলে দুঃখিত হওয়া, ৩। ঈমানের বিলোপ-কারী বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকা।

হজরত নবী করীম (দঃ) আল্লাহর নিকট হইতে যে দ্বীন আনিয়াছেন ঈমানই হইতেছে উহার বুনিয়াদ বা ভিত্তি। উহা মানুষকে এমন এক নিখুঁত চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করে যেখানে ফাঁকী নাই। স্বচ্ছ আয়নার সম্মুখে যেমন চেহারার সব কিছু দেখা যায়, তেমনি ঈমান এক পরিষ্কার আয়না-আল্লাহর প্রতি নিখুঁত বিশ্বাস, উহাতে কোথাও এতটুকু ফাঁকী নাই। আল্লাহর প্রতি আল্লাহর দ্বীনের প্রতি অকপট, ঈমান ও উহার আনুসাঙ্গিক কাজগুলি ঈমানের পরিপুরক।

মাহ্‌বুবুল আজকার নামক কেতাবে লিখিত আছে, ছবর ও শোকরের মধ্যে ঈমানের অবস্থিতি, আল্লাহ এক, একক, ইহা মুখে উচ্চারণ করা এবং দেলে একিন করার নাম তওহীদ। ঈমান আল্লাহর এক দান বিশেষ। কলেমা তৈয়্যব ইহার শ্রেষ্টাংগ, অর্থাৎ মস্তক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হইতেছে ঈমানের ধর বা কলেবর। কোরআন হইতেছে ঈমানের দেল। সত্য বা ইসলাম হইতেছে ঈমানের নুর। মিথ্যা বা কপটতা হইতেছে ঈমানের পক্ষে অন্ধকার। নামাজ ত্যাগ করা ঈমানের বিলুপ্তির কারণ। ঈমানের লজ্জত বা স্বাদ হইতেছে পবিত্রতা। ঈমানের লক্ষণ হইল আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকা, আল্লাহর রহমতের আশায় আশান্বিত থাকা।

ঈমানের শরীয়ত হইল হালালকে হালাল জানা এবং হারামকে হারাম জানা।

ঈমানের মাহাত্ম্য হইল আল্লাহর জেকের। হায়া অর্থাৎ

লজ্জা হইল ঈমানের ভূষণ বা লেবাছ। রাজা,—হইতেছে ঈমানের ফল এলেম ঈমানের বীজ। তাক্ওয়া হইতেছে ঈমান বৃক্ষের পাতা। ঈমানের মগজ হইল দোওয়া, উহার মূল ইসলাম এবং উহার গৃহ হইল দেল।

ঈমান ও ইসলাম

ঈমান ও ইসলাম একই সত্যের দুইটি নাম। যে মুসলমান সেই-ই-মো'মেন এবং যে মো'মেন সেই-ই মুসলমান। ইসলাম অর্থ আল্লাহর সম্মুখে আনুগত্য সহকারে মাথানত করিয়া দেওয়া। ইসলাম অর্থাৎ শরীয়তের রোকন পাঁচটি। ১। কালেমা-ই-শাহাদত, ২। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ৩। রমজান মাসের রোজা ৪। ধনের যাকাত ৫। সারা জীবনে একবার হজ্জ। ইসলামের এই পাঁচটি রোকনের কোন একটি অস্বীকার করিলে কাফের হইবে। আর যদি অস্বীকার না করিয়া প্রতি পালন করে বা পরিত্যাগ করে তবে ফাসেক হইবে। শরীয়তে তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে, সে শাস্তির উপযোগী।

মুসলমানের প্রতি সাতটি কাজ ওয়াজেব

১। বেতেরের নামাজ পড়া, ২। কোরবানী করা, ৩। ছদকায়ে ফেত্তর দেওয়া ৪। ওম্‌রাহ করা, ৫। নিকটাত্মীয়

দরিদ্র হইলে তাহাকে ভরন পোষণ দেওয়া, ৬। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর তাবেদারী করা, ৭। পিতামাতার অনুগত হওয়া।

ইসলামে দশটি কাজ সুন্নাৎ

১। মাথা মুণ্ডন করা, ২। নখ কাটা, ৩। খাত্না করা, ৪। মোচ ছোট করা, ৫। লজ্জাস্থান ছাফ করা, ৬। ইস্তেন্জা করা, ৭। কুলী করা, ৮। মেসওয়াক করা, ৯। বগলের পশম দুর করা, ১০। নাকে পানি দেওয়া।

যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, তুমি কি মুসলমান ? উত্তরে বলিবে "আল্হামদু লিল্লাহে।" আমি নিশ্চয়ই মুসলমান। যদি বলে যে তুমি কবে হইতে মুসলমান ? বলিবে, রোজ-ই মিসাক হইতে।"

এহ্সানের অর্থ :—

এহসান অর্থ আল্লাহর এবাদত। এইভাবে করা যেন আল্লাহ তোমাকে দেখিতেছেন। যদি এত দুর ধারণা না হয়, তবে অন্ততঃ এতটুকু ইয়াকীন রাখিবে যে, আল্লাহ তোমাকে দেখিতেছেন।

ইসলামে ছয়টি কলেমা

১। কলেমা তৈয়্যেবা ২। কলেমায়ে শাহাদাত ৩। তাওহীদ ৪। কলেমায়ে তামজীদ ৫। কলেমায়ে এস্তেগফার ৬। কলেমায়ে রদ্দে কুফর। এই কলেমা সমূহ সর্ব সাধারণের জানা আছে মনে করিয়া এইখানে উল্লেখ করিলাম না।

কোফরী :—

আল্লাহর সকল বা কোন সেফাত অস্বীকার করা, এবং ইসলামের কোন বিধানকে অস্বীকার, অমান্য বা ঘৃণা করার নাম কুফরী। কেতাবে লিখিত আছে, কুফরী দ্বারা সব সৎ কাজ আল্লাহর নিকট বাতিল হইয়া যায়। ভুলক্রমে মুখে কুফরী কলেমা উচ্চারণ করিয়া ফেলিলে উহাতে ঈমান নষ্ট হয় না তবে এইরূপ ভুলের জন্য তওবা এস্তেগফার করা চাই।

জানিয়া শুনিয়া কোন কুফরী কালাম উচ্চারণ করিলে উহাতে কাফের হইবে। পৈতা পরিলে এবং কোরআন শরীফ আগুনে নিক্ষেপ করিলে কাফের হইবে। কুফরী কালামগুলি হইতে সতর্ক থাকা উচিত যেন কখনও উহা মুখ হইতে বাহির না হয়।

শেরক :—

আল্লাহর জাত এবং সেফাতের সাথে এবং ইবাদতে অন্য কোন সৃষ্ট মখলুককে অংশীদার করা শেরক। উহা দুই প্রকার। একপ্রকার হইল শেরকে জলী বা প্রকাশ্য শেরক। যেমন বোৎ পুজা, অগ্নি পুজা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও নামে মানৎ করা।

দ্বিতীয় প্রকার শেরক হইল, শেরকে খফী বা বাতেনী শেরক। যেমন ঔষধকেই রোগের আরগ্যের কারণ ধারণা করা—তবে রোগ আরগ্যেকার একমাত্র আল্লাহ এবং ঔষধ উহার উপলক্ষ মাত্র মনে করিলে কাফের হইবে না। এইরূপ লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করাও শেরকে খফী। ইহাতে গুনাহ হয় এবং

ছওয়াব লাঘব হয়। নেফাক অর্থাৎ কপটতা, ইহা দুই প্রকার। এক প্রকার হইল ঈমান সম্পর্কে নেফাক অর্থাৎ মুখে ঈমান আনা এবং দেলে স্বীকার না করা। এই প্রকার নেফাক বা মোনাফেকী কুফরী।

দ্বিতীয় প্রকার নেফাক গুনাহ্। উহা চারি প্রকার :—

১। ইচ্ছাপূর্বক ওয়াদা খেলাফ করা। ২। আমানত খেয়ানত করা, কিংবা কাহারও গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া। ৩। মিথ্যা কথা বলা। ৪। বাজে কথা বলা, অবশ্য কয়েক স্থানে মিথ্যা বলা জায়েজ আছে।

কোন জালেম ব্যক্তি জুলুম অত্যাচার করিবার উদ্দেশ্যে কাহাকেও খোঁজ করিলে উহা জানা সত্বেও গোপন করা ও পরস্পরের কলহ ঝগড়া মিটাইবার জন্য মিথ্যা বলা জায়েজ আছে।

———

মোঃ শামছুল হক
প্রো:র
করিমচেম্বার
৯৯, মতিঝিল, বা/এ
ঢাকা—১০০০
মোঃ শামছুল হক
প্রোপ্রাইটর

ইসলামী আকায়েদ

মু'মেন মুসলমানকে যে সকল বিষয় স্থির বিশ্বাস রাখিতে হইবে উহাকে ইসলামের আকায়েদ বলে। এই সকল বিষয়ে অজ্ঞতা ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতারই নামান্তর।

আকায়েদের বিষয়গুলিতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতে হইবে। উহার যে কোন একটি বিষয় অবিশ্বাস বা অস্বীকার করিলে ঈমান থাকিবে না।

কবর আজাব ॥

কবর আজাব সত্য। কবরের চাপ সত্য। কবরে প্রত্যেক মৃতের নিকট মুনকার ও নাকীর ফেরেশতাদ্বয় সওয়াল করিবে ইহা সত্য। তবে নবীগণের প্রতি সওয়াল হইবে কিনা এই বিষয় মতভেদ আছে। কাফের, মোশরেক এবং গুনাহগার মুসলমানদের প্রতি কবরে আজাব হইবে।

হিসাব ও মিজান ॥

কেয়ামতে প্রত্যেক নেকী বদীর হিসাব হইবে। এবং উহা মিজানে অর্থাৎ পাল্লায় ওজন করা হইবে। মুসলমানদিগকে ডাহিন হাতে, কাফেরদিগকে পিছন দিক হইতে, বাম হাতে আমল নামা দেওয়া হইবে। কেয়ামতে গুনাহ্গার ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্ব-স্ব গুনাহের সাক্ষ্য দিবে। পুলছিরাত সত্য। উহা চুল অপেক্ষা চিকন এবং তলোওয়ার অপেক্ষা ধারাল হইবে।

বেহেশত ও দোজখ এবং খোদার দর্শন লাভ সত্য। পয়গম্বরগণ আল্লাহর খাছ বান্দা। কোন ওলী যত বড়ই হউক না কেন, কোন নবীর সমকক্ষ হইতে পারে না। হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) তামাম পয়গম্বর হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পরে আর কোন নবী হইবে না। হজরত আবুবকর সিদ্দীক সকল সাহাবী হইতে প্রধান। তৎপর হজরত ওমর (রাঃ), তৎপর হজরত ওসমান (রাঃ), তৎপর হজরত আলী (রাঃ)। প্রথমোক্ত তিন খলিফা হইতে হজরত আলী (রাঃ)কে শ্রেষ্ঠ মনে করা গোমরাহী এবং ইসলামের সার্বজনীন ধারণার বিরোধী।

সাহাবীগণের খেলাফত অস্বীকারকারী কাফের। নেক্‌কার এবং গুনাহ্‌গার সকলের পিছনই নামাজ জায়েজ।

ছোট বড় সকলের জন্যই জানাজার নামাজ পড়া জায়েজ। মৃতের জন্য দোওয়া সদকা মৃতের রুহে পৌঁছে। পয়গম্বর এবং নেককার মুসলমানগণের শাফায়াতে গুনাহ্‌গার মুসলমানদের পক্ষে হক কবুল হইবে। আসমান হইতে ফেরেশতা অবতীর্ণ হইয়া বান্দার আমল নামা আসমানে নিয়া যাওয়া সত্য। নেককার বদকার হইতে পারে, এবং বদকার ও নেককার হইতে পারে। নবীগণ তামাম মুসলমান হইতে এবং তামাম মুসলমান কাফের ও কাফেরগণ হইতে জ্ঞানী। প্রত্যেক মুসলমান একান্ত খাঁটি মনে এই ধারণা পোষণ করিবে।

আমি আল্লাহর বান্দা, হজরত নবী করীম (দঃ)-এর উম্মত, চারি খলিফার অকৃত্রিম বন্ধু এবং আল্লাহ ও রসূলের অনুগত,

সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর কায়েম এবং ইমাম আজমের মাজহাবের প্রতি কায়েম রহিয়াছে। এবং যে সকল কাজ বিদ্আত তাহার প্রতি বেযার ও নারাজ রহিয়াছে। এই আকিদার উপরই যেন যিন্দা থাকি এবং এই আকিদার উপরই যেন মৃত্যু হয়।

নিজের ঈমান সম্পর্কে কোনও মুসলমানেরই সন্দেহ থাকা চাই না। অর্থাৎ এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, ইন্শা আল্লাহ আমি মুসলমান।

আকায়েদের সাথে জড়িত বিষয়গুলিই হইতেছে ইসলামের মূল ভিত্তি বা বুনিয়াদ।

এই বিষয় বিস্তারিত এই পুস্তকে আলোচনা করা হইল না। তারিকতের আলোচনাই এই পুস্তকের প্রধান অঙ্গ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তরিকতের বয়ান

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে ইরশাদ করিয়াছেন :—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ •

উচ্চারণ :—ওয়ামা খালাকৃতুল জিন্না ওয়াল ইন্‌ছা ইল্লা লিয়াবুদুন।

অর্থাৎ :—আমি জ্বিন এবং ইন্‌সানকে একমাত্র ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে পয়দা করি নাই।

কোন কোন আরিফ বা খোদাতত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি এই ইবাদতের অর্থ বলিয়াছেন, আল্লাহর মারেফত অর্থাৎ আল্লাহকে বিশেষ ভাবে জানা ও তাহার মুহাব্বত অর্জন করা। জানা আবশ্যক যে, ইহা খুব সামান্য কথা নহে। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই আল্লাহকে অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব এবং তাহাকে লাভ করা সম্ভব হইতে পারে। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে কতকগুলি স্তর অতিক্রম করিতে হইবে।

প্রথমতঃ আল্লাহকে জানিবার এবং তাহার প্রতি ভালবাসা অর্জন করিবার জন্য দৃঢ় ইরাদা করিতে হইবে।

অতঃপর নিজ জীবনকে শরীয়তের পুর্ণ পায়বন্দ করিয়া আল্লাহ ও রসূলের তাবেদারী পুর্ণ করিতে হইবে।

ইহার পর মনে কঠিন এবং প্রবল রিপুগুলিকে বশীভূত করিতে হইবে।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহর মা'রেফত অর্জনের পথে মানুষের আভ্যন্তরীন কু-রিপু গুলিই বিষম অন্তরায়। উহারা সবই এ দলের সৈন্য। নফ্‌স সর্বদাই এই কুপ্রবৃত্তি গুলিকে উত্তেজিত করিতে থাকে।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন. ইন্নান্‌ নাফ্‌সাল আম্মারাতা লা বিস্‌স্বয়ে''। অর্থাৎ নফ্‌স আম্মারা সর্বদা মানুষকে মন্দের দিকে প্ররোচনা দিয়া থাকে। মানুষকে কু-পথে প্ররোচনা দেওয়ার আরেকটি শত্রুর কথাও আল্লাহ জানাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ-পাক আমপারার সূরা নাসে ঘোষণা করিয়াছেন—"বল, (হে নবী আমি মানুষের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাহিতেছি, মানুষের মালেকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং মানুষের মা'বদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি—খন্নাসের ওয়াস্‌ওয়াসার ক্ষতি হইতে, যে মানুষের অন্তরে কু-মন্ত্রণা দেয়, তাহা জিন ও মানুষের মধ্যে (রহিয়াছে)।" অতএব, দেখা যাইতেছে নফ্‌স আম্মারা এবং খান্নাস প্রভৃতি বাতেনী দুশমনেরা মানুষের অন্তরে কু মন্ত্রণা দেয়—ইহার অর্থ আল্লাহর নির্দেশিত "সিরাতুল মুসতাকীম" হইতে গোমরাহী ও শয়তানের পথের দিকে আকৃষ্ট করে। এই স্তরটিই হইতেছে আল্লাহর মারেফত অর্জনের পথে কঠিন সংগ্রামের স্তর।

এই সংগ্রামই ইসলামের মর্মকথা। অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় কায়েম থাকিতে হইলে এই স্তরের রহস্য সম্যক জানিতে হইবে। কারণ, এই স্তরের রহস্য জানা না থাকিলে ঈমান ও আমল খালেস রাখা খুবই কঠিন। এই জন্য তরিকা একটি জেহাদ।

তরিকা একটি জেহাদ

তরিকার রাস্তা একটি কঠোর সাধনা। একটি জীবন ব্যাপী জেহাদ। এই জেহাদ আল্লাহর পথে ঈমানদারকে অগ্রসর করে। জাহেরী জেহাদ যেমন ইসলামী রাজ্য রক্ষা করার জন্য ফরজ। তেমনি বাতেনী জেহাদও ঈমান বাচাইয়া আল্লাহর বান্দার পরিচয় দিবার জন্য ফরজ। নফ্‌সের নিকট পরাজিত হইলে ঈমান রক্ষা করা কঠিন।

এই জন্য রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন:—

رَجَعْنَا مِنْ جِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى جِهَادِ الْاَكْبَرِ •

অর্থাৎ: আমরা একটা অপেক্ষাকৃত সহজতর জেহাদ হইতে কঠোরতর জেহাদে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করিলেন "হে রসূলুল্লাহ! জেহাদে আকবর কি? হজরত (দঃ) বলিলেন, নফসের সহিত জেহাদ করা।"

নফ্‌স এমন দুশমন যে, উহা মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টির আগোচর যাহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাহার সহিত জেহাদ করা খুবই

কঠিন। আর জাহেরী জেহাদ হইল ইসলামের রাজত্বের বিরুদ্ধে শত্রুদের সাথে জেহাদ। উহারা কাফের এবং মুশরিক। উহাদিগকে চর্মচক্ষে দেখা যায়। সুতরাং জাহেরী হাতিয়ার নিয়া তাহাদের সাথে যুদ্ধ করিতে হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ বলা হইয়াছে। আর নফ্সের দুশমনী হইল গোপনে, অগোচরে মনের উপর। ইহা দমন করা খুবই কঠিন। নফসের সৈন্যবাহিনী রহিয়াছে। উহা হইতেছে, হেরেস, তামা, বোখল, কেজব, কিনা, হাসাদ ইত্যাদি। অর্থাৎ—লোভ, লালসা, কৃপণতা, মিথ্যাচার, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি। এই সকল মানসিক কামনাগুলি কোনটা উচ্ছেদ এবং কোনটা দমন ও বশীভূত করাই তরিকতের উদ্দেশ্য। ইহার উপলক্ষ হইল ইবাদত, রেয়াজত, জেকের ও তাক্ওয়া। ইহা ব্যতীত এই সকল রিপু পরাভূত ও বশীভূত করা সম্ভব নয়। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু জেকের ও মোরাকাবাই যথেষ্ট নহে। শরীয়তের প্রতি হুকুম আহকামের সাথে নিয়মিত জেকের ও মোরাকাবা দ্বারা দেলের সাফাই বা পবিত্রতা অর্জন করিতে হইবে। শরীয়তের কোন হুকুম লঙ্ঘন করিয়া শুধু জেকের আজকার বা মোরাকাবা করিলে তাহাতে আসল উদ্দেশ্য সফল হইবে না। এক হিসাবে শরীয়তই তরিকত অর্থাৎ শরীয়ত সুষ্ঠু ভাবে এবং তরিকতই মা'রেফত অর্জনের পথ।

হাদীসে উক্ত হইয়াছে :—

الشريعة اقوالى والطريقة افعالى والحقيقة حالى •

অর্থাৎ : শরীয়ত আমার কওল, তরিকত আমার আমল এবং

হকিকত হইতেছে আমার হাল অর্থাৎ যে অবস্থায় আমি আছি। সুতরাং বুঝিয়া লইতে হইবে যে, কোরআন ও হাদীসের হুকুম আহকামগুলি হইতেছে শরীয়ত। উহা যথা-রীতি আমল করার নাম তরিকত। ইহার তাৎপর্য এই যে, শরীয়তের প্রত্যেকটি হুকুমই হইতেছে আল্লাহর আনুগত্য। যথার্থভাবে আল্লাহর আনুগত্য করিতে থাকিলে ক্রমশঃ আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং মোহাব্বত বৃদ্ধি পায়। ইহাই প্রকৃত অর্থে তরিকত।

এইভাবে একান্ত নিষ্ঠার সাথে ইবাদত বন্দেগী করিলে বান্দা একটি বিশেষ অবস্থা অর্জন করে।

উহা হইল আখেরাতের প্রতি গভীর আসক্তি। দুনইয়ার প্রতি অনাসক্তি, নেক কাজে অধিক আগ্রহ গোনাহ হইতে পর-হেজ বা খোদার ভয়। এসব গুণগুলি তরিকতের পথের সম্বল।

জানিয়া রাখিতে হইবে, শরীয়ত ও তরিকত মূলতঃ একই জিনিস। উহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা, আল্লাহকে জানা, চিনা ও আল্লাহর প্রতি মোহাব্বত বৃদ্ধি করা এবং তদ্দরুন আখেরাতে মুক্তি লাভ এবং আল্লাহর মোহাব্বতের অমূল্য নেয়ামত অর্জন করা।

সুতরাং শরীয়ত এক হিসাবে তরিকতেরই রাস্তায়। উহা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলে তরিকতের রাস্তায় কখনো অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আবার তরিকতের লক্ষ্য অর্জন না হইলে শরীয়ত মূল্যহীন হইয়া পড়ে। যেমন, পানিহীন নদী, ফলহীন বৃক্ষ এবং ঘ্রাণহীন ফুল।

শরীয়তের মধ্যেই তরিকতের মূল নিহিত। কেননা, শরীয়ত অর্থ নির্দ্ধারিত রাস্তা। অর্থাৎ আল্লাহর তাবেদারী ও রাসূলের আনুগত্যের নির্দিষ্ট কাজ সমূহ। এই সকল কাজ তরিকত ও বটে। আবার পুর্বেই বলিয়াছি যে শরীয়তও। ইহার কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ আছে।

১। ইবাদত, ২। মুয়ামেলাত, ৩। মুয়াশিরাত ইবাদত বলিতে দুনইয়ার সব কাজ যাহা নেকীর সংগে জড়িত উহাই ইবাদত। তবে বিশেষভাবে কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজকে ইবাদত বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। উহা হইল ঐ সকল কাজ যাহা আল্লাহ ও রসূলের হুকুম দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে, উহাকেই ইবাদত বলে। উহাকে হাক্কুল্লাহও বলা হয়। যথা—পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ, জুময়ার নামাজ, রমজানের রোজা, মালদারের প্রতি মালের জাকাত এবং সামর্থ্য ব্যক্তির হজ্জ আদায় করা। উপরোক্ত ইবাদতগুলি নির্দিষ্টভাবে আল্লাহর বন্দেগী। এইসব ইবাদতের সংগে অন্য কাহারও কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ উহা এককভাবে আল্লাহর হক। উহা আদায় করিলে আল্লাহর হক্ আদায় করা হইবে। আর না করিলে কাহারও কোনও হক আদায় হইবে না। কেবল নিজের প্রতি জুলুম করা হইবে।

———

হকুকুল ইবাদ বা মানুষের হক্

শরীয়তের এমন কতগুলি হুকুম রহিয়াছে যেগুলির সম্পর্ক মানুষের সাথে। অর্থাৎ যে সব কাজ অন্যের হক নষ্ট হয় বা ক্ষতি হয়, তেমন কাজ। যেমন অন্যের দ্রব্য চুরি করা, ইহাতে অন্যের ক্ষতি হয়, এইজন্য ইহা হারাম। এইরূপ ইয়াতিমের মাল গ্রাস করা, অপরের গীবাত করা, কাহারও গালী দেওয়া, আমানতে খেয়ানত করা ও হারাম। এই সকল কাজে অপরের হক নষ্ট হয় এবং অনিষ্ট হয় বলিয়াই আল্লাহ ইহা হারাম করিয়াছেন। যে সকল ইবাদত খাছভাবে আল্লাহর জন্য নির্দ্ধারিত উহার জন্য আল্লাহ হিসাব গ্রহণ করিবেন এবং উহাতে শৈথিল্য করিলে আল্লাহ উহা ক্ষমাও করিতে পারেন। কিন্তু হক্কুল ইবাদ অতি কঠিন। অর্থাৎ বান্দার প্রতি বান্দার যে সকল হক রহিয়াছে। উহা বান্দা ক্ষমা না করিলে আল্লাহ ক্ষমা করিবেন না। কেননা, আল্লাহ আদেল ইনসাফকারী। তিনি কেয়ামতে প্রত্যেককে তাহার হক্ বুঝাইয়া দিবেন। প্রত্যেকের প্রতি আদর্শ ইনসাফ করিবেন। কেননা, কেয়ামতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব-স্ব হক্ আল্লাহর নিকট দাবী করিবে। এইজন্য কেয়ামতে বহু লোককে নিজ নেকী দান করিয়া অন্যের হক আদায় করিতে হইবে। যখন সমগ্র নেকী দান করিয়াও হক্ আদায় হইবে না তখন দাবীদারের গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়া দোজখে গমন করিতে হইবে। এই মর্মে একটি হাদীস রহিয়াছে যে, হজরত (দঃ) একদিন কোন সাহাবীকে

জিজ্ঞাসা করিলেন "বলিতে পার দরিদ্র কে?" সাহাবী বলিলেন, "হে রসূলুল্লাহ, যাহার টাকা-পয়সা মাল মাত্তা নাই সেই-ই দরিদ্র।" হজরত (দঃ) বলিলেন "না প্রকৃত পক্ষে সেই ব্যক্তিই দরিদ্র যে ব্যক্তির আমলনামায় বহু নামাজ, রোজা, হজ্ব, ও জাকাতের সওয়াব লিখিত রহিয়াছে; আবার তাহার আমল নামায় ইহাও লিখিত রহিয়াছে যে, সে কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহাকেও প্রহার করিয়াছে, কাহারও মাল জবরদস্তী করিয়া আনিয়াছে। কেয়ামতে এই সকল লোকের দাবী শোধ করিতে করিতে তাহার সব নেকী ফুরাইয়া যাইবে। তবুও অনেকের দাবী তাহার মাথায় থাকিবে। তখন সেই ব্যক্তির মাথায় দাবীদারদের গুনাহ চাপিয়া দিয়া তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।" ইহাদ্বারা হক্কুল-ইবাদের গুরুত্ব অনুমান করা যায়।

মোটকথা, আল্লাহর খাস বন্দেগী যাহা একমাত্র আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট এবং আল্লাহর হুকুম অনুসারে তাহার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়, উহা 'হুকুকুল্লাহ নামে অভিহিত হইয়াছে। আবার যাহা আল্লাহ ব্যতীত আল্লাহর সৃষ্টি মখলুকের প্রতি কর্তব্য বা ঋণ হিসাবে আদায় করিতে হয়, উহা 'হুকুকুল ইবাদ' নামে পরিচিত।

হুকুকুল ইবাদের প্রতি শরীয়তের অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ রহিয়াছে। দুইটি বিষয় ভালভাবে জানা দরকার। শরীয়ত এবং মারেফত কোনটিই হুকুকুল ইবাদ আদায় করা ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। বিশেষতঃ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য 'হুকুকুল ইবাদ' সম্পর্কে অধিকতর সচেতন থাকা প্রয়োজন।

হালাল ও হারাম

তরিকতের পথে অগ্রসর হইবার জন্য শরীয়তে পরিপক্ক হওয়া প্রথম কর্তব্য। শরীয়তের আমলগুলি দুরুস্ত না হওয়া পর্যন্ত তরিকতের পথে উন্নতি লাভ করা সম্ভব নহে। এই উদ্দেশ্যে শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী হারাম ও হালাল সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আমল করা অর্থাৎ উহা মানিয়া চলা তরিকতের পথে বিশেষ ভাবে কর্তব্য।

আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন :—

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۔

অর্থাৎ :—তোমরা পবিত্র রুজী অর্থাৎ হালালভাবে অর্জিত রুজী দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কর এবং সৎকাজ কর। আল্লাহ আরও বলিয়াছেন,

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ۔

অর্থাৎ :— হালাল রুজী দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি ফরজ। এইজন্য হালাল ও হারাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। রুজী হালাল না হইলে তরিকতের পথে কোনও উন্নতি লাভ করা সম্ভব নহে। হারাম রুজী দেলকে মলিন এবং অন্ধকার করে। ইবাদতে কোনই লজ্জৎ অনুভব হয় না। রুজী হালাল হওয়া ব্যতীত কোনও ইবাদতই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। যাহার রুজী হালাল আল্লাহ তাহার দোওয়

কবুল করেন। জনৈক সাহাবী হজরত (দঃ)-এর নিকট আরজ করিলেন—"ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর দরবারে আমার দোওয়া কবুল হইতেছেনা। রাসূলুল্লাহ বলিলেন—রুজী হালাল কর, তবে দোওয়া কবুল হইবে। হজরত (দঃ) বলিলেন—যাহারা হারাম রুজী কামাই করে এবং উহা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে উহা কিরূপে আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে? কোনও এক কেতাবে উল্লেখ আছে—বায়তুল মুকাদ্দেসে এক ফেরেশতা প্রত্যেহ ঘোষণা করিতেছে—যে ব্যক্তি হারাম রুজী খায় তাহার ফরজ সুন্নাৎ কিছুই কবুল হয় না।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে—

পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে এক পয়সাও হারাম রুজী থাকিলে সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া ইবাদত করিলে উহা আল্লাহর নিকট কবুল হইবে না। ইহাও উল্লেখ আছে—হারাম রুজী দ্বারা শরীরে যে রক্ত পয়দা হইবে উহা দোজখের আগুনে জ্বলিবে।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—ইবাদতের দশভাগের এক ভাগ হালাল রুজী। হজরত (দঃ) আরো ইরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি সারাদিন হালাল রুজী কামাই করিয়া রাত্রে ঘরে ফিরে, আল্লাহ তাহার সব গুনাহ মাফ করিয়া দেন। যাহারা হারাম রুজী হইতে পরহেজ করিয়া চলেন আল্লাহ তাহাদের হিসাব নিতে শরম বোধ করেন।

হাদীস শরীফে আছে—হারাম উপার্জিত মাল দ্বারা সদ্‌কা আদায় করিলে উহা আদায় হইবে না। হজরত আবুবকর সিদ্দীক

তাহার গোলামের এক গেলাস সরবত পান করিয়াছিলেন। যখন তিনি জানিলেন যে, উহা হালাল কামাই ছিল না, তখন তিনি গলায় আঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া উহা বমি করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। উহার এক ফোটা পেটে থাকিয়া গেলে সেজন্য তিনি খোদার নিকট মাফ চাহিলেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলিয়াছিলেন যে, নামাজ পড়িতে পড়িতে কুব্জ হইয়া গেলে এবং রোজা রাখিতে রাখিতে চুলের ন্যায় কৃষ হইয়া গেলেও হারাম অর্জিত রুজী দ্বারা কোনই নেকী লাভ হইবে না। হজরত সুফীয়ান সওরী বলিয়াছেন—হারাম মাল সদকা করিয়া সওয়াবের আশা করা, প্রস্রাব দ্বারা নাপাক কাপড় পাক করিবার সমান। প্রসিদ্ধ অলী আল্লাহ সহল তশ্তরী বলিয়াছেন—ঈমানের চারিটি বৈশিষ্ট্য; উহা ব্যতীত পূর্ণ ঈমান অর্জন করা যায় না। ১। শরীয়তে নির্দেশিত সব ফরজ ওয়াজেব আদায় করা। ২। হালাল রুজীর প্রতি সবর করা। ৩। জাহেরী ও বাতেনী গুনাহ পরিত্যাগ করা। ৪। উপরোক্ত আমলের প্রতি সারা জেন্দেগী কায়েম থাকা।

ইব্নে মুবারক বলিয়াছিলেন—সন্দেহের একটি মুদ্রা মালিককে ফিরাইয়া দেওয়া হাজার মুদ্রা সদ্কা দেওয়া হইতে উত্তম। যেরূপ হালাল রুজীর প্রতি লক্ষ্য থাকিতে হইবে। তেমনি হারাম হইতেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অবশ্য হালাল ও হারাম সবগুলি এক শ্রেণীর নয়। কতকগুলি এমন যে, উহা নিঃসন্দেহে হালাল এবং পবিত্র। আবার কতকগুলি এমন যে, মোটামুটি হালাল বা কিঞ্চিৎ

সন্দেহ পূর্ণ। আল্লাহর প্রতি যাহার যত অধিক মোহাব্বত হইবে, সে ততই অধিক হালালের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারিবে। এই-রূপ হারামের কতকগুলি শ্রেণী আছে। কতকগুলি সাধারণভাবে হারাম। আবার কতকগুলি একেবারে অকাট্যভাবে হারাম। যেমন, মৃত-মাংস, শূকরের মাংস, মদ প্রভৃতি। আর শ্রেণীর হারাম হইল এই যে, জিনিস পাক হইলেও যদি উহা অপরের হয় এবং জোরপূর্বক বা সম্মতি ব্যতীত ভোগ করে তবে উহা হারাম হইবে। এইরূপ, ইয়াতিম, বিধবা ও অনাথের মাল আত্মসাৎ করা বা জোরপূর্বক খাওয়া আকাট্যভাবে হারাম। চুরি, অপ-হরণকৃত মাল বা জোরপূর্বক অধিকৃত মাল বা ধন-সম্পত্তি ভোগ করা হারাম। সুদ দেওয়া নেওয়া, ঘুষ নেওয়া দেওয়া আকাট্য ভাবে হারাম। তরিকতের পথে শরীয়তের এইসব হুকুম আহকাম অবশ্য পালনীয়। অন্যথায় শরীয়ত ও তরিকত কোনটাই অর্জিত হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ—রুজী সম্পর্কে সালেহীন বা খোদা-ভীরু লোকদের পক্ষে অধিকতর সতর্কতার অবদান রহিয়াছে। সালেহীনদের পক্ষে সন্দেহের রুজী হারামের ন্যায় ভয় করিয়া উহা হইতে পরহেজ করা উত্তম। সন্দেহ জনিত মাল তিন প্রকার বলিয়া কিমিয়ায়ে-সায়াদতে উল্লেখ রহিয়াছে।

১। ঐরূপ সন্দেহের দ্রব্য—যাহা হইতে বাঁচিয়া থাকা ওয়াজেব।
২। কোন কোন সন্দেহের মাল হইতে বাঁচিয়া থাকা উত্তম।
৩। কোন কোন সন্দেহের মাল হইতে পরহেজ করা জায়েজ।

অর্থাৎ উহা হইতে পরহেজ করায় কোন দোষ হইবে না। যেমন শিকারের গোশত। উহাতে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, উহা হয়তো কাহারও অধিকারভুক্ত সম্পত্তি হইতে পারে।

হারাম রুজী সম্পর্কে সন্দেহের তৃতীয় দরজা এই যে, ফতোয়া দৃষ্টে উহা নিঃসন্দেহে হালাল। তবে উহা ব্যবহারের বেলায় যদি কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে উহা হইতে পরহেজ করা সঙ্গত। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—লোক ততক্ষণ পর্যন্ত পরহেজ-গার হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোনও জিনিস এই খেয়ালে তরক না করে যে, উহা ব্যবহারে গুনাহে পতিত হইতে পারে।

আলী বিন সাবদ বলেন—আমি একটি ঘর ভাড়া নিয়াছিলাম। একদিন একখানা পত্র লিখিয়া উহার দেওয়ালে চাপা দিয়া শুকাইতে মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু মনে ধারণা হইল যে, দেওয়ালের মাটি তো আমার অধিকারে নয়। সুতরাং উহার ব্যবহার কি প্রকারে জায়েজ হইবে? পরে উহা অতি নগন্য বিষয় মনে করিয়া দেওয়াল হইতে সামান্য মাটি খুঁড়িয়া লইয়া কালির উপর ছড়াইয়া দিয়া কালি শুকাইলাম। কিছুদিন পরে একদিন স্বপ্নে দেখিলাম—কেহ যেন বলিতেছে, "অপরের দেওয়ালের মাটি যে গ্রাহ্য করে না কেয়ামতের দিন সে উহা টের পাইবে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত খোদা ভীরুগণ—এরূপ ক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কেও পরহেজ-গারী অবলম্বন করিয়া থাকেন।

খলীফা ওমর ফারুকের সম্মুখে এক সময় গনীমতের মালের মধ্যে হইতে একটি মেশকের পাত্র হাজির করা হইল। তিনি উহার

ঘ্রাণ হইতে বাঁচিবার জন্য অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন এবং বলিলেন— "উহা সর্বসাধারণ মুসলমানের সম্পত্তি।"

এক বুজুর্গ ব্যক্তি কোন এক রোগীর নিকট বসিয়াছিলেন। রোগীর মৃত্যু হইলে তিনি রোগীর নিকট প্রজ্জ্বলিত বাতিটি নিবাইয়া দিলেন এবং বলিলেন "এই তৈল এখন মৃতের ওয়ারিশ-গণের সম্পত্তি।"

খলীফা হজরত ওমর (রাঃ) গণীমত লব্ধ একটি মেশকের পাত্র এই উদ্দেশ্যে ঘরে রাখিয়া দিলেন যে, উহা বিক্রয় করিয়া উহার অর্থ বায়তুল মালে জমা দিবেন। এক সময় তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্ত্রীর হাতে মেশকের ঘ্রাণ পাইলেন। তিনি এই বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিতে চাহিলে স্ত্রী বলিলেন—"ঐ মেশক মাপিবার সময় হাতে লাগিয়াছিল উহা চাদরে মুছিয়াছিলাম। সেই জন্য চাদর হইতে ঘ্রাণ আসিতেছে। হজরত ওমর চাদর আনাই-লেন এবং উহার ঘ্রাণ দূর না হওয়া পর্যন্ত ধৌত করাইলেন। যদিও এতটুকুতে দোষণীয় হওয়া কিছু ছিল না। তবুও হজরত ওমর (রাঃ) স্ত্রীকে সতর্ক করিবার জন্যই উহা করিয়াছিলেন।

দ্বীনের উদ্দেশ্য এবং নিয়ত ব্যতীত দুনইয়ার উদ্দেশ্যে যে কোন কাজই নিষেধ। কেননা, উহাই মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করে। হালাল উপার্জনের রুজী ও পেটপুর্ণ করিয়া খাওয়া পরহেজগারীর খেলাফ। পুর্ণ পরিতৃপ্তি হইয়া আহার করিলে নফ্‌স গুনাহের জন্য উত্তেজিত হইয়া থাকে। আল্লাহর রাস্তায় পরহেজগারী অবলম্বনের পক্ষে নফসের এই তৃপ্তি ভোগ সংযত করা চাই।

দুনইয়াদার ব্যক্তির বাগ-বাগিচা, দালান-কোঠা ও ঘর-বাড়ীর প্রতি সাগ্রহে দৃষ্টি করা জায়েজ নহে। কেননা, উহাতে মনে দুন্ইয়ার খাহেশ সৃষ্টি হয়। পরে লোভ বৃদ্ধি পায়।

এক খোদা-ভীরু ব্যক্তির রাস্তায় চলিবার সময় হঠাৎ জুতার দোয়াল খুলিয়া যায়। তখন রাত্রিকাল ছিল। ঘটনাক্রমে কোন রাজ-কর্মচারী সরকারী বাতি নিয়া যাইতেছিল। দরবেশ সেই বাতির আলোকে জুতার দোয়াল ঠিক করিয়া লওয়া ভাল মনে করিলেন না। কেননা, সেকালে শাহী ধন-দৌলতের প্রতি আলেম এবং খোদা-ভীরু লোকদের ঘৃণা ও সন্দেহ ছিল। কেননা, উহা অনেক ক্ষেত্রে প্রজাদের প্রতি জুলুম করিয়া সঞ্চয় করা হইত।

কোন এক পরহেজগার রমণী সূতা কাটিয়া জীবিকা উপার্জন করিতেন। একদিন রাত্রিকালে শাহী মশাল বরদার সেই পথে যাইতেছিল। খোদা-ভীরু মহিলা সেই বাতির আলোকে সূতা-কাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি অতি উচ্চ শ্রেণীর আওলিয়া গণেরই দৃষ্টান্ত। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, সুস্পষ্ট হালাল সম্পর্কে কোন সন্দেহ মনে স্থান দেওয়া চাই না।

সৎ ও নেককার লোকদের খানা খাইতে কোন প্রকার ইতস্ততঃ করা দোষণীয়। এরূপ ব্যক্তির দাওয়াত বা হাদিয়া গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করা বাড়াবাড়ি এবং মুসলমানের অন্তরে কষ্ট দেওয়ার শামিল।

যাহার মালের মধ্যে হারাম মাল মিশ্রিত আছে অর্থাৎ সুদ, ঘুষ বা জোর জবরদস্তী মূলকভাবে উপার্জিত অর্থ রহিয়াছে

এরূপ ব্যক্তির হালাল মাল থাকিলে উহা খরিদ করা জায়েজ হইবে।

প্রকাশ্যতঃ যাহার মধ্যে কোন জুলুমের লক্ষণ দেখা যায় না তবে আমলের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রুটী দেখা যায়। যেমন, পর্দা পুশিদা বা পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি, তাহাতে তাহার সদুপার্জন থাকিলে উহা হালাল হইবে না—এরূপ ব্যক্তির সহিত কাজ করা জায়েজ হইবে। অবশ্য তাহার উপার্জন পুর্ণভাবে হালাল কিনা ইহা জিজ্ঞাসা বাদ করা যাইতে পারে। তবে এরূপ প্রশ্ন ও ব্যক্তি বিশেষের আত্ম-মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করাই সমিচীন। কারণ, কাহারও অদৃশ্য বা অজ্ঞাত অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা বা সে বিষয় জিজ্ঞাসা বাদ করা একদিক দিয়া সতকর্তা হইলেও কাহারও আত্ম-মর্যাদার পক্ষে হানিকর এবং মনোকষ্টের কারণ হইতে পারে।

সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে উহা পরিত্যাগ করাই উত্তম। তবে পরহেজগারীর ক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত হইবার জন্য সাবধানে অন্যের নিকট খোঁজ খবর নিতে পারে? তবে উহা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি জানিতে পারিলে গুনাহগার হইতে হইবে। ইহা একপ্রকার গীবত এবং অন্যকে কষ্ট দেওয়ার শামিল। সাবধানতা এবং সতর্কতার জন্য হারামে পতিত হওয়া চাই না।

———

সগীরাহ ও কবীরা গুনাহ

মু'মিনকে আল্লাহর রাস্তায় অগ্রসর হইবার জন্য শরীয়তের হুকুম আহকাম অনুযায়ী চলিতে হইবে। এইপথে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য তাক্ওয়া ও পরহেজগারী এখতিয়ার করিতে হইবে। তরিকতের রাস্তায় সফলতা অর্জনের জন্য শরীয়তে বর্ণিত সগীরাহ ও কবীরাহ গুনাহ গুলি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

উপরের অধ্যায়ে যে সকল দৃষ্টান্ত বর্নিত হইয়াছে। উহা অতি উচ্চ স্তরের আওলিয়াগণের নিদর্শন। তরিকত পন্থীগণ এই সকল দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া চলিতে তাকওয়া ও পরহেজগারীর পথে হিম্মৎ বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষণে সগীরাহ ও কবীরা গুনাহ সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করিতেছি। কেননা, তরিকতের রাস্তায় অগ্রসর হইতে হইলে সগীরাহ্ ও কবীরা সব গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। অন্যথায় তরীকার পথে সফলতা অর্জন করা কঠিন।

সগীরাহ্ গুনাহ

ছোট ছোট গুনাহ বারবার করিলে উহা কবীরা গুনাহ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তওবা দ্বারা সগীরা গুনাহ অতিশীঘ্র মাফ হইয়া যায়। এমন কি, এক হাদীসে উল্লেখ আছে যে পাঁচ

ওয়াক্ত নামাজ দ্বারা সগীরাহ গুনাহ মাফ হইয়া যায়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন :—

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰتِكُمْ ۝

অর্থাৎ তোমরা যদি কবীরা গুনাহ হইতে দূরে থাক, তবে আমি তোমাদের সগীরাহ গুনাহ সমূহ মাফ করিয়া দিব।

কবীরা গুনাহ

কবীরা গুনাহ সম্পর্কে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। কেহ বলিয়াছেন সাতটি, কেহ বলিয়াছেন উহা অপেক্ষা বেশী, কেহ বলিয়াছেন উহা অপেক্ষা কম।

হজরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন—কবীরাহ গুনাহ সাতটি।

যাহা হউক, এখানে মোটামুটি কবীরা গুনাহগুলি উল্লেখ করিতেছি—

চারি প্রকার কবীরাহ গুনাহ অন্তরের সহিত জড়িত :—

১। কুফরী করা ২। সগীরাহ গুনাহ বার বার করা ৩। আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হওয়া, ৪। আল্লাহর গজব ও আজাব সম্পর্কে বে-পরওয়া ও নির্ভীক হওয়া।

চারি প্রকার কবীরা গুনাহ জিহ্বার সহিত সংশ্লিষ্ট :—

১। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, ২। কাহারও প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া, ৩। মিথ্যা কসম করা ৪। যাদু করা।

তিন প্রকার কবীরা গুনাহ উদরের সহিত সম্পর্কিত :—

১। শরাব পান করা, ২। ইয়াতিমের মাল খাওয়া. ৩। সুদ খাওয়া।

দুই প্রকার কবীরাহ গুনাহ কাম-প্রবৃত্তির সহিত :

১। জেনা করা, ২। পুরুষের সহিত সহবাস করা,

দুই প্রকার কবীরা গুনাহ হাতদ্বারা সংগঠিত হয়—

চুরি-ডাকাতি করা, ২। হত্যা করা।

একপ্রকার কবীরা গুনাহ পা দ্বারা সংগঠিত হয়—

যথা-কাফেরদের সহিত জেহাদের সময় ময়দান হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, শত্রু-সংখ্যা দ্বিগুণে অধিক হইলে আত্ম-রক্ষার জন্য পশ্চাদাপসরণ করা জায়েজ আছে।

আর একটি কবীরাহ গুনাহ হইল পিতামাতার না-ফরমানী।

উপরোক্ত গুনাহ সমূহের কোন কোনটির জন্য শরীয়তে হদ বা শাস্তি নির্দিষ্ট আছে। আবার কোনটির জন্য কোরআনেও শাস্তি উল্লেখ আছে। মোটকথা, উপরে লিখিত প্রত্যেকটি শরীয়তের হুকুম মতে গুরুতর গুনাহ বা কবীরা গুনাহ। ইহার প্রত্যেকটির জন্য আল্লাহর দরবারে কঠিন শাস্তি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে সর্বদা বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও অন্যান্য নেককার্য দ্বারা ছোট ছোট গুনাহ খণ্ডন হইয়া যায়।

বান্দার আমল-নামা

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে—প্রত্যেক মানুষের তিনটি আমল নামা লিখিত হয়। এক আমল নামায় সেই গুনাহ লিখিত হয়, যাহা কখনও মাফ হয় না। যেমন শির্‌ক্‌ প্রভৃতি!

দ্বিতীয় আমল নামায় 'হক্‌কুল্লাহ' সম্পর্কে লিখিত হয়। উহা ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্‌ পাক মা'ফ করিয়া দিতে পারেন।

তৃতীয় আমল নামায় মানুষের হক বা হক্‌কুল এবাদ' সম্পর্কে লিখিত হয়। যাহার হক নষ্ট করা হইয়াছে সে মাফ না করা পর্যন্ত উহা মাফ হইবে না। গুনাহ ব্যক্তিগত ভাবে, অর্থ সম্পদ-দ্বারা অথবা ভ্রান্ত মত ও পথে লোকদিগকে চালনা করা হইয়া থাকে। সগীরাহ গুনাহ কবীরাহ গুনাহে পরিণত হইয়া থাকে। অবশ্য সগীরাহ গুনাহ সমূহ আল্লাহ মাফ করিয়া দিয়া থাকেন। তবে উহা অনেক ক্ষেত্রে কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। কবীরা গুনাহ অতি কঠিন। সগীরাহ গুনাহ তুচ্ছ করিয়া হামেশা করিতে থাকিলে কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। যেমন, হামেশা পরচর্চ্চা করা, রেশমী পোষাক পরিধান করা। গান-বাজনা, নাচ-গান হামেশা করিতে থাকিলে কবীরাহ গুনাহে পরিণত হয়। পাথরের উপর অনবরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির ফোটা পড়িতে থাকিলে যেমন একটি গর্ত সৃষ্টি করে; তেমনি ক্ষুদ্র গুনাহ অনবরত করিতে থাকিলে উহাও অন্তরে ক্ষত সৃষ্টি করে। উহাই কবীরাহ গুনাহে রূপান্তরিত হয়। এই সব গুনাহের প্রতিকারের জন্য লজ্জিত

ও অনুতপ্ত হইয়া ফিরিয়া থাকিতে হইবে। তবে হক্কুন্ নাস বা মানুষের দাবী দাওয়া সংক্রান্ত গুনাহ তাহাদের হক্ আদায় করিয়া দিয়া বা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মুক্ত হইতে হইবে।

তওবা ইস্তেগফারের অর্থ হইল, পশ্চাতের গুনাহের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় ওয়াদা করা। তওবা বান্দার নাজাত ও মুক্তির প্রধান অবলম্বন। এখানে তওবা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

তওবা

তওবা অর্থ গুনাহ হইতে প্রত্যাবর্তন বা ফিরিয়া আসা। আখেরাতে মুক্তি-লাভের উপায়গুলির মধ্যে তওবা প্রধান অবলম্বন। কি শরীয়ত, কি তরিকত সবক্ষেত্রেই তওবার প্রয়োজন রহিয়াছে। গুনাহ খাতার ক্ষেত্রে তওবাই হইল প্রথম ও প্রধান অসিলা। আল্লাহ বার বার বান্দাকে গুনাহ খাতার ক্ষেত্রে তওবার রাস্তা নির্দশন করিয়াছেন। সুতরাং ইহা শরীয়তের স্বীকৃত এবং নির্দেশিত ব্যবস্থা। তেমনি ইহা আবার তরিকতের নির্দেশিত ব্যবস্থা। অর্থাৎ তরিকতের রাস্তা এখতিয়ার করিতে হইলেও তরিকত পন্থীকে সর্বপ্রথম তওবার মধ্যে সে পথে প্রবেশ করিতে হইবে।

মানুষ মাত্রই আল্লাহর দরবারে গুনাহের জন্য লজ্জিত এবং অপরাধী। অবশ্য নবীগণ আল্লাহর দরবারে বে-গুনাহ। মানুষ

মাত্রই গুনাহে পতিত হইয়া থাকে। গুনাহের জন্য আল্লাহর দরবারে শাস্তি অবধারিত। তবে তওবা দ্বারা সেই গুনাহ হইতে মুক্তি ও অব্যাহতি প্রার্থনা করিতে হইবে। সর্বদা গুনাহে ডুবিয়া থাকা শয়তানের স্বভাব। হজরত আদম (আঃ) মানব জাতির আদি পিতা। তিনিও আল্লাহর দরবারে কঠিন গুনাহ করিয়াছিলেন। সেই গুনাহ হইতে মুক্তি লাভের জন্য দীর্ঘ দিন অতি করুণভাবে তওবা করিয়াছেন। সে তওবার কলেমা হইতেছে এই :—রাব্বানা যালামনা আন্‌ফুসানা ওয়া-ইন্ লাম তাগফের-লানা ওয়া তারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসেরীন'' (কোরআন)। অর্থাৎ "হে প্রভো! আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছি। যদি তুমি ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইব।" হজরত আদম (আঃ)-এর এই তওবা তাহার আওলাদগণের জন্য একটি আদর্শ, একটি সবক। অর্থাৎ গুনাহ ও আল্লাহর হুকুমের অবমাননা ও না-ফরমানীর ক্ষেত্রে তওবা করা ধনী আদমেরই তরীকা। অপর পক্ষে তওবা না করা হইল শয়তানের স্বভাব। কারণ শয়তান আল্লাহর হুকুমের না-ফরমামী তো করিলই, অধিকন্তু সে অহঙ্কার বসে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অস্বীকার করিল। পরিণামে সে চির-ঘৃণিত এবং খোদার দরবার হইতে বিতারিত হইল।

মানুষকে আল্লাহ আশরাফুল মখলুকাত বা 'সেরা সৃষ্টি' হিসাবে পয়দা করিয়াছেন। উহার একটি পরিচয় হইল তাহার বিনয় ও নম্রতা এবং আল্লাহর দরবারে নিজ ত্রুটী ও গুনাহ স্বীকার ও

ক্ষমা প্রার্থনা। মানুষ কামনা, বাসনা, লোভ লালসা প্রভৃতির শিকার। তাহাকে এই কামনা বাসনা হইতে মুক্ত থাকিয়া আল্লাহর পথে অগ্রসর হইতে হয়। যখন সে ঐ সকল লোভ লালসা ও কামনা বাসনার জালে জড়াইয়া পড়িয়া আল্লাহর নির্দ্ধারিত রাস্তা হইতে বিচ্যুত হয়, তখন আল্লাহ ক্ষমার দ্বার তাহার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন। যাহাতে সে তওবা করিয়া ভ্রান্ত পথ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে।

সুতরাং গুনাহ হইতে রক্ষা পাইবার এবং আল্লাহর অবারিত রহমত ও করুণা লাভ করিবার পক্ষে তওবা একটি প্রধান বরং সর্বোত্তম উপায়। মানুষ যখন খালেস ভাবে আল্লাহর দরবারে তওবা করে, তখন তাহার মানসিক কুপ্রবৃত্তিগুলি দমন হয় এবং শয়তান নিষ্ক্রীয় হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় জ্ঞান ও শরীয়তের পথ তাহার জন্য উন্মুক্ত সুস্পষ্ট হইয়া যায়। তাহার মনের ক্লেদ দুর হয়, লজ্জা ও অনুতাপে অনলে দাগ্ধভুত হইয়া মন একান্তভাবে খোদার অনুগত হইয়া পড়ে। ফলে তাহার পক্ষে গুনাহের রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া নেকীর রাস্তায় বহাল ও অগ্রসর হইতে থাকে।

তওবার সুফল সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআন মজিদে ইরশাদ করিয়াছেন :—

تُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا . أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ٭

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহর নিকট তওবা কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করিতে পার। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—"সকাল বেলা তওবা করা উত্তম। গুনাহ করিয়া লজ্জিত হওয়া এবং মনে মনে অনুতাপ করাও তওবার শামিল।" হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি প্রত্যেহ সত্তর বার তওবা করিয়া থাকি।" তওবাকারীর গুনাহ আল্লাহ বখশেশ করিয়া দিয়া থাকেন। যাহারা তওবা করে মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তাহাদের গুনাহ মাফ করিয়া দেন। যাহারা দিনের গুনাহ-খাতা বখ্‌শেশের জন্য রাত্রিতে তওবা করে আল্লাহর তাহাদের জন্য রহমতের দরজা খোলা রাখেন। জানা অবশ্যক যে, সকলেরই গুনাহ খাতা হইয়া থাকে। তবে যাহারা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয় তাহারাই উত্তম। কেননা, তওবা এমনই একটি কাজ যাহার কল্যাণে মানুষ গুনাহ হইতে সম্যক ভাবে মুক্তি লাভ করিয়া একেবারে বে-গুনাহ হইয়া যায়। তওবার উপর কায়েম থাকার জন্য আল্লাহর নিকট সকাতরে প্রার্থনা করা উচিত। তবে যতবার গুনাহ হউকনা কেন, আল্লাহর রহমতের দ্বারা হইতে কখনও নিরাশ হইতে নাই। আল্লাহ পাক তাহার দুর্বল প্রকৃতির বান্দার জন্য এতবড় ক্ষমা ও রহমতের ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছেন, তথাপি যাহারা ইহার প্রতি কর্ণপাত না করে এবং গুনাহ হওয়া মাত্র তওবা করিতে শিথিলতা করে বা ভুলিয়া যায় তাহারা নিতান্তই হতভাগ্য।

হাদীস শরীফে লিখিত আছে, গুনাহ করার পর যে বান্দা

তওবা করিবার পুর্বে মনে মনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। আল্লাহ তাহাকে মাফ করিয়া দেন।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, "আসমানে এক বিশাল দরজা রহিয়াছে। উহা তওবা ইস্তেগফারকারীদের জন্য সর্বদা খোলা থাকে। সোমবার এবং বৃহস্পতিবার দুনইয়াবাসীর আমল আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা তওবাকারী আল্লাহ তাহারদের ক্ষমা করিয়া থাকেন। আর যাহারা তওবা হইতে বিমুখ তাহাদের গুনাহ বহাল থাকে।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে নিঃসম্বল অবস্থায় হারানো উট্ ফিরিয়া পাইলে লোকে যেরূপ খুশি হয়। কোন তওবা করিয়া আল্লাহর দিকে রুজু হইলে আল্লাহ তদ্রূপ খুশি হইয়া থাকেন।

তওবার হকিকত

তওবা আল্লাহকে চিনিবার উপায়। তওবার দ্বারাই নেকী বদীর পার্থক্য হইয়া থাকে। মানুষ যখন গুনাহ করিতে করিতে শেষ স্তরে পৌঁছিয়া যায়, তখন স্বভাবতঃই তাহার লজ্জা ও অনুতাপ উপস্থিত হয়। মানুষের বিবেক এক সময় অবশ্যই সজাগ হয় এবং নিজ গুনাহ তাহাকে বিষের ন্যায় দংশন করিতে থাকে।

সেই বিষ জ্বালা শান্ত করিবার জন্য মনে অস্থিরতা দেখা দেয়। সারাজীবন যে বিষ গলাধঃকরণ করিয়াছি, তাহার জন্য মনে অনুশোচনা ও অনুতাপ উপস্থিত হইলে তখন যে নিজের বিবেকের নির্দেশেই হউক বা কাহারও সংপরামর্শেই হউক, অনুতপ্ত হয় এবং ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া সরল সোজা পথ ও ন্যায় পথ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। অনুতপ্ত হইয়া পাপ-পথ পরিত্যাগ করার এই সংকল্পের নামই তওবা। পীরের পাগড়ীর এক প্রান্ত হাতে ধরিয়া মুখে তওবার কলেমার পাঠ করার সঙ্গে যদি অন্তরের কোন যোগ না থাকে তবে উহা তওবা বলিয়া গণ্য হইবে না।

তওবার অপরিহার্যতা

তওবা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। কে এমন বান্দা আছে যে, খোদার দরবারে দায়ী এবং লজ্জিত নয়? কাফের তাহার কুফরী হইতে, মুশরিক তাহার শেরেকী হইতে এবং গুনাহর দরিয়ায় নিমজ্জমান ব্যক্তির উদ্ধার লাভের জন্য একমাত্র তওবাই মাধ্যম। ভ্রান্ত পথ ও অন্যায় কাজ হইতে সজাগ হইয়া সত্য ও ন্যায়ের রাস্তা গ্রহণ করিবার সংকল্পের কাজ তওবা দ্বারাই হইয়া থাকে।

তওবার ফরজ ঃ—শেরেকী ও কুফরী হইতে অবিলম্বে তওবা করা ফরজ। অতঃপর প্রত্যেক গুনাহ খাতা, ত্রুটি বিচ্যুতি এবং বাতিল আকিদা হইতে তওবা করিবে। এই জাহেরী ঈমান ও আকিদার বিষয় ঠিক হইয়া গেলে বাতেনী বিষয়ে তওবা করিবে। বাতেনী বিষয় যথা— নফ্‌সের ক্ষতিকারক বিষয়গুলি লোভ লালসা কাম, ক্রোধ ইত্যাদি। এই সকল মানসিক কু-প্রবৃত্তিগুলি সব গুনাহের মূল ও আহ্বায়ক। এই রিপুগুলি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষকে কু-পথে এবং গুনাহে আমন্ত্রণ করে। অতএব, ইন্দ্রিয়ের এই অনিষ্টকারিতা হইতে তওবা করা জরুরী। সুতরাং যথাসময়ে গুনাহ হইতে তওবা করা উচিত।

আল্লাহ পাক বলেন—

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ

الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ٭

আমি তোমাদিগকে যে রেজেক দান করিয়াছি। মৃত্যু আসিবার পূর্বে উহা ব্যয় কর, তখন সে বলিবে, হে আমার পরওয়ার দেগার, আমাকে যদি কিছু অবকাশ দান করিতেন তবে আমি ঈমান আনিতাম এবং নেক কাজ করিতাম। এই আয়াতের ব্যাখ্যা তফসীরে লিখিত আছে—মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইলে মালাকুল-মওত যখন রূহ কবজ করিতে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন

মুমুর্ষ ব্যক্তি একদিনের অবকাশ চাহিবেন যেন সে গুনাহ হইতে তওবা করিতে পারে। মালাকুল মওত বলিবে, তোমাকে দীর্ঘ জীবন দান করা হইয়াছিল, তখন তুমি তওবা কর নাই। এখন তোমার মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন আর অবকাশের কোন সময় নাই। মুমুর্ষ ব্যক্তি তখন অতিশয় পেরেশান এবং ভীত হইয়া পড়িবে। এবং মাত্র এক ঘন্টার জন্য সময় চাহিবে; মালাকুল মউত উহাও অস্বীকার করিবে। তখন মানুষ ভয়ানক বিচলিত হইয়া যায়। মালাকুল মওত সেই অবস্থায় রুহ কবজ করিয়া লইয়া যায়। লোক গুনাহগার হইলে তাহাকে দোজখে হুকুম দেওয়া হয়, এবং নেককার হইলে বেহেশতের হুকুম দেওয়া হয়। যাহারা সারা জেন্দেগানী গুনাহে লিপ্ত থাকে এক সময় থাকিতে তওবা করে না মুমুর্ষ সময় তাহাদের তওবা কোনই কাজে আসিবে না। এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে ইরশাদ করিয়াছেন :—

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ - حَتّٰى

اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْاٰنَ ◦

অর্থাৎ—যাহারা গুণাহে লিপ্ত থাকে। এমনকি, মুমুর্ষ সময়ে বলে—আমি এখন তওবা করিতেছি, তাহাদের তওবা কবুল হইবে না।

তওবা কবুল হওয়ার আলামত

যে বান্দা একান্ত সরলান্তঃকরণে নিজের গুনাহসমূহ স্মরণ করিয়া খোদার দরবারে তওবা করে, আল্লাহ পাক তাহার তওবা কবুল করিয়া থাকেন। গুনাহ-ই আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে দুরুত্ব সৃষ্টি করে। তওবা সেই ব্যবধান দুর করিয়া থাকে। মানুষের দেল একখানি আয়নার ন্যায়। উহা ফেরেশতা জাতীয় উপাদানে সৃষ্টি। মানুষের গুনাহের ফলে উহা দুর্বল ও মলিন হইয়া পড়ে। ফলে আল্লাহর পথের আলো ক্রমশঃ দুরে সরিয়া যাইতে থাকে। খাঁটি তওবা দ্বারা দেলের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা বিদুরীত হইয়া যায়। তওবা করিবার পর যদি দেল-সাফ মানুষ হয় এবং ক্রমশঃ দেলের ভাব পরিবর্তন হইতে থাকে। আল্লাহর দিকে মন আকৃষ্ট হয়, নেক কাজের প্রতি মনের আগ্রহ বাড়িতে থাকে, তবে মনে করিবে তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়াছে। ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের এবং নেক নসীবের লক্ষণ মনে করিবে। এইরূপ তওবা নসীব হওয়ার জন্যই তরিকতের রাস্তা অনুসরণ করিতে হয়। তরিকতপন্থী, আধ্যাত্মিক ওস্তাদের সাহায্য ও সাহচর্য এই পথে সহায়ক হইয়া থাকে।

গুনাহ কঠিন হইলেও আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হওয়া চাই না। কেননা, আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হওয়া কুফরী। অবশ্য গুনাহ ভারী হইলে আল্লাহর দরবারে গভীর ভাবে রোনাজারী ও ফরিয়াদ করিবে। হাদীস শরীফের মর্মে জানা যায়,

গুনাহগার লোকও বেহেশতে গমন করিবে। উহারা ঐ সকল লোক যাহারা গুনাহ করিলেও, মনে মনে আল্লাহর ভয়ে ভীতি এবং গুনাহের জন্য শরমিন্দা থাকিত।

হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন—সাবান দ্বারা যেমন কাপড় পরিষ্কার করা হয়, নেকী তেমনি গুনাহ ধৌত করিয়া দেয়। হজরত (দঃ) আরও ফরমাইয়াছেন, "ইবলিস প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল "হে আল্লাহ, আমি তোমার বান্দাদিগকে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ধোকা দিতে থাকিব, যেন কেহই বেহেশতে প্রবেশ করিতে না পারে।"

আল্লাহ পাক ফরমাইলেন—"আমার ইজ্জতের কসম। আমিও আমার বান্দার জন্য তওবার দরজা খোলা রাখিব। এবং যখনই সে তওবা করিবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব।

একদিন এক হাবসী রসূলুল্লাহর দরবারে হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হে রাসূলুল্লাহ,, গুনাহগারা তওবা করিলে কি আল্লাহ মাফ করিয়া থাকেন?

হজরত (দঃ) ফরমাইলেন," "হাঁ। গুনাহ করিয়া তওবা করিলে তওবা কবুল হইয়া থাকে।" হাবশী তখন চলিয়া গেল, তারপর এক সময় ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমি যখন গুনাহ করিয়াছি তখন কি আল্লাহ উহা দেখিয়াছেন? হজরত (দঃ) বলিলেন—হাঁ। বান্দার সব কাজই আল্লাহ দেখিয়া থাকেন। হাবশী ইহা শুনিয়া বেহুশ হইয়া পড়িল। অতঃপর দেখা গেল যে, তাহার রুহ বাহির হইয়া গিয়াছে।

জনৈক বনী ইসরাইলের একটি ঘটনা :—

বনী ইসরাইলের মধ্যে এক অতি বড় গুনাহগার ব্যক্তি ছিল। সে একজন বড় আলেমের নিকট গিয়া বলিল—"হুজুর! আমি ভারী গুনাহ করিয়াছি, নিরানব্বই জন লোককে বেকসুর কতল করিয়াছি। এমতাবস্থায় আমার তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে কিনা?" আলেম ব্যক্তি বলিলেন—"না, তোমার তওবা কবুল হইতে পারে না।" ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি ক্রোধে উন্মুক্ত হইয়া সেই আলেমকেও হত্যা করিয়া ফেলিল। অতঃপর সে ব্যাক্তিকে তাহার তওবা কবুল হইবে কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য একজন খুব বড় আলেমের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিবার জন্য লোকে পরামর্শ দিল। সে ব্যক্তি সেই আলেমের নিকট গেলে তিনি তাহাকে দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য এক দেশে যাইবার পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন যে, যেখানে গিয়া তওবা করিলে তাহার তওবা কবুল হইবে।

লোকটি নিজ গুনাহ হইতে মুক্তি লাভের আশায় ব্যাকুল ভাবে আলেমের পরামর্শ মতে নিজ দেশ ছাড়িয়া সেই দেশে যাইবার জন্য রওয়ানা হইল। কিন্তু লোকটি সেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পুর্বেই পরে তাহার মৃত্যু হইল। অতঃপর তাহার রুহ নিয়া ফেরেশতাদের মধ্যে দুই প্রকার মত রইল। একদল তাহাকে বেহেশতী এবং অপরদল তাহাকে দোজখী বলিয়া দাবী করিতে লাগিল। অতঃপর আল্লাহ পাক তাহার সম্পর্কে ফয়সলা করিয়া দিলেন যে, যদি সে নর্দিষ্ট স্থানের দিকে অর্দ্ধেকের

চেয়ে বেশী আসিয়া থাকে তবে তাহার নাজাত হইবে, ফেরেশতাগণ পথ মাপিয়া দেখিলেন যে, সে ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানের দিকে অর্দ্ধেকের চেয়ে মাত্র এক বিঘত পথ বেশী আসিয়াছে। সুতরাং রহমতের ফেরেশতাগণ তাহার রুহ লইয়া গেলেন এবং তাহাকে আল্লাহ মাফ করিয়া দিলেন।

তওবার—শর্ত

গুনাহ করিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলে তখন লোকে তওবা করিয়া থাকে। তওবার ফল ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পাইতে থাকে। অর্থাৎ সর্বদা মনে অনুতাপ এবং লজ্জা জাগরিত হইতে থাকে। মনে মনে নিজকে গুনাহগার ধারণা হয় এবং আখেরাতের ভয় বৃদ্ধি পায়। সর্বদা কাজে কর্মে নিজকে আল্লাহর দরবারে দোষী এবং গুনাহগার বলিয়া মনে হইতে থাকে। হাদীস শরীফে তওবাকারীর নিকট উঠা বসার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে; কেননা, তওবাকারীর মন গুনাহ হইতে পাক থাকে। তাহাদের সহিত মিলামিশায় গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়।

গুনাহের কাজ নফসের নিকট অতি মধুর মনে হইয়া থাকে। তওবা করিলে গুনাহের কাজ বিষাক্ত মধুর ন্যায় মনে হয়। গুনাহের কাজে ভয় জন্মে এবং ক্রমান্বয়ে গুনাহের খেয়াল দূরিভূত হইয়া যায়। যে কোন একটি বিশেষ গুনাহ সম্পর্কেই যে, এরূপ ধারণা হয়, তাহা নহে, বরং অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের

যে কোন গুনাহ্ সম্পর্কেই ঐরূপ খেয়াল হইতে থাকে যে, তাহা অমুক কাজটি আল্লাহর না ফরমানী ছিল।

যেমন কেহ কেহ বালেগ হওয়ার পর বহুকাল নামাজ তরক করিয়াছে, কিংবা রোজা তরক করিয়াছে, জাকাত আদায় করে নাই। তওবা করার পর উহা যথাসাধ্য আদায় করিবে। নামাজ আদায় করিবে, রোজাসমুহের কাজা কাফ্‌ফারা দিবে, সেই সব গাফ্‌লাতীর জন্য যে গুনাহ হইয়াছে সেজন্য পুনঃ পুনঃ তওবা করিবে।

এই সকল গুনাহের কথা গোপন রাখাই সমীচীন। তওবা করার পর যথাসাধ্য নেক কাজ করিবে, এবং মনে মনে আল্লাহর নিকট ইস্‌তেগফার করিবে। সগীরা কবীরাহ যে ধরণের গুনাহ হউক না কেন, উহার কাফ্‌ফারা আদায় করিতে থাকিবে।

নেক কাজের ফলে বহু গুনাহ মিটিয়া যায়।
আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন,

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۔

অর্থাৎ—নেক কাজ সমূহ গুনাহ মিটাইয়া দেয়।

যদি বিগত জীবনে খুব আমোদ প্রমোদ এবং আরাম আয়েশে মগ্ন থাকিয়া থাকে এবং ইবাদত বন্দেগীতে গাফ্‌লতী করিয়া থাকে, তবে কষ্ট, সহিষ্ণুতা, সবর ও ধৈর্য অবলম্বন করিয়া উহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবে, এই পথে তুনইয়ার মোহাব্বত হ্রাস পাইতে থাকিবে। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, মু'মেনের

শরীরে কাটা বিদ্ধ হইলেও উহাদ্বারা গুনাহের কাফ্ফারা হইতে থাকে।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, কোন কোন গুনাহ কেবল কষ্ট ভোগের দরুন মাফ হইয়া যায়।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলিয়াছেন, বড় বড় গুনাহ্‌-গারকে আল্লাহ বহু কষ্ট মসিবতে ফেলিয়া থাকেন। যাহাতে তাহার গুনাহ খণ্ডন হইয়া যায়। সুতরাং পশ্চাতের গুনাহখাতা তওবা ইস্তিগফার এবং কাফ্ফারা দ্বারা গুনাহখণ্ডন করার চেষ্টা করিবে। আল্লাহ যেহেতু মেহেরবান, তিনি তওবাকারী বান্দাকে বখশেশ, করিয়া দিয়া থাকেন।

বর্তমান জেন্দেগীতে তওবাকারী তওবার উপর দৃঢ়ভাবে বহাল থাকিবে এবং নিয়মিত ইবাদত বন্দেগী করিবে।

তওবাকারী ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ়ভাবে তৈয়ার হইবে। যে কোন মসিবত এবং আজমায়েশ বরদাশ্ত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। আল্লাহর তাবেদারী এবং ইবাদতে কায়েম থাকিবার সংকল্প করিবে। গুনাহ হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে। আল্লাহর হুকুম আহকামের বেলায় গাফলতা বর্জন করিবে। খাওয়া পরা সবই আল্লাহর উদ্দেশ্য করিবে। খাওয়া পরার ভোগ বিলাস হইতে পরহেজগারী এখতিয়ার করিবে। কেননা, যতক্ষণ মানুষ খাওয়া পরার ভোগ বিলাস হইতে পরহেজগারী অবলম্বন করিতে না পারে ততক্ষণ মানুষ মুত্তাকী হইতে পারে না।

তওবা হামেশা কায়েম হওয়া চাই

গুনাহ সম্পর্কে যতশীঘ্র সজাগ হওয়া যায় এবং যত তাড়াতাড়ি তওবা করা যায়, ততই মঙ্গল। হাদীস শরীফে আছে—মৃত্যু আসার পুর্বেই তওবা কর, এবং ওয়াক্ত চলিয়া যাইবার পুর্বেই নামাজ আদায় করিয়া ফেল।

গুনাহের কাফ্ফারা এবং তওবার শ্রেণী বিভাগ

বুজুর্গ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন:—আটটি কাজ এমন রহিয়াছে যাহাতে গুনাহের কাফ্ফারা হইয়া যায়।

উহার মধ্যে চারিটি হইতেছে এই—

১। তওবা, করা অথবা তওবার এরাদা করা,

২। ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করা,

৩। গুনাহের কাজে আল্লাহর আজাবের ভয় করা,

৪। আল্লাহর রহমতের প্রতি ভরসা করা।

উপরোক্ত চারি প্রকারের কাজ মনের সংকল্প এবং ইচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এইরূপ চারিটি কাজের সম্পর্ক শরীরের সহিত রহিয়াছে:—

১। দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করতঃ সত্তর বার তওবা ইস্তেগফার পাঠ করা, এবং একশত বার

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ ٭

"সোবহানাল্লাহেল্ আজীমে ওয়া বেহাম্‌দিহী" পাঠ করা এবং সম্ভব হইলে একটি রোজা রাখা। এই সকল নামাজ মসজিদে পড়া উত্তম, তবে সম্ভব না হইলে গৃহেই পড়িবে। তবে গোপন গুনাহের কাফ্‌ফারা গোপনেই আদায় করা ভাল। গুনাহ যদি প্রকাশ্য হয় তবে তওবাও প্রকাশ্যে করিবে।

কান্নাকাটি ও বিনয়

গুনাহের তওবার বেলায় তওবার বাক্যই শুধু মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়। গুনাহ খণ্ডনের জন্য খোদার নিকট সকাতরে ফরিয়াদ করিবে, মিনতি সহকারে সম্ভবমত চোখের পানি বিসর্জন করিবে এবং সম্ভবমত সব কিছুই করিবে।

হজরত আবু ওসমান মাগরেবীর নিকট তাহার এক মুরশীদ জানাইল যে, কোন কোন সময় তাহার জেকের করিতে বিরক্তি ভাব আসিয়া পড়ে। তিনি তদুত্তরে বলিলেন—"অন্ততঃ তোমার জাহেরী অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জেকের করিতেছে। এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। শয়তানের উস্‌কানীতেই এরূপ বিরক্তি ভাবের উদয় হইয়া থাকে। শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া থাকে। সে তোমার জিহ্বাকেও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হইতে বিরত করিতে চায়।"

তওবা না করিবার কারণ

গাফলতী, না-ফরমানী এবং গুনাহ হইতে ফিরিবার একমাত্র পন্থা হইল তওবা। অথচ সেই তওবা কেন করা হয় না; এবং কেন উহাতে নানা ওজর ও গড়িমসি আসিয়া পড়ে, সেই কারণগুলি জানা একান্ত দরকার। তওবা করিতে ইচ্ছুক মনের তদারক করা দরকার। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, কতিপয় কারণে মানুষ তওবা হইতে দূরে থাকে, এবং গাফলতী করে। উহার প্রতিকারের ও বিভিন্ন উপায় রহিয়াছে। তওবা না করার কারণ সমূহের মধ্যে ইহাও একটি কারণ হইতে পারে যে, আখেরাতের প্রতি অথবা আল্লাহর দ্বীনের প্রতিই কোনও ঈমান নাই। অথবা দ্বীন ও ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থার অভাব। অথবা নফসের তাবেদারীতে এতই লিপ্ত যে, তওবা করার সাহসই হারাইয়া ফেলিয়াছে। অর্থাৎ দুনিয়াদারীতে এতই মশগুল হইয়া পড়িয়াছে যে, তওবা হইতে একেবারে গাফেল হইয়া পড়িয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাই তওবা হইতে গাফেল থাকিবার কারণ।

তওবা না করিবার আরও কারণ এই যে, আখেরাত অনেক দূরে মনে হয়। উহা ঈমান ও ইতেকাদের সহিত জড়িত। আখেরাতের প্রতি দৃঢ় ঈমান এবং আল্লাহর ভয় ভীতি অন্তরে সঞ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত তওবার আগ্রহ জন্মে না।

তওবা করা সম্পর্কে মানুষের চরিত্রের দীর্ঘ-সূত্রীতা আসিয়া পড়ে, মনে ধারণা হয় একদিন অবশ্যই তওবা করিবে; পীরের

হাতেই তওবা করিব। আবার মনে শয়তানের ওস্‌ওয়াসার উদয় হয়, তওবা করিলে অমুক কাজ বাদ দিতে হইবে, শরীয়তের সব হুকুম আহকাম পালন করিতে হইবে, ইহা বড়ই কঠিন মনে হয়। ইত্যাকার কারণে তওবায় বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। এইরূপ গড়িমসির মধ্যে অনেকেরই জীবন কাটিয়া যায়, জীবনে তওবা আর নসীব হয় না।

উপরোক্ত অবস্থাগুলি মানুষের তওবার পথে বাধা হইয়া থাকে। বাধা যতই থাকুক, আল্লাহর দরবারে নাজাতের আশা করিলে এই সকল দুর্বলতা অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। যে জানিয়া ঘুমায়, তাহাকে কে জাগাইতে পারে? তওবা তো তাহারই জন্য যাহার ঈমান আছে। কবর, হাশর, আজাব, সওয়াব নেকী, বদী, জান্নাত, দোজখ প্রভৃতি আখেরাতের প্রতি যাহার ঈমান আছে। সেই তো উহা চিন্তা করিবে। যে ঐ সকল জিনিসের প্রতি ঈমান হারাইয়াছে, তাহার তওবা নসীব হওয়ার আশা কোথায়?

মোট কথা, নিজের মনের দুর্বলতা ও শয়তানের কঠিন ওস্‌ওয়াসা হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে। ইহাই ঈমানদারের কাজ এবং ঈমানের লক্ষণ। মনকে একান্ত প্রস্তুত করিতে না পারা যায়, তবে নেককার লোকের সাথে উঠা বসা করিবে। তাহাদের নসীহত শ্রবণ করিবে, নিজের মৃত্যু চিন্তা করিবে, কবরস্থানে মাঝে মাঝে যাতায়াত করিবে। ইহাতে আখেরাত সম্পর্কে দেল সজাগ হইবে, এবং তওবার ইচ্ছা জাগ্রত হইবে।

নানাপ্রকারের গুনাহে লিপ্ত থাকিলে যে কোন একটি হইতে তওবা সহজ হইলে উহাই করিবে। এইভাবে একটি একটি করিয়া গুনাহ বর্জন করিতে থাকিবে। তবে তওবার আসল উদ্দেশ্য হইল সব গুনাহ এবং গাফলতী হইতে তওবা করা। যদি এক সংগে সবগুলি গুনাহ ত্যাগ করা সহজ না হয় তবে একটি একটি করিয়া বর্জন করিবার জন্য তওবা করিবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন :—

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ ۔

"আল্লাহ তওবাকারীদিগকে ভাল বাসেন।

আল্লাহর ভয় ও রহমতের উমিদ

তরীকত পন্থীদের জন্য আল্লাহর ভয় এবং রহমতের আশা সম্পর্কে জানা উচিত। মারেফতের পথে উন্নতি লাভ করিতে হইলে অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হওয়া জরুরী। আল্লাহর ভয় এবং রহমতের উমিদ এমন দুইটি জিনিস যাহার কল্যাণে মানুষ গুনাহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হাকিকতের রাস্তায় অগ্রসর হইতে সক্ষম হইতে পারে।

খওফ ও রেজার অতি উচ্চ মর্তবা রহিয়াছে। এ দুইটি পৃথক পৃথক বিষয়। খওফ আল্লাহর আজাবের ভয় এবং রেজা হইল আল্লাহর রহমতের আশা।

'উমিদ' মানুষকে নৈরাশ্য ও হতাশা হইতে রক্ষা করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার সুযোগ দেয়। নিজ আমলের অসংখ্য অপারগতা এবং অজস্র গুনাহ মানুষকে আখেরাতে মুক্তি লাভ সম্পর্কে একেবারে হতাশ ও নিরাশ হইয়া পড়িতে বাধ্য করে। এই আবহাওয়া উমিদই নিরাশার অন্ধকারে আলো দেখায়, এবং উদ্ধার করে। অপর পক্ষে ভয় মানুষকে গুনাহের পথে বাধা দেয়, নেকীর পথে কায়েম রাখে।

রহমতের প্রতি উমিদের ফজিলত

মনীবের শাস্তির ভয়ে যে কোন কাজ করা যাইতে পারে। উহা কর্তব্য পালন এবং মনীবের প্রতি তাবেদারীর প্রমাণ বটে। কিন্তু উমিদ ও মহব্বতে যে কাজ করা হয় উহা অতি উত্তম। কেননা, ভয়ে এবং আশঙ্কায় যে কাজ করা হয়, উহাতে দেলের আগ্রহ ও উৎসাহ নাও থাকিতে পারে। কিন্তু উমিদ ও আশা এমন জিনিস যে, উহাতে মনের সব আগ্রহ ও উদ্যোগ আসিয়া পড়ে। ফলে উহাতে মনীবের প্রতি বিশ্বাস, ভরসা ও তাহার রহমত ও কল্যাণের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ পায়। এই জন্য মনও উহাতে পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত হয়। সুতরাং ভীতির সঙ্গে যাহা করা হয় তাহা অপেক্ষা উমিদ ও ভরষার আমল অতি উত্তম এবং ফজিলত পূর্ণ।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন :—"তোমরা সারা জীবন আল্লাহর প্রতি সৎ ধারণা পোষণ করিবে। অর্থাৎ আল্লাহ যে. বান্দার প্রতি অধিকতর দয়ালু. সীমাহীন ক্ষমা পরায়ন এবং মেহেরবান, এই ধারণা মোমেনের অন্তরে বদ্ধমূল হওয়া দরকার। আল্লাহর অসীম রহমত ও কল্যাণের প্রতি স্পষ্ট ধারণা এবং ইয়াকীন সৃষ্টি হইলে বান্দা আপনা হইতে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হইবে এবং গুনাহ তরক করিয়া আল্লাহর ফরমাবরদারীতে লিপ্ত হইবে। কেননা, আল্লাহর রহমত ও মেহেরবানীর প্রতি ইয়াকীন যত বেশী হইবে ততই দেল শোকর গোজার হইয়া উঠিবে। ফলে ততই আল্লাহর মা'রেফত সহজতর হইয়া উঠিবে।

হজরত (দঃ) এক ব্যক্তিকে মৃত্যু শয্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার অবস্থা কি? সে ব্যক্তি বলিল—"নিজ গুনাহের ভয়ে ভীতি, তবে আল্লাহর রহমতের ভরষা করিতেছি।" হজরত (দঃ) ফরমাইলেন—এরূপ ভরসা কেবল ঐ ব্যক্তিরই হইতে পারে যাহাকে আল্লাহ ভরসা করার শক্তি দান করিয়াছেন। উহার বলেই সে ভরসা করিতেছে।

হজরত ইয়াকুব (অঃ)-এর প্রতি আল্লাহ ওহী নাজিল করিয়া বলিলেন, আমি ইউসুফকে তোমার নিকট হইতে এইজন্য দূর করিয়াছি যে, তুমি বলিয়াছিলে—"তোমরা না জানি তাহাকে একা ফেলিয়া খেলায় মত্ত হও আর তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলে"—তুমি বাঘের ভয় করিলে কিন্তু আমার ভরসা করিলে না"—।

হজরত (দঃ) বলিলেন—আমি যাহা জানি তাহা যদি তোমরা

জানিতে তবে, তোমরা হাস্য ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে চলিয়া যাইতে। ইতিমধ্যে জিবরীল (আ:) নাযিল হইলেন এবং বলিলেন "হে রাসূল। আপনি যেন বান্দাকে ভীত এবং নিরাশ না করেন।" অতঃপর হজরত (দঃ) সকলকে আল্লাহর রহ তের প্রতি ভরসা রাখিতে উপদেশ দেন।

ইয়াহিয়া ইবনে কসম নামক জনৈক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর কেহ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—। "আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? সে বলিল, "আমাকে খোদার সমীপে হাজীর করা হইলে আল্লাহ-পাক জিজ্ঞাসা করিলেন "হে ইয়াহিয়া। তুমি এই সব কি করিয়াছ? আমি একান্ত ভীত হইয়া বলিলাম। হে খোদা। আমি জানিতাম যে, আমার গুনাহ হইতে তোমার রহমত বহু গুণ বেশী। আল্লাহ-পাক জিজ্ঞাসা করিলেন! তুমি কিভাবে উহা জানিয়াছিলে? আমি বলিলাম—অমুক অমুক হইতে। আল্লাহ পাক বলিলেন—হে ইয়াহিয়া! তুমি ঠিকই বলিয়াছ। অতঃপর আল্লাহ পাক আমাকে নাজাত বখশেশ করিলেন এবং জান্নাতের হুকুম দিলেন।

হাদীস শরীফে আছে, কোন এক ব্যক্তি হাজার বৎসর ধরিয়া দোজখে জ্বলিতে থাকিবে। অতঃপর সেই ব্যক্তি "ইয়া হান্নানু, ইয়া-মান্নানু বলিয়া আর্তনাদ করিতে থাকিবে। আল্লাহ পাক তাহাকে দোজখ হইতে বাহির করিয়া হাজির করিতে হুকুম করিবেন। তাহাকে আল্লাহর সমীপে হাজির করা হইলে, আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করিবেন। "দোজখ কেমন দেখিলে?" সে বলিবে—হে পরোয়ারদে· উহা অতি কষ্টের স্থান। অতঃপর আল্লাহ পাক তাহাকে পুনঃ দোজখে

ফিরিয়া যাইবার হুকুম দিবেন। লোকটি বলিবে, "হে রাহমান্নুর-রাহিম। আপনার অসীম রহমতের প্রতি ভরসা করিয়া ধারনা করিয়াছিলাম যে, একবার দোজখ হইতে বাহির করিয়া পুনঃ আমাকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন না।" আল্লাহ পাকের রহমত আসিবে এবং সে ব্যক্তিকে দোজখ হইতে মুক্তি দিয়া জান্নাতে যাইবার হুকুম দিবেন।

'রজার' তাৎপর্য

'রজা' অর্থ সদ্ ধারনা পোষন করা। অবশ্য ইহার অর্থ উমিদ ও আশাও বটে, তবে নেক ও সদ ধারনাপুর্ন আশাই অর্থ। যেমন কোন কৃষক উত্তম বীজবপন করিয়া ভাল ফসলের আশা করিয়া থাকে। ইহাকে 'রজা' বলে। ইবাদত বন্দেগী সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। অর্থাৎ—লোক যদি দুন্ইয়াতে সৎকাজ করে এবং ইহার বদলে আল্লাহর নিকট ভাল ভাল কামনা করে তবে উহাকে 'রজা' বা উমিদ বলা যাইবে। আর যদি কেহ মন্দ বীজ বপন অর্থাৎ বদ্ আমল করে এবং আল্লাহর দরবারে ভাল পরিনাম আশা করে তবে উহাকে বে-ওকুফী ছাড়া আর কি বলা যাইবে? ইহার আর একটি দিক এই যে, মানুষ গুনাহ্ করিয়া মনে মনে অনুতপ্ত এবং লজ্জিত হয় এবং যদি খালেস তওবা না করে, তবে আল্লাহর নিকট কল্যানের আশা করা নিরর্থক।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন :—দ্বীনের কাজ শুধু আশায় চলেনা। গুনাহ্‌ খাতা করার পর যদি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া তওবা করে, এবং আল্লাহর নিকট ভাল উমিদ পোষণ করে তবে উহাই যথার্থ উমিদের মধ্যে গণ্য হইবে। আর যদি তওবা না করিয়া মনে মনে অনুতাপ করিতে থাকে, এবং আল্লাহর নিকট বখষেশের আশা করে তবে উহা নিরর্থক আশা করা হইবে।

আল্লাহ্‌ তায়ালা 'রজা' অর্থাৎ আরজু কারীদের সম্বন্ধে ইরশাদ করিতেছেন :—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ •

অর্থাৎ—যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং যাহারা আল্লাহর দিকে হিজরত করিয়াছে এবং জেহাদ করিয়াছে—একমাত্র তাহারাই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করিবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

রজা ও রহমত

আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন :—আমার রহমত হইতে কেহ নিরাশ না হয়। ফেরেশতাগণও বান্দার মাগফেরাত ও গুনাহ

বখশেশের জন্য দোওয়া করিয়া থাকে। এক স্থানে বলা হইয়াছে—দোজখ শুধু কাফেরদের জন্য এবং মুসলমানদের জন্য ভয়-ভীতির স্থল হিসাবে সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

হজরত (দঃ) উম্মতের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফেরাত চাওয়া স্বত্বেও, যেন সান্ত্বনা লাভ করিতেন না। শেষ পর্যন্ত এই আয়াত নাযিল হয়।

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ عَلَى النَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ •

অর্থাৎ—মানুষের গুনাহের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল। অন্যএক আয়াতও এই প্রসঙ্গে নাযিল হয়।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى •

এবং আল্লাহ অচিরে আপনাকে দান করিবেন যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন :—আমার প্রত্যেকটি উম্মৎ বেহেশতে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আল্লাহর নিকট মাগফেরাত চাহিতে থাকিব।

হজরত (দঃ) আরও ইরশাদ করিয়াছেন—আমার উম্মৎ আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত। তাহাদের গুনাহের কাফ্ফারা এই দুন্‌ইয়াতেই হইয়া যাইবে। হাশরে এক একটি কাফের এক একটি মোমেনের 'ফেদিয়া' স্বরূপ গণ্য হইবে। দুন্‌য়াতে মু'মেনের জ্বর দোজখেরই ন্যায়, উহা তাহার পক্ষে দোজখের আজাবের অংশ স্বরূপ।

বান্দা যখন তওবা করে, আল্লাহ তখন ফেরেশতাগণের নিকট বলিয়া থাকেন—দেখ! আমার বান্দা তওবা করিতেছে এবং আমাকেই একমাত্র ক্ষমাকারী মনে করিতেছে। সুতরাং আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিতেছি।"

হাদীছ শরীফে আছে, মু'মেনের গুনাহ ছয় ঘন্টা যাবত লিখিত হয় না, উহার মধ্যে যদি সে তওবা করে তবে আদৌ গুনাহ লিখিত হয় না।

বর্ণিত আছে—লোকের সব গুনাহই লিখিত হয়। কেহ জিজ্ঞাসা করিল—"যদি সে তওবা করে?" তিনি ফরমাইলেন যে, তখন সব মিটাইয়া দেওয়া হয়। যখন নেকীর এরাদা করে তখন আমলের পুর্বেই তাহাদের নেকী লিখিত হয়। যখন নেক কাজটি করা হয়, তখন উহার পরিবর্তে দশটি নেকী লিখিত হয়। অতঃপর উহা সাত শত গুন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। আর যদি গুনাহ করে তবে উহার পরিবর্তে মাত্র একটি গুনাহ লিখিত হইয়া থাকে।

এক ব্যক্তি হজরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, এবং রোজা রাখি, অন্য কোন ইবাদত করিনা। কেয়ামতের দিন আমার স্থান কোথায় হইবে? হজরত (দঃ) বলিলেন—"তুমি আমারই পাশে থাকিবে, তবে অন্তরে কাহারও প্রতি হিংসা পোষন করিও না।"

হজরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন,—যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে, সে জান্নাতে গমন করিবে। আর মৃত্যুকালে যে এই কলেমা পাঠ করিবে দোজখের আগুন তাহার নিকটে আসিতে

পারিবেনা। যে ব্যক্তি শেরেকের গুনাহ ব্যতিত মরিবে তাহাকে দোজখের আগুন স্পর্শ করিতে পারিবে না। বান্দার প্রতি আল্লাহ মায়ের চেয়ে অধিক মেহেরবান। হাশরের ময়দানে আল্লাহ এতই রহমত নাযিল করিবেন যে, বান্দার দেল খুশীতে পরিপুর্ণ হইয়া যাইবে।

হাদীস শরীফে আছে—আল্লাহর রহমত এক ভাগ দুনইয়াতে দান করিয়াছেন। আর নিরান্নবই ভাগ হাশরের ময়দানের জন্য রাখিয়াছেন। দুনইয়ার সব রহম করম এবং মোহাব্বত। এমন কি, সন্তানের জন্য মায়ের দয়া মায়া সেই এক ভাগ রহমতেরই অংশ। কেয়ামতে আল্লাহর রহমত হইতে কেহই বঞ্চিত হইবে না। এক-মাত্র যাহারা আজলেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে তাহারা ব্যতীত। কেয়ামতের দিন আল্লাহর রহমতের দরিয়া উথলিয়া উঠিবে। সুতরাং যাহার অন্তরে একটা সরিষা-পরিমাণ ঈমান থাকিবে তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

সহীহ বোখারী এবং মোসলেম শরীফে হজরত ওমর বিন হজম কর্তৃক বর্ণিত আছে, এক সময় হজরত (দঃ) একাধারে তিন দিন ঘর হইতে একমাত্র নামাজের সময় ব্যতীত বাহির হইতেন না।

চতুর্থদিন বাহিরে আসিয়া জানাইলেন যে, আল্লাহ পাক তাহার উম্মতের সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে বেহেশতে দাখিল করাইবেন। এই তিন দিন আমি আরও দোওয়া করিয়াছি। ফলে আল্লাহ পাক উহার প্রত্যেকের সংগে সত্তর হাজার করিয়া গুনাহগার মাফ করিয়া দিবেন। বহু হাদীসে বান্দার এইরূপ

বখশেশ নাজাতের খবর রহিয়াছে। সুতরাং আল্লাহর রহমতের প্রতি সদ্ ধারণা রাখা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য।

আল্লাহর খওফ বা ভীতি

যেমন আল্লাহর রহমতের প্রতি উমিদ রাখিতে হইবে। তেমনি আল্লাহর আজাব ও গজবের প্রতি ভয় রাখাও জরুরী। আল্লাহর আজাব এবং কহর হইতে বে-পরোয়া হইয়া যাওয়া কবীরা গুনাহ। আজাবের ভয় এবং রহমতের উমিদই ঈমানের পরিচয়। এই জন্য মুমিনকে আল্লাহর আজাব ও হিসাব নিকাশের প্রতি ভীতি-পোষণ করিতে হইবে।

হজরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতে যদি ঘোষণা করা হয় যে, সারা সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র একজনই বেহেশতে যাইবে না, আমি মনে করিব যে, সেই ব্যক্তি আমিই হইব। যদি ঘোষণা করা হয় যে, সারা মখলুকের মধ্যে কেবল একজনই দোজখে যাইবে, আমিই মনে করিব হয়তো আমিই সেই ব্যক্তি।

ভীতির শ্রেণী বিভাগ

আল্লাহর ভয় একটি উত্তম গুণ। অবস্থা অনুসারে উহার ছওয়াব মিলিয়া থাকে। ভীতি মারেফতেরই পরিচয়। আল্লাহকে

জানিলেই তবে খওফ বা ভীতি আসিতে পারে। আল্লাহর ভীতির জন্য শরীয়ত ও মা'রেফত উভয়ই জানা দরকার।

আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন :—

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ •

আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে কেবল আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করিয়া থাকেন। আল্লাহর ভীতির ফলেই পবিত্রতা, তাকওয়া ও সংযম লাভ হইয়া থাকে। ভীতির ফলে বান্দা নফ্‌সের খাহেশ হইতে সংযম এখতিয়ার করে। ভীত এবং সংযত বান্দাগণের জন্য আল্লাহ সৎপথ লাভ এবং রহমতের খোশ খবরী শুনাইয়াছেন।

هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ •

অর্থাৎ—হেদায়েত এবং রহমত তাহারাই লাভ করিবে যাহারা আল্লাহকে ভয় করে।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ •

অর্থাৎ—আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহর প্রতিও তাহারা সন্তুষ্ট তাহারা ঐ সকল লোক যাহারা আল্লাহকে ভয় করে।

আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন :—

وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ •

অর্থাৎ—আল্লাহ তোমাদের নিকট হইতে শুধু তাক্‌ওয়াই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন :—কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সব লোক একত্রিত হইবে। আল্লাহ ইরশাদ করিবেন—"হে বান্দাগণ। আমি হামেশা তোমাদের কথা শুনিয়াছি। আজ তোমরা আমার কথা শোন। আমি তোমাদিগকে একটি পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেদের জন্য সাধ্যমত পরিচয় করিয়া লইয়াছিলে। আমার প্রদত্ত পরিচয় ছিল এই যে, তোমাদের মধ্যে সেই অধিক সম্মানিত, যে আমাকে অধিক ভয় করে। তোমরা উহা অবজ্ঞা করিয়াছিলে! তোমরা ফলানার পুত্র ফলানার বলিয়া দাবী করিয়াছিলে। সুতরাং আমি আমার প্রদত্ত পরিচয় আজ বলন্দ করিয়া দেখাইব। কোথায় সেই সকল পরহেজগার ও মুত্তাকীগণ! তোমরা আজ আমার ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হও। এই ঘোষনার সংগে সংগে মুত্তাকী এবং পরহেজগার বৃন্দ খোদায়ী ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হইবে এবং বেহেশত লাভ করিবে।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—খোদার ভয়ে যাহার চক্ষু হইতে পানি পাড়িবে উহা এক ফোটাই হউকনা কেন, তাহার প্রতি দোজখের আগুন হারাম হইবে। আল্লাহর ভয়ে যাহার স্থুল দেহ ক্ষীণ হইয়া যাইবে, তাহার সব গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

রওয়ায়েত আছে, সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করিবে।

১। যে নির্জনে খোদার ইবাদত করিয়া কাটাইয়াছে. এক খোদার ভয়ে কান্নাকাটি করিয়াছে। হজরত হান্জালা হইতে

বনিত আছে—একবার হজরত (দঃ) সকলকে নছিহত করিতে-ছিলেন। ইহাতে সকলেই আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করিয়া অস্থির হইল। হজরত হানজালা বলেন—আমিও তাহাদের সহিত কান্না-কাটি করিয়াছিলাম। যখন ঘরে ফিরিলাম তখন ছেলে—মেয়েদের মুখ দেখিয়া সব ভুলিয়া গেলাম। কিছু সময় পরে আবার যখন ঘরের বাহির হইলাম, তখন খোদার ভয় ভীতি অন্তরে জাগরিত হইল। তখন বলিলাম—নিশ্চয়ই আমরা মুনাফিক হইয়া গিয়াছি। পথে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের দেখা হইলে তাঁহাকে ঘটনা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন—'না, তুমি মুনাফিক হও নাই। অতঃপর হজরত (দঃ) এর দরবারে গেলাম। তিনি ফরমাইলেন, যে না, তোমরা মুনাফিক হও নাই।

খওফ সম্পর্কে বুজুর্গানের উক্তি

হজরত শিবলী (রহঃ) বলিয়াছেন, কোন দিন এমন যায় না যেদিন আমি আল্লাহর ভয়ে কাতর না হই, ফলে কোন না কোন শিক্ষা লাভ করি।" হজরত ইয়াহিয়া (রহঃ) বলিয়াছেন—গুনাহের ভয় এবং রহমতের উমিদের মধ্যে মানুষ যেন দুইদিকে দুইটি বাঘের কবলে খেকশিয়াল। তিনি আরও বলিয়াছেন, মানুষ যদি গুনাহকে এমন ভয় করে যেমন দারিদ্রকে ভয় করে তবে সে মুক্তি লাভ করিতে পারে।

ইয়াহিয়া (রহঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, কেয়ামতের দিন কাহার ত্রাস কম হইবে? তিনি বলিলেন—"দুনইয়াকে যে বেশী ভয় করিত।"

হজরত হাসান বসরী (রহঃ) এর নিকট লোকগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, কেহ কেহ আমাদিগকে আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহাদের কথা আমরা শুনিব কিনা? তিনি বলিয়াছেন—যাহারা দুনইয়াতে আল্লাহর ভয় হইতে উদ্ধার করে। আর যাহারা দুনইয়াতে আল্লাহর ভয় হইতে দূরে তাহারা কেয়ামতে ভীষণ ত্রাসের মধ্যে পড়িবার সাহায্য করে।

খোদা-ভীতি হকিকত

ভীতি একটা ধুয়ার মতো অন্তরে সৃষ্টি হয়। উহার কারণ এবং পরিমাণ রহিয়াছে। ভীতির কারণ মুলে মা'রেফত এবং ইয়াকীন। অর্থাৎ—মানুষগণ যখন আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে এবং যেখানে কঠিন অবস্থা সম্পর্কে ঈমান বদ্ধমূল হয়, তখনই অন্তরে একটি বাষ্প সৃষ্টি হয় তখনই উহা সারা দেহ মনকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলে উহাই ভয়ের স্বরূপ।

ভীতির মধ্যে মারেফতের দুইটি স্তর রহিয়াছে। এক হইল মানুষ নিজ আমল অর্থাৎ ইবাদত বন্দেগী স্বভাব এবং আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিচার করা অর্থাৎ উহা যথার্থ ভাবে প্রতি

পালন হইতেছে কিনা। অতঃপর সে তাহা গুনাহ-রাশির কথা ভাবিয়া ভীত সন্ত্রস্থ হয়। উহার একটি দৃষ্টান্ত যেমন কোন ব্যক্তি রাজকীয় ইনাম খেলাৎ ভোগ করিয়াও না-ফরমানী এবং আমানতে খেয়ানত করিয়া থাকে। অতঃপর বাদশার গোচরীভূত হওয়ার কথা জানিতে পারিয়া যেরূপ ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া থাকে উহাই প্রকৃত পক্ষে ভয়ের স্বরূপ।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর অসীম কুদরত, কহর ও গজব প্রত্যক্ষ করিয়া ভীত হওয়া। ইহা ভীতির পূর্বোক্ত ভীতির তুলনায় উত্তম। কেননা, উহা আল্লাহর কুদরত ও গজব লক্ষ্য করিয়া সৃষ্টি হয়। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—আমি তোমাদের চেয়ে অধিক মারেফতের অধিকারী এবং আল্লাহকে অধিক ভয় করিয়া থাকি।

ভয়ের প্রকৃতি হইল, যেমন উহা অন্তরে তেমন শরীয়তে পরিব্যাপ্ত হয়। দুনিয়ার প্রতি আসক্তি হ্রাস পাইতে থাকিলে মনে করিবে যে, অন্তরে খোদার ভয় প্রবেশ করিয়াছিল। যেমন নানা আশা আকাংখায় পরিপূর্ণ মানুষের সম্মুখে যদি হঠাৎ বাঘ পড়ে তবে তাহার মন হইতে হঠাৎ সব কিছু উড়িয়া যায়। ঠিক এইরূপ খোদাকে হাজের নাজের মনে করিয়া ভয় করা উচিত। অথবা কোন লোক মহা-প্রতাপশালী বাদশার কারাগারে বন্দী হইলে তখন তাহার মধ্যে ভীতি বা কাতরতা দেখা দিবে। কোন প্রকার কৃত্রিমতা তাহার মধ্যে থাকিবে না। সর্বদাই নিজ পরিণাম সম্পর্কে ভীত এবং সন্ত্রস্থ থাকিবে। ভয়ে তাহার চেহেরা বিবর্ণ হইয়া যাইবে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভীতির অর্থ এই যে, গুনাহ

এবং আল্লাহর না-ফরমানী হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযত করিবে। এবং আল্লাহর তাবেদারীতে রত রাখিবে। এই হিসাবে ভীতির শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে। খোদা-ভীতির কারণে মানুষ যখন নফ্‌সের খাহেশ হইতে বিরত থাকে তখন ইহার নাম পবিত্রতা। যখন হারাম হইতে পরহেজ করিতে অভ্যস্ত হয় তখন ইহার নাম যোহদ বা সংযম। আর যখন ভীতির ফলে সন্দেহ মুলক কাজ হইতে বিরত থাকিতে পারে তখন উহা তাক্ওয়া বা পরহেজগারী।

অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার উপায়

দ্বীন, ঈমানের স্তরগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম স্তর হইল ইয়াকীন এবং মা'রেফাত। উহার পরেই আল্লাহর খওফের স্থান। কারণ ইয়াকীন ও মা'রেফত ব্যতীত খওফ পয়দা হইতে পারে না। উহার পরে জেহাদ সবর এবং তওবার মন্‌জেল জেহাদ এবং তওবা দ্বারা আবার কয়েকটি হকিকত হাসিল হয়। উহা হইল ইবাদত করিবার আগ্রহ এবং আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে ফিকর। ফিকর ও জিকরের আল্লাহর প্রতি মোহাব্বৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে। আল্লাহর প্রতি মোহব্বতের ফলে তাহার নৈকট্য অর্জিত হয়। বান্দার জন্য ইহাই সর্বশেষ মন্‌জিল এবং ইহাই একমাত্র লক্ষ্য বস্তু। অন্যান্যগুলি এই লক্ষ্যের উপলক্ষ্য ও ইহার অন্তর্গত।

উপরে বলা হইয়াছে যে, মারেফত এবং ইয়াকীনের পরেই 'খওফ' আসে। খওফ তিন কারণে পয়দা হইতে পারে। প্রথমতঃ

মারেফত। কেননা, মো'মেন নিজের হকিকত এবং আল্লাহর মহাত্ম্য সম্পর্কে জানিতে পারিলে তবেই খোদার ভীতি সৃষ্টি হইতে পারে। কেননা, আল্লাহর মহিমাও কুদরত সম্বন্ধে জ্ঞাত হইলে অবশ্যই তাহার মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হইবে। ইহা ব্যতীত নিজের সম্পর্কে জানা দরকার যে, আজলে যাহা লিখিবার তাহা লিখিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নিজের অজ্ঞাত পরিণাম সম্পর্কে ভীতি আসা স্বাভাবিক।

হাদীস শরীফে আছে, হজরত মুসা নবী (আঃ) হজরত আদম (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এতসব নেয়ামতের মধ্যে থাকিয়াও আপনার মসিবতে আমাদিগকে জড়িত করিয়াছেন।" হজরত আদম (আঃ) বলিলেন—"আজল হইতেই আমার আমল নামায় ইহা লিখিত ছিল। উহা খণ্ডনের আমার কোন সাধ্য ছিল না।" হজরত মুসা (আঃ) চুপ হইয়া গেলেন।

এই খওফের ও বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। আল্লাহর মারেফত যতোই বেশী লাভ হইবে, ততই খওফ বাড়িতে থাকবে। কেতাবে লিখিত আছে—হজরত (দঃ) এবং জিবরাইল (আঃ) উভয়ই ক্রন্দন করিতেন। এবং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিতেন—হে খোদা। আমরা তোমার হুকুমের ভয়ে ভীত রহিয়াছি। ইহা মা'রেফতের সর্বোচ্চ স্তর।

আল্লাহর ভীতি অর্জন করিবার দ্বিতীয় পন্থা হইল 'আহলে খওফ' অর্থাৎ আমাকে যাহারা ভয় করে, তাহাদের সংসর্গ এখতিয়ার করা। যদিও ইহা প্রকৃত ভীতি হইতে নিম্নস্তরের। তবুও

ইহা একটি উপায়। তৃতীয়তঃ মা'রেফত পন্থীদের পুস্তকাদি ও জীবনী পাঠ করা—উহার ফলেও আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হইতে পারে।

পয়গম্বর ও ফেরেশতার খোদা-ভীতি

হজরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসূলুল্লাহ (দঃ) জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ফেরেশতা মিকাইল সর্বদা ক্রন্দন করেন কেন? জিবরীল বলিলেন, দোজখ সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে মিকাইল কখনও হাসেন নাই।

মুজাহিদ বর্ণনা করিয়াছেন—হজরত দাউদ (আঃ) একসময় ক্রমাগত চল্লিশদিন যাবত সাজদায় পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা ভীষণ কাতর হইয়া পড়িল। এমনকি, তাহার চোখের পানি গড়াইয়া জমিনে ঘাস গজাইয়া গেল। তখন আল্লাহর নিকট হইতে নেদা আসিল—"হে দাউদ! কেন কাঁদিতেছ? যদি কোন প্রার্থনা থাকে কর, আমি কবুল করিব।" হজরত দাউদ তথাপি কাঁদিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহার তওবা কবুল হইল।

হজরত দাউদ সম্পর্কে অন্য একটি রওয়ায়েতে বর্ণিত আছে—তিনি এক সময় আল্লাহর ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বে-সামাল হইয়া পড়িলেন। তিনি এরূপ মধুর লাহানে জবুর পাঠ করিতেন যে, পশু পক্ষী পর্যন্ত স্থির হইয়া শুনিতে থাকিত। কিন্তু তাঁহার গুনাহের কারণে সেই মর্তবা আর থাকিল না। তিনি ফরিয়াদ

করিলেন—"হে খোদা! আমি একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি। আমার তেলাওয়াত শুনিয়া এখন আর কেহ মুগ্ধ হয় না।" আল্লাহর তরফ হইতে নেদা আসিল—"উহা ছিল মোহাব্বত এবং তবেদারীর ফল। হে দাউদ! তুমি জান, আমি আদমকে নিজ হাতে পয়দা করিয়াছি। তাহাকে মানব জীবন দান করিয়াছি, ফেরেশতা দ্বারা সাজদা করাইয়াছি। তাহার শান্তির জন্য হাওয়াকে পয়দা করিয়াছি এবং তাহাদের উভয়কে বেহেশতে বসবাস করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছি। কিন্তু মাত্র একটি গুনাহের কারণে তাহাদিগকে উলংগ করিয়া বেহেশত হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি। এখন তুমি নিজের গুনাহের কথা চিন্তা কর। তোমার কোনো গুনাহ থাকিলে উহার জন্য তওবা কর, তবেই আমার মনে বান্দার মধ্যে গণ্য হইতে পারিবে।"

সাহাবীগণের খোদা-ভীতি

হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আল্লাহর ভয়ে ভীত হইয়া বলিলেন—হায়! আমি যদি মানুষ না হইয়া একটি পাখী হইতাম। হজরত আবুজর গিফারী বলিতেন, "হায়! আমি যদি মানুষ না হইয়া একটি বৃক্ষ হইতাম।" হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলিতেন, "হায়! যদি আদৌ না হইতাম।" কুরআনের আয়াত শ্রবণ করিয়া হজরত ওমর এত কাঁদিতেন যে, সময় সময় বেহুশ হইয়া পড়িতেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চেহেরায় অশ্রুর দাগ

পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি সময় সময় বলিতেন—"হায়। মা যদি আমাকে গর্ভেই ধারণ না করিতেন।"

হজরত ওমর ফারুক এক সময় কোথাও যাইতেছিলেন। পথে কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনিয়া মনোযোগ দিলেন। তাঁহার কোরআনের এই আয়াতাংশ আসিল—

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝

অর্থাৎ—আল্লাহর আজাব অবশ্যম্ভাবী। তিনি উটের পিষ্ঠ হইতে নামিয়া এক প্রাচীরের উপর পড়িলেন। লোকজন তাহাকে ধরা-ধরি করিয়া গৃহে লইয়া গেল। তিনি মাসাধিক কাল রুগ্ন অবস্থায় শয্যাগত ছিলেন। কেহই তাহার রোগের কারণ সম্পর্কে কিছু জানিতে পারিল না।

হজরত হাতেম আসেম বলিয়াছেন—সংসারে সুখ সম্পদ লাভ হইলে সেজন্য কোনো প্রকার গর্বিত হওয়া চাইনা। কেননা, বেহেশত অপেক্ষা কোন উত্তম স্থান নাই। হজরত আদম (আ:) সেই বেহেশতের অধিবাসী হইয়াও তাঁহার পরিণাম লক্ষ্য কর নিজের ইবাদতের প্রতিও গর্বিত হইয়াও চাইনা। কেননা ইব্লিসের লাখ লাখ বৎসরেই ইবাদত একটি হুকুমের না-ফরমানীতে খাক্ হইয়া গেল।

হজরত আতা-সল্মা প্রসিদ্ধ দরবেশ ছিলেন। তিনি চল্লিশ বৎসর যাবত আসমানের দিকে নজর তুলিয়া দেখেন নাই। হঠাৎ এক

সময় আসমানের দিকে নজর করাইতে তিনি বে-হুশ হইয়া পড়িলেন। ইহার কারণ ছিল আল্লাহর ভীতি।

হজরত সরী সক্‌তী প্রত্যেহ নিজের চেহেরা দেখিতেন। তিনি ভয় করিতেন যে, গুনাহের তাহার চেহেরা মলিন হইয়া গিয়াছে কিনা?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) আল্লাহর প্রতি ভীতি অর্জনের জন্য দোওয়া করিলেন। আল্লাহ তাহার দোওয়া কবুল করিলেন। অতঃপর তাহার অবস্থা এমন হইল যে, তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, না জানি তাহার জ্ঞান লোভ পায়। অতঃপর তিনি উহা বরদাশ্‌ত করিবা' ক্ষমতা লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিলেন।

হজরত হাসান বসরী (রাঃ) এর নিকট কেহ কুশল জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"দরিয়ায় যাহার নৌকা ডুবিয়াছে এবং যে একখানি তক্তা ধরিয়া ভাসিতেছে তাহার অবস্থা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ?" দোজখের গহ্বর হইতে এক হাজার বৎসর পরে এক ব্যক্তি উঠিবে না যদি আমিই সেই ব্যক্তি কিনা? তিনি মৃত্যুর পরে না জানি দোজখ ভোগ করিতে হয় সেই ভয়ে অস্থির থাকিবেন।

খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজের এক বাঁদী ছিল। সে একদিন ভোরে উঠিয়া খলীফার কাছে বলিল—"আমিরুল-মু'মেনীন। স্বপ্নে দেখিলাম, দোজখ প্রজ্জলিত করা হইয়াছে। অতঃপর খলীফাগণকে উহার উপর দিয়া গমন করার জন্য হাজির

করা হইয়াছে। সুতরাং মারওয়ানের পুত্র আবদুল মালেক পার হইতে গিয়া নীচে পড়িয়া গেল। হাঁ। তাড়াতাড়ি বল—উহার পর কি হইল? বাঁদী বলিতে লাগিল—"আবদুল মালেকের পুত্র ওলীদ পুলের উপর আরোহণ করিল—সেও নীচে পড়িয়া গেল। উহার পর সোলায়মান ইব্‌নে আবদুল মালেককে আনা হইল। সেও পড়িয়া গেল। উহার পর আপনাকে আনা হইল বাঁদী এই কথা উচ্চারণ করিতেই খলীফা বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। বাঁদী চিৎকার দিয়া বলিতে লাগিল—আপনি সহীহ সালামতে পার হইয়া গেলেন। বাঁদী চিৎকার দিয়া বলিতেছিল, এদিকে খলীফা মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন।

হজরত হাসান বসরীকে কেহ জীবনে হাঁসিতে দেখে নাই। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, আপনি তো অসাধারণ ইবাদত বন্দেগী করিয়া থাকেন, তথাপী কেন এত বিমর্ষ এবং ভীত থাকেন? তিনি বলিলেন—আমি ভয় করি, কোন গুনাহ করিয়া বসি এবং আল্লাহ আমাকে দেল দিয়া দেন।"

যাহা হউক, 'খওফ ও রজা' সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করা হইল। ইহার সারকথা, মুমিন এই দুইটিই অর্জন করিবে। গুনাহ এবং না ফরমানীর জন্য আল্লাহর আজাব ও গজব হইতে ভীত থাকিবে—আবার রহমতের প্রতিও পূর্ণ উমিদ রাখিবে। আল্লাহর আজাব ও গজব হইতে নিরাশ হওয়া যেমন করিয়া গুনাহ তেমনি রহমত হইতে নিরাশ হওয়াও কুফরী।

—————

অর্জন ও বর্জনের বিষয়

শরীয়ত ও তরিকতের পথে কতকগুলি কাজ অর্জনের এবং কতক গুলি বর্জনের রহিয়াছে। সদগুণ এবং ইবাদত অর্জনের বিষয়। আর বদী ও গুনাহের কাজ বর্জনের বিষয়। সদগুণ গুলিই প্রকৃত পক্ষে নেকী এবং নেকীর উৎস। উহা ব্যতীত মানুষের কোন ইবাদত বন্দেগীই সফল হইতে পারে না। রসূলে করীমকে প্রেরণের উদ্দেশ্যে মানুষকে খোদায়ী আখলাকে বিভূষিত করা। এই জন্য কোরআন-পাক রসূলে করিমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ঘোষনা করিয়াছে—

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

অর্থাৎ—আপনি মহান চরিত্রে বিভূষিত।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন :—মিজানের পাল্লার জন্য উত্তম স্বভাবই হইবে একটি বিশেষ অবলম্বন।

এক ব্যক্তি রসূলে করিমের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দ্বীনের অর্থ কি?" হজরত (দঃ) বলিলেন—উত্তম স্বভাব। লোকটি কয়েকবার এই প্রশ্ন করিল—হজরত (দঃ) প্রত্যেকবারই একই জবাব দিলেন। হজরত (দঃ)এর নিকট প্রশ্ন করা হইল। দুনইয়াতে উত্তম কাজ কি? হজরত (দঃ) ফরমাইলেন—"নেক কাজ।"

এক ব্যক্তি হজরত (দঃ)এর নিকট কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিল—হজরত (দঃ) বলিলেন—"প্রত্যেক গুনাহের পরে নেক কাজ করা যাহাতে গুনাহ ঢাকা পড়িয়া যায় এবং নেকী স্মরণে থাকে।

লোকটি জিজ্ঞাসা করিল—উহা কি ভাবে হইতে পারে ? হজরত (দঃ) বলিলেন, লোকের সহিত সদ্ব্যবহার কর এবং সদভাবে মিলামিশা কর। আল্লাহ্ যাহাকে সংস্বভাব দান করিয়াছেন, সে বেহেশতে যাইবে।

সাহাবীদের কেহ হজরত (দঃ) এর নিকট একটি মেয়ে লোকের কথা বলিল—"হে রসূলুল্লাহ! সে দিনে রোজা রাখে, সারারাত নামাজ পড়ে. কিন্তু তাহার স্বভাবের উৎপীড়নে পাড়া প্রতিবেশী অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।" হজরত (দঃ) বলিলেন—"তাহার এই অসদ্ব্যবহার তাহার সব নেকী এমন ভাবে নষ্ট করিয়া দিতেছে যে, যেমন সিরকা মধু বিনস্ট করিয়া দেয়।" যাহার স্বভাব মন্দ-সে বেহেশতে যাইবে না।

হজরত (দঃ) আল্লাহর দরবারে এই বলিয়া দোওয়া করিতেন—"তুমি যেমন আমাকে সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করিয়াছ। তেমনি আমার স্বভাবও সুন্দর কর। স্বাস্থ্য, নেক স্বভাব এবং পবিত্রতা দান কর। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে আল্লাহর রসূল। দুনইয়াতে উত্তম জিনিস কি ?' হজরত (দঃ) বলিলেন—"সৎ-স্বভাব। উহাকে এই ভাবে ধৌত করে যেমন রৌদ্রের তাপ বরফ গলাইয়া দেয়।'

একদিন কতগুলি মেয়েলোক রাস্তায় খেলাধুলা করিতেছিল। ইতিমধ্যে হজরত ওমর আসিয়া পড়িলেন। স্ত্রী-লোকগণ তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া হজরত ওমর বলিলেন "তোমরা আমাকে ভয় করিতেছ অথচ হজরত রসূলুল্লাহকে ভয় করিতেছ না ? মেয়েলোকগণ বলিলেন—"হজরত (দঃ) এর চেয়ে আপনি অনেক কঠোর।"

হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন—"হে ওমর! তোমার সম্মুখে পড়িতে শয়তানও ভয় পায়।"

হজরত ফুজাইল বলিয়াছেন—"দুর্ব্যবহারকারী দরবেশের চেয়ে সদ্ব্যবহারকারী ফাসেকের সাহচর্য অধিকতর কাম্য।

সৎ-স্বভাবের তাৎপর্য

মানুষ দুইটি জিনিস দ্বারা গঠিত এক হইল শরীর, দ্বিতীয় মন। শরীর প্রকাশ্য এবং মন অদৃশ্য। অথচ এই উভয়েরই রূপ আকৃতি এবং কার্য-কলাপ রহিয়াছে। শরীরের রূপ ও গঠন সুন্দর না হইলে যেমন তাহাকে সুন্দর বলা যায় না—তেমনি মনের কার্য-কলাপ, চিন্তা ও বিকাশ সুন্দর না হইলে উহাকেও সুন্দর বলা যায় না।

সুন্দর স্বভাব বা সৎ-স্বভাব একটি মানসিক গঠন। উহার মূল-ভিত্তি চারিটি। ১। জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা, ২। প্রতিরোধ ক্ষমতা' ৩। কামনা বা প্রবৃত্তি, ৪। বিচার ক্ষমতা।

জ্ঞানই মানুষকে সৃষ্টির উপরের সেরা করিয়াছে। উহার সাহায্য সে ভাল-মন্দ, দোষ-গুন, ন্যায়-অন্যায়, বিচার করিতে পারে। মানুষের মধ্যে জ্ঞান আছে বলিয়াই সে রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন :—

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۔

অর্থাৎ—যাহাকে জ্ঞানের রহস্য বুঝিবার ক্ষমতা দান করা হইয়াছে, তাহাকে বিরাট কল্যাণ দান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাই সকল নেকীর মূল।

রাগ' ক্রোধ মানুষের একটি সহজাত বৃত্তি। উহা জ্ঞানের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা দ্বারা উহার সদ্ব্যবহার হইতে পারে। শাহওয়াত বা কামনার সদ্ব্যবহার ও সৌন্দর্য হইল শরীয়ত ও জ্ঞানের আওতায় ইহার প্রয়োগ। একটি দৃষ্টান্ত যেমন, ক্রোধ একটি শিকারী কুকুরের ন্যায়। কামনা একটি ঘোড়ার ন্যায়। জ্ঞান উহার আরোহী। ঘোড়ার স্বভাব কখনও কখনও অবাধ্য হয়। আবার কখনও একান্ত বাধ্যগত হয়। ঘোড়া এবং শিকারী কুকুর যদি শিকারীর অনুগত না হয়, তবে সে শিকারী করিতে ব্যর্থ হয়। এবং ধ্বংশের মুখে পড়িয়া যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

বিচার শক্তির কাজ হইল সবগুলি শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। যদি উক্ত চারিটি শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় তবে স্বভাব সুন্দর হইতে পারে। যদি উহার কোনটি পূর্ণ এবং কোনটি অপূর্ণ থাকে তবে চরিত্রেও ভার-সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যে কোন শক্তির আধিক্য বা নুন্যতা ক্ষতিজনক।

যাহা হউক। মোটকথা, মানুষের স্বভাব আভ্যন্তরিণ শক্তিরই বিকাশ মাত্র। আভ্যন্তরিণ শক্তিগুলির মধ্যে সমতা থাকিলে স্বভাবও আয়ত্তাধীন থাকে। উহার কোন একটি অতি মাত্রায় প্রবল হইলে অন্যটি দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ ঘটিলে স্বভাবের সৌন্দর্য লোপ পায়। যেমন, ধারণ শক্তির অভাব

অর্থাৎ ধৈর্য্যের অভাব ইহার অর্থ ক্রোধ এবং চাঞ্চল্যের প্রবলতা। দুইটি যদি সমমাত্রায় হয় তবেই স্বভাবের সৌন্দর্য্য রক্ষা হইতে পারে।

উপরোক্ত ভাবে স্বভাবের গুনাবলীর মধ্যে তারতম্য ঘটিলে উহা সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে। উহার উপায় হইল সংযম অভ্যাস করা। ক্রোধ প্রবল হইলে উহা আত্মশক্তি প্রয়োগে আয়ত্তে রাখিতে চেষ্টা করিবে। খুব সততার সহিত নিয়মিত অভ্যাস করিলে ক্রোধ বশীভূত হইবে।

চরিত্রে অহংকার দেখা দিলে নিজকে দীনতা. হীনতা এবং বিনয় ও নম্রতায় অনুশীলনে লিপ্ত হইবে। কৃপনতাকে দানশীলতার অভ্যাস দ্বারা জয় করিবে। এই কামপ্রবৃত্তিকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং অত্যাধিক প্রবলতায় রোজা পালন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিবে!

সৎ-স্বভাব অর্জনের আরও তিনটি উপায়

উপরোক্ত পন্থা-ছাড়া সৎ-স্বভাব অর্জনের আরও তিনটি পথ রহিয়াছে।

১। কেহ কেহ জন্মগত ভাবেই সৎ-স্বভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা অবশ্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। কেহ কেহ ইহা লাভ করিয়া থাকে।

২। যে কোন মুল্যে স্বভাবের সৌন্দর্য বহাল রাখা এবং কোনও মতেই দুর্বল না হওয়া।

৩। উত্তম স্বভাব বিশিষ্ট লোকের সংসর্গ অবলম্বন করা।

উপরোক্ত তিনটি উপায় উত্তম স্বভাব গঠনের সহায়ক। যে ইহার কোনটি লাভ করে সে সৌভাগ্যশালী। পরিনামে সফলতা অর্জন করিতে সক্ষম হয়। যে ইহার সবগুলি হইতে বঞ্চিত সে দুর্ভাগা। তাহার পরিনাম সম্পর্কে শঙ্কিত হওয়ার কারন রহিয়াছে। তবে স্বভাব যদি পুরোপুরি না শোধরায়, এবং কিছু কিছু ভাল থাকে সেই অনুসারে সুফল ও কুফল উভয়ই ভোগ করিবে।

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره - ومن يعمل
مثقال ذرة شرا يره •

আল্লাহ বলেন :—যে অতি সামান্য পরিমাণ নেকী করিবে। সে উহা দেখিতে পাইবে এবং যে সামান্য পরিমাণ বদী করিবে সেও উহা দেখিতে পাইবে।

নফ্‌সের খাহেশ ও অনিষ্টকারিতার পরিচয়

সংসারে মানুষকে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি সেই ভাবেই চলিতে থাকে তবে তো আর কোন কথাই নাই। চক্ষু দেখিবার জন্য, পা চলা ফিরা করিবার জন্য, এইরূপ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

শরীর এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পর দেলের প্রশ্নই প্রধান। দেলকে আল্লাহ তাহার আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

আল্লাহর আনুগত্যের উপায় হইল, এক ইচ্ছা, দ্বিতীয় শক্তি ও লক্ষ্য। শক্তির অর্থ হইল দেলে আল্লাহর মোহাব্বতের উপস্থিতি। কেননা, আল্লাহর প্রতি মোহাব্বত না আসা পর্যন্ত উহা আনুগত্যে রাজী হইবে না। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—নামাজ আমার চক্ষের রোশনী। এইভাবে আল্লাহর জন্য অন্তরে আকর্ষণ অনুভব না করিলে ইমানের অপূর্ণতা মনে করিবে। এবং উহার প্রতিকার করিবে।

দেলে ঈমানের অপূর্ণতার প্রতিকার করার জন্য কয়েকটি পথ অবলম্বন করিতে পারা যায়।

১। কোন নেককার পরহেজগার আলেম বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানী ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বন করা। তাঁহার আমল ও চরিত্র অনুসরন করিবে এবং উহা দ্বারা নিজের আমল ও ঈমানের দুর্বলতা চিনিয়া লইবে।

২। এমন কোন নেককার বন্ধু সংগ্রহ করিবে যে, যে কোন দোষ ক্রটি মুখের উপর চাপাইয়া দিতে কোন দ্বিধা সঙ্কোচ না করে।

৩। শত্রু যাহা তোমার সম্পর্কে বলে তাহা বন্ধুর কথা মনে করিয়া খুব নির্বিকার চিত্তে শুনিবে। শত্রু সাধারনতঃ দোষ বর্ণনা করিয়া থাকে। হয়তো তাহার মুখেই তোমার দোষ-ক্রটি প্রকাশ পাইবে।

৪। পরের যে কাজগুলি তোমার নিকট দোষণীয় মনে হয় উহা ক্রমশঃ বর্জন করিবে। নিজের হইতে বাঁচিবার ইহা একটি উত্তম পন্থা।

উপরোক্ত যে কোন উপায়ে নিজ আমল ও ঈমানের খলনী সম্পর্কে সজাগ হইতে হইবে। ইহা ব্যতীত নিজের পদোন্নতির জন্য আল্লাহর দরবারে একান্ত বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিবে যেন, আল্লাহ মেহেরবাণী করিয়া মন পরিবর্তন করিয়া দেন।

তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজের অভ্যাসগত দুর্বলতা এবং আয়েব হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বাতেনী জেহাদ করিবে। নিজের প্রবৃত্তি জনিত দোষ-ত্রুটী হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করিবে। ইহারই নাম জেহাদ।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন :—

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى - فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى •

অর্থাৎ—নিজের প্রবৃত্তিকে যে গুনাহ হইতে বিরত রাখিয়াছে। জান্নাতই হইবে তাহার বাসস্থান। নিজ প্রবৃত্তিকে সংযত রাখাই হইতেছে আল্লাহর রাস্তায় অগ্রসর হওয়ার উপায়। ওলী আওলিয়াগনের ইহাই পথ এবং ইহাই তাহাদের জীবনের প্রতি মূহুর্তের কাজ। তাহারা নফ্‌সের ধোকা এড়াইবার জন্য মোবাহ, এমন কি, অনেক হালাল কাজ হইতেও পরহেজ করিয়া থাকেন। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে। তিনি হারাম জিনিসের মধ্যে পতিত হইবার ভয়ে সত্তর প্রকার হালাল জিনিস

হইতে পরহেজ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ হালালই হউক না কেন, উহার ভোগ বিলাসের বাড়াবাড়ী নফ্‌সকে ভোগী, লোভী এবং শক্তিশালী করিয়া তুলে। সুতরাং ভোগের জন্য বাঁচিয়া থাকিবার বাসনা প্রবল হয়। ফলে ইবাদতে গাফলতী সৃষ্টি হয়। এই কমজোরীর সুযোগে হারাম আমলও আসিয়া পড়ে।

হালাল দ্রব্য হইতে পরহেজের অর্থাৎ—হালাল হইলেও ভোগের বাড়াবাড়ি হইতে পরহেজের অর্থ দুন্‌ইয়ার ভোগ লালসা কম করা। ইহা করিতে পারিলে আখেরাতের প্রতি মোহাব্বত পয়দা হয়। দুঃখ কষ্টের মধ্যে এক তসবীহ পাঠ করা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে হাজার তসবীহ অপেক্ষা উত্তম। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বাজপাখী পালন করিতে হইলে প্রথমে উহার চক্ষু বন্ধ করিয়া দিতে হয়। যেন ঘরের দ্রব্যাদির প্রতি লোভ না করে। আবার উহাকে উত্তম খাদ্যও দেওয়া হয়। নিজ নফসকেও ঐরূপ বাজের ন্যায় প্রতিপালন করিতে হইবে যেন সে বশীভূত হয়। দুন্‌ইয়ার ভোগবিলাস হইতে নফ্‌সকে অন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। যতক্ষণ নফ্‌স উহার কাম্য বস্তু হইতে বিরত না হইবে ততক্ষণ আল্লাহর আনুগত্যে মাথা ঝুকাইবে না।

হজরত (দঃ) এক সময় বলিয়াছিলেন :—

"আমরা ছোট জেহাদ হইতে বড় জেহাদের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছি। ইহার অর্থ নফ্‌সের কামনার বিরুদ্ধে জেহাদ। ইহা তরবারীর জেহাদ অপেক্ষা গুরুতর ও কষ্টসাধ্য। নফ্‌সের ভোগ বাসনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া নিজ ঈমানের রোশনী

বৃদ্ধি করা এবং আল্লাহর মারেফতের পথে উন্নতি লাভ করার যে চেষ্টা উহাকে রিয়াজাত বলে। হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন— জিবরীল আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন।

أَحْبِبْ مَا أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ ۝

অর্থাৎ—আপনি দুনইয়ায় যাহাই কিছু ভাল বাসুন না কেন, উহা আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেই।

নিয়ত

নিয়ত অর্থাৎ মনের সংকল্প বা এরাদাই সব কাজের মূল। নিয়তের উপরই সব নেকী বদী-নির্ভর করে। হজরত রসুলে করীম (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন :—

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ۝

অর্থাৎ—সব কাজের মূলে নিয়তই হইতেছে প্রধান। আল্লাহ-পাক বান্দার নিয়ত দেখিয়া থাকেন। হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক চেহারার প্রতি নজর করেন না—বরং অন্তরের প্রতি নজর করিয়া থাকেন। হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, নিয়ত অনুসারেই প্রত্যেক কাজের ফলাফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হজ্জের নিয়তে গৃহ পরিত্যাগ করে। সে হজ্জের সওয়াব লাভ

করে। আর যে বিবাহ-শাদী বা ধন-মালের জন্য সফর করে সে কোন নেকী লাভ করিবেনা। হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে,—

আমার বহু উম্মত বিছানায় তাকিয়া হেলান দিয়া মরিবে অথচ তাহারা শহীদ হইবে। আর অনেকে জেহাদের ময়দানে মারা যাইবে, কিন্তু শহীদ হইবে না। লোকে সারাদিন এমন অনেক কাজ করে, ফেরেশতারা উহা নেকী মনে করে কিন্তু আল্লাহ উহা নেকী হইতে খারিজ করিয়া দেন এবং বলেন যে, সে ইহা আমার জন্য করে নাই।

হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—দুনইয়াতে চারিশ্রেণীর লোক রহিয়াছে। প্রথমতঃ এই শ্রেণীর মালদার যাহারা নিজেদের ধন সম্পদ সদ্ব্যয় করে এবং নেক কাজে ব্যয় করে।

দ্বিতীয় এক শ্রেণীর লোক রহিয়াছে, যাহাদের ধন সম্পদ নাই কিন্তু তাহারা ধন সম্পদ হাতে পাইলে নেক কাজ করিবে এই নিয়ত করে। তাহারাও প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করিবে।

তৃতীয় শ্রেণীর লোক যাহারা নিজেদের ধন-দৌলত অসদ্ব্যয় করে। চতুর্থ—এই শ্রেণীর লোক যাহারা মাল হইলে অসৎ পথে ব্যয় করিবার আকাংখা পোষণ করে। ইহারা তৃতীয় শ্রেণীর ন্যায়। এই দুই শ্রেণীর লোক গুনাহগার হইবে।

নিয়তের ফলে ঘরে বসিয়াও জেহাদের সওয়াব পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহর নিম্ন বর্ণিত হাদিসটিতে উহা প্রমানিত হইতেছে। হজরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তবুকের যুদ্ধের দিন হজরত (দঃ) বাহিরে আসিলেন এবং ফরমাইলেন। আমরা

যেমন সফর ও ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিয়াছি, মদীনায় বহু লোক এমন রহিয়াছে তাহারাও এই কষ্টের শামিল। জিজ্ঞাসা করিলাম উহা কি রূপে? হজরত (দঃ) বলিলেন—"আমাদের সহিত তাহাদেরও জেহাদের যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অসমর্থতার কারণে তাহারা আসিতে পারে নাই।"

এক দুর্ভিক্ষের সময় বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি বালুকার স্তূপের উপর দিয়া চলিতে চলিতে মনে মনে চিন্তা করিল—"হায় আমার হাতে যদি রুটি ও গম থাকিত আর অভাব গ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে পারিতাম! সে জমানার পয়গম্বরের নিকট ওহী আসিল—অমুক ব্যক্তিকে জানাইয়া দাও। তাহার সদকা খোদার দরবারে কবুল হইয়াছে।

হাদীস শরীফে আছে—"যে ব্যক্তি দুনইয়ার মোহাব্বত করে এবং দুনইয়ার নিয়ত রাখে তাহার অভাব ও দারিদ্র্যতা ঘুচেনা। আর যে ব্যক্তি আখেরাতের নিয়ত রাখে এবং ইখলাস অর্জন করে তাহার মন সর্বদা উৎফুল্ল থাকে। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—"মুসলমান জেহাদ করে ফেরেশতারা তাহার নাম লিখে এবং উহার সহিত তাহার নিয়তও লিপিবদ্ধ করে।

হাদীস শরীফে আছে—যে ব্যক্তি বিবাহের মোহর আদায় না করিবার নিয়ত করে, সে ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হয়। আর যদি কেহ এই নিয়তে ঋণ করে যে, ঋণ পরিশোধ করিবে না। সে চুরির দায়ে খোদার দরবারে অভিযুক্ত হইবে।

আলেমগণ বলিয়াছেন—"প্রথমে কাজ করিবার নিয়ত শিক্ষা

কর, পরে কাজ করিবে। এক ব্যক্তি নেক কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিল। লোকগণ তাহাকে বলিল—কাজ না করিতে পারিলেও নিয়ত নেক রাখিলে উহাতে নেকী হইবে।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়াছেন—কেয়ামতের দিন প্রত্যেকের নিয়ত অনুসারে বিচার হইবে। হজরত হাসান বসরী (রাঃ) বলিয়াছেন—জাহেরী আমলের দ্বারা বেহেশত অর্জন করা যাইবে না। বরং নিয়তই হইবে বেহেশ্ত লাভের অবলম্বন।

নিয়তের রহস্য

লোকে যে কোন কাজ করে উহার মূলে তিনটি জিনিস রহিয়াছে।

প্রথমতঃ—কাজটি সম্পর্কে জানা। উহার সহিত জ্ঞানেরও সম্পর্ক রহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—ইচ্ছা। উহার সহিত আগ্রহ ও উদ্যমের যোগ রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ—কাজ করার ক্ষমতা।

যেমন, মানুষ যতক্ষণ খাদ্য সম্পর্কে জানেনা, ততক্ষণ তাহার খাওয়ার উদ্রেক হয় না। যখন খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞান হয় তখন উহার ইচ্ছার উদ্রেক হয়। ইচ্ছা হওয়ার পরে যদি মুখে দিবার শক্তি না থাকে। তবে সে খাইতে পারে না। কেননা, তাহার

খাবার শক্তিই নাই। বুঝা যাইতেছে উপরোক্ত তিনটি সমন্বয় ব্যতীত মানুষ কোন কাজ করিতে পারে না।

মানুষের ইচ্ছা চরিতার্থ করা, অর্থাৎ—ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা শক্তির অধীন। শক্তি আবার ইচ্ছার অধীন। কেননা, ইচ্ছার সহিত মানুষের শক্তি প্রযুক্ত হয় এবং ইহাই ইচ্ছাকে প্রবল করে। এজন্য জানার প্রয়োজন হয় না। কেননা, মানুষের অজস্র জিনিস সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও সব জিনিষের প্রতি তাহার ইচ্ছা আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং কোন কিছু জানার ফলে যে ইচ্ছা হইবে ইহা জরুরী নয়। ইচ্ছা মানুষকে কোন কাজের জন্য উদ্যোগী করে। এই জন্য ইহাকে নিয়ত বা সংকল্প বলা হয়।

যে ইচ্ছা মানুষকে কোন কাজে প্রবৃত্ত করে, উহার উদ্দেশ্য কখনও এক কখনও বা একাধিক হইয়া থাকে। কাজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেক ও সৎ হইলে ইহাকে খাঁটি বা খালেস বলা হয়।

দৃষ্টান্ত, কেহ বাঘ দেখিয়া পলায়ন করিল। উহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল জীবন বাঁচান। এইরূপ ধরুন, কেহ যদি কাহারও সম্মানার্থে দাঁড়ায়, তবে উহার উদ্দেশ্য একটিই অর্থাৎ—সম্মান করা। এই উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা নাই। অর্থাৎ—উহা খালেস উদ্দেশ্য। আবার যদি কোন কাজের মধ্যে একাধিক উদ্দেশ্য থাকে, তবে উহার কয়েকটি অবস্থা হইয়া থাকে।

যাহা হউক, সে আলোচনা এখানে পরিত্যাগ করা হইল। মোট কথা, যে কোন কাজের মূলভিত্তি হইল নিয়ত। নিয়ত অনুসারেই কাজের ফলাফল খোদার দরবারে নির্ণীত হইবে।

অনেক কাজ প্রকাশ্যে দেখিতে নেকী হইলেও উহার মুলে যদি অন্য কোনও নিয়ত থাকে তবে নেকী লাভ হইবে না।

হজরত (দঃ) এই জন্যই ইরশাদ করিয়াছেন—মানুষের নিয়ত উহার কাজ অপেক্ষা উত্তম। ইহা সুস্পষ্ট যে নিয়ত দেলের জিনিস, অর্থাৎ অন্তরই নিয়তের স্থান। আর কাজের সম্পর্ক বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংগে। বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই নিয়তকে পুর্ণতা দান করে। অনেকের ধারণা—যখন নেক কাজ করিব, তখন করিয়া লইব। আসলে নিয়তের পরেই কাজ হওয়া উচিত। কারণ শরীর তো ফানা হইয়া যাইবে, দেল দুনইয়াতেও আছে এবং মৃত্যুর পরে রুহের সংগেও থাকিবে। সুতরাং নিয়ত হামেশা অন্তরে থাকা উচিত।

নেক নিয়ত এবং বদ্ নিয়ত

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, কেহ যদি গুনাহের খেয়াল করে আর প্রকৃত পক্ষে গুনাহের কাজ না করে তবে তাহার আমল-নামায় গুনাহ লিখিত হয়। পক্ষান্তরে যদি নেক নিয়ত করে আর সে কাজটি না করিতে পারে তবুও তাহার আমল নামায় নেকী লিখিত হইবে। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন :—

আমার উম্মতের নফসের খেয়াল দেলে আসিলে উহার গুনাহ আল্লাহ পাক মাফ করিয়া দিবেন।

অনেকে এই হাদীসের মর্মে মনে করিয়া থাকে যে, গুনাহের শুধু নিয়ত করিলে গুনাহ হইবে না। আসলে কথাটি তাহা নয়, উহা খুব চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে। কেননা, সব কাজের মুলই তো হইল দেল, আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন :—

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۔

তোমাদের অন্তরে যাহা আছে, চাই তাহা প্রকাশ কর কি গোপন কর, আল্লাহ উহার হিসাব গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ— তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে—উহাদের কার্য্যাবলীর হিসাব গ্রহণ করা হইবে। এ বিষয় সকল আলেমও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ একমত যে, হিংসা কপটতা এবং অহঙ্কারীর জন্য মানুষ আল্লাহর নিকট জওয়াব দিহি হইবে। এইগুলি সকলই দেলের ব্যাপার। অতএব, দেলের পরিচয় ভালভাবে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

দেলের চারিটি অবস্থা এবং স্তর রহিয়াছে। উহার মধ্যে দুইটি এখ্‌তিয়ারী অর্থ যাহা নিজের আয়ত্তাধীন। আর দুইটি অবস্থা গয়র এখ্‌তিয়ারী অর্থাৎ নিজ আয়ত্বের বহির্ভুত। আয়ত্তের বাইরে যে দুইটি বিষয় উহার জন্য মানুষকে দায়ী করা হইবে না। কেননা, উক্ত দুই অবস্থার সম্পর্ক খোদার সহিত রহিয়াছে।

প্রথম দুই অবস্থার পরিচয়

নিয়তের প্রথম দুই অবস্থার জন্য মানুষ নিজে দায়ী। উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, মনে কর তুমি রাস্তা দিয়া চলিতেছ। তোমার পশ্চাতে একটি সুন্দরী রমণী আসিতেছে। তখন যদি তোমার মনে হয় যে, তুমি একটু মুখ ফিরাইলেই তাহাকে দেখিতে পার, এইরূপ চিন্তাকে হাদীসে নফস বা মনের খেয়াল বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার হইল এই যে, তুমি ঘাড় ফিরাইয়া উক্ত স্ত্রী লোকটিকে দেখিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়াছ। উহাকে দেখিবার এই আগ্রহকে প্রকৃতি বা স্বভাব বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় অবস্থা হইল এই যে, তুমি মনের ইচ্ছায়ই উহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহী হইয়াছ। এই অবস্থায় যদি তোমার মনে কোন খায়েশ বা কামনার ভয় নাও থাকে তবুও তুমি দায়ী হইবে। কেননা তুমি মনের নির্দেশেই এই খেয়ালের বশবর্তী হইয়াছ। চতুর্থ অবস্থা হইল এই যে, স্ত্রী লোকটির প্রতি দেখিবার ইচ্ছা তোমার হইল। সেই সংগে যদি তোমার মনে খোদার ভয়ে উদ্রেক না হয়, তবে কার্যতঃ উহা ঘটিয়া যাইবে। উপরোক্ত মনের খেয়াল বা কল্পনার ব্যাপারে মানুষ দায়ী নয়, কেননা এরূপ খেয়াল মনে উদয় হওয়ার ব্যাপারে মানুষ দায়ী হয় না। কারণ, আল্লাহ বলিয়াছেন—মানুষের সাধ্যাতীত কোন ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে দায়ী করিবেন না।

হজরত ওস্‌মান বিন মাৎউন (রাঃ) একদিন হজরত (দঃ)কে বলিলেন—রসুলুল্লাহ। কাম প্রবৃত্তি দমন করিবার জন্য ইচ্ছা হয়—ক্লীব হইয়া যাই।" হজরত (দঃ) বলিলেন—"মুসলমানের জন্য ইহা রোজা রাখিবার তুল্য। উক্ত সাহাবী পুনঃ বলিলেন—"ইচ্ছা হয় নিজ স্ত্রীকে তালাক দেই।" হজরত (দঃ) বলিলেন—"নিকাহ করা আমার সুন্নত।" তিনি পুনঃ বলিলেন, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করি। হজরত (দঃ) বলিলেন—"ইসলামে শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাস হইতেছে হজ্ব ও জেহাদ। তিনি বলিলেন—"মন বলিতেছে, গোশত খাওয়া পরিত্যাগ করি। হজরত (দঃ) বলিলেন—'না, গোশত জুটিলে আমিও খাই। উপরোক্ত ধরনের কথাগুলি সবই মনের খেয়াল—মানুষ ইহার জন্য দায়ী হয় না। অবশিষ্ট দুই শ্রেণীর কথা হইল, উহা মানুষের নিজ ইচ্ছার সহিত জড়িত। উহা হইল মনের নির্দেশ এবং প্রবৃত্তির খাহেশ। এই দুই অবস্থা যেহেতু মানুষের নিজের ইচ্ছায় হয়। সেইজন্য মানুষ দায়ী হইবে।

নিম্নে প্রমাণটিতে বিষয়টি আরো পরিস্কার ভাবে বুঝা যাইবে।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন :—দুই ব্যক্তি যখন পরস্পর মারামারি করিয়া একজন নিহত হয়, তখন উভয়ে দোজখের উপযুক্ত হইবে। সাহাবীগণ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হজরত (দঃ) বলিলেন—তাহারা উভয়ই একে অপরকে হত্যা করার জন্য মারামারি করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা উভয়ই গুনাহগার হইবে।

কাজ নিয়তের সংগে

দুনইয়ার সব কাজ তিনভাগে বিভক্ত।

১। আল্লাহর ইবাদাত বা আনুগত্য ২। মোবাহ বা নির্দোষ ৩। গুনাহ।

"ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়াত" অর্থাৎ—কাজের ফল নিয়ত অনুসারে। হজরত (দঃ)এর এই হাদীসের অর্থ ইহা নয় যে, নিয়ত ভাল হইলে গুনাহের কাজে গুনাহ হইবে না—বরং নিয়ত মন্দ হইলে আমল অধিকতর মন্দ হইয়া পড়ে। যেমন হারাম মাল দ্বারা কেহ মসজিদ নির্মাণ করিল, মুসাফির খানা বা পুকুর তৈয়ার করিল এবং নিয়ত নেক বলিয়া দাবী করিল। ইহাতে গুনাহ আরও বেশী হইবে। কেননা, সে গুনাহের কাজকে গুনাহ মনে করিল না। ইহা ফাসেক হইবার আলামত। মূলে ইহা অজ্ঞতারই কারণ। আর অজ্ঞতা এক পৃথক গুনাহ। যাহার ফলে মানুষ আল্লাহর ফরমাঁবরদারী হইতে দুরে থাকে। যাহার এলেম শিক্ষার নিয়ত দুনইয়া, তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হারাম এবং যে জয়লাভ করার জন্য বহছ-মোনাজেরা করে উহাও হারাম। অনেক ওস্তাদের ধারণা ছেলেরা বিদ্যা শিক্ষা করে, উহা নেক কাজ। তাহাদের নিকটে কোন ত্রুটী নাই। ইহা ঠিক নয়। ডাকাতের হাতে অস্ত্র দেওয়া, যেমন শরাব খোরের হাতে আংগুর। দুনইয়া-দারীর গরজে দ্বীনের এলেম শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়াও তেমনি বুজর্গ ব্যক্তিগণ দুনইয়াদারের সংশ্রব হইতে সর্বদা দুরে থাকিতে

চাহিয়াছেন। তাহারা শাগরেদ অথবা মুরীদের নিয়তের মধ্যে কোন খলনী দেখিলে তাহাকে দূর করিয়া দিতেন।

দ্বিতীয়তঃ—নিয়ত যতই খাঁটি এবং খালেস হইবে সওয়াব ততই বেশী হইবে। যদি বুঝিয়া নিয়ত করিতে পারা যায় তবে এক নিয়ত দ্বারা দশ নেকী লাভ করা যায়।

একটি দৃষ্টান্ত যেমন, কেহ ই'তেকাফের নিয়তে মসজিদে দাখেল হওয়ার নিয়ত করিল। এই অবস্থায় তাহার প্রথম নিয়ত হইবে, মসজিদে যাওয়া। হাদীস শরীফে আছে—মসজিদে যাওয়ার অর্থ খোদার দিদারের জন্য যাওয়া। দ্বিতীয়তঃ—নামাজ পড়ার নিয়ত করা। তৃতীয়তঃ—শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহের কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখিবার নিয়ত করিতে পারে। ইহা এক প্রকার রোজার শামিল। চতুর্থতঃ—এই নিয়ত করা যাইতে পারে যে, মসজিদে অবস্থান কালীন দুন্‌ইয়াদারী হইতে বাচিয়া থাকা যাইবে এবং একাগ্র মনে আল্লাহর চিন্তা করা যাইবে। পঞ্চম—এই নিয়ত করা যায় যে, মানুষের ধোকা ও প্রতারণা হইতে নিরাপদে থাকা যাইবে। ষষ্ঠতঃ—মসজিদে কেহ অন্যায় কাজ করিতে থাকিলে তাহাকে বাধা দেওয়া যাইবে। সেখানে ঈমানদার লোকদের সাথে মিলামিশা করা যাইবে। সেখানে সমস্ত গুনাহ হইতে পাক-পবিত্র থাকা যাইবে। জেকের-আজকার ও মোরাকাবা মোশাহেদা করা যাইবে। এইরূপ একটি নেকীর উপলক্ষে বহু নেকী করা যায় এবং বহুগুণ সওয়াব লাভ করা যায়।

'মুবাহ' কাজের নিয়ত

তৃতীয়তঃ—'মুবাহ' কাজ। এইসব দুন্‌ইয়াবী কাজেও নিয়ত করা আবশ্যক। যদি নিয়ত নেক হয় তবে নেকী হইবে। যদি বদ হয় তবে বদী হইবে। নিয়ত ব্যতীত কোন কাজ করিলে আল্লাহর দরবারে উহা বৃথা হইবে। আল্লাহ বলিয়াছেন—দুন্‌ইয়াতে তোমার অংশ ভুলিয়া যাইও না।" হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—"ছোট বড় সব কাজেরই হিসাব গ্রহণ করা হইবে। এমনকি, কেহ যদি কাহারও কাপড় স্পর্শ করে তবে উহাও জিজ্ঞাসা করা হইবে।"

'মুবাহ' কাজগুলি সম্পর্কেও জানা দরকার। উহা অসংখ্য প্রকার হইতে পারে।

যেমন জুমার দিনে খোশবু ব্যবহার করা। ইহা শুধু বিলাসিতার উদ্দেশ্যে হইতে পারে। অথবা নারীর মন আকর্ষণ করার জন্যও হইতে পারে। আবার নেক উদ্দেশ্যেও হইতে পারে। এবং মসজিদের সম্মানার্থে মুসুল্লাদের আনন্দ দানের উদ্দেশ্যেও হইতে পারে। নেককার ব্যক্তিগণ এইরূপই নিয়ত করিয়া থাকেন। এইরূপ নিয়তে অভ্যস্থ হইলে প্রত্যেকটি কাজই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্য হইতে পারে। এমনকি, স্ত্রী সঙ্গমের কালে বংশ বৃদ্ধির নিয়ত করিলে উহ নেক নিয়তে গণ্য হইবে।

হজরত সুফীয়ান সওরী একবার উল্টা করিয়া কাপড় পরিধান করিয়াছিলেন। লোকে ইহা দেখিয়া তাহাকে সঠিক ভাবে কাপড়

পরিধান করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন—"আল্লাহর জন্যই উল্টা করিয়া পরিধান করিয়াছি এবং ঠিক করিয়া পরিলেও তাহারই উদ্দেশ্যে করিব।"

দরবেশ জাকারিয়া মেহনত মজুরী করিয়া আসিয়া খানা খাইতে বসিলেন। এমন সময় কতক লোক আসিল। তিনি তাহাদিগকে যথাবিহিত সম্মান করিলেন এবং বলিলেন, যদি পেট ভরিয়া না খাই, তবে মজুরী করিতে পারিব না এবং মজুরীর হক আদায় করিতে পারিব না।"

হজরত সুফীয়ান সওরী খানা খাইতেছিলেন। তাহার নিকট কিছু লোক আসিল। তিনি তাহাদিগকে খাইতে অভ্যর্থনা করিলেন না। খাওয়া শেষ করিয়া বলিলেন—"যদি ইহা আমার কর্জ করা খানা হইত তবে অবশ্যই মেহমানদারী করিতাম।"

নিয়ত দেলের বিষয়

নিয়ত কোন কিছু করিবার সংকল্পের নাম। উহা আপনা হইতেই অন্তরে সৃষ্টি হয়। বিবাহ কথায় নেকী আছে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহা বুঝে বলিয়া বিবাহের সময় ইহা বলে না যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যেই এই বিবাহ করিতেছি। নিয়তের জন্য নিয়ত পাঠ করা জরুরী কিছু নয়, বরং নিয়ত আপনা হইতেই অন্তরে সৃষ্টি হইয়া লোককে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃত পক্ষে

উহাই হইবে নিয়ত। যেমন, কেহ পেট ভরিয়া খাওয়ার পর বলে —আমি রোজার নিয়ত করিলাম। অথবা কেহ কাম চরিতার্থ করার পর বংশ বৃদ্ধির নিয়ত করিল। এই ধরণের নিয়ত অর্থহীন। নিয়ত পরিপক্ক হইবার জন্য প্রথমে শরিয়তের প্রতি পূর্ণ ঈমানদার হইতে হইবে। ঈমান পাকা পোখ্‌ত হইলেই তখন নামাজের নিয়ত সহীহ হইবে। নতুবা নামাজ খালেস আল্লাহর জন্য হইবে না এবং উহার নিয়তও শুদ্ধ হইবে না। যেমন ক্ষুধায় কাতর ব্যক্তির খানা খাওয়ার জন্য ভুকের নিয়ত করা। মূলে সে ক্ষুধার তাড়নাই খাইতে বাধ্য। সুতরাং বুঝা গেল যে, মানুষকে যে আগ্রহ কাজে উদ্বুদ্ধ করে উহাই নিয়ত। কেননা, মানুষের মানসিক আগ্রহ তাহার নিজ ইচ্ছার বাহিরে। মানুষের অভ্যাসও আমল অনুসারেই নিয়ত সৃষ্টি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি খাঁটি দ্বীনদার হইবে, আল্লাহকে চিনিবে তাহার আগ্রহও সেই ভাবে হইবে এবং অন্তরে সেই ধারনাই বদ্ধমূল হইতে থাকিবে। মানুষ যখন এই স্তরে উন্নতি লাভ করে এবং নিয়তের আসল হকিকত জ্ঞাত হয় তখন নিয়ত না হওয়ার কারণে তাহাকে অনেক ইবাদত পরিত্যাগ করিতে হয়। কেননা, সেই ইবাদতের জন্য মনে নিয়তের সন্ধান লাভ করে না। ইবনে শিরীন (রহঃ)কে হাসান বসরী (রহঃ)এর ন্যায় একজন অতিবড় আলেম ও দরবেশের জানাজার নামাজ পড়াইবার জন্য যখন আহবান করা হইল। তখন তিনি উহা অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, জানাজার নামাজ পড়াইবার জন্য এখনও আমার নিয়ত প্রস্তুত হয় নাই।

হজরত তাউস (রহঃ) এর নিকট কেহ দোওয়া চাহিলেন। তিনি বলিলেন—"নিয়ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।" তাহার নিকট লোক হাদীস শ্রবণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন—"নেক কাজে ইখলাস থাকা জরুরী। যখন নিয়ত দুরুস্ত হইবে তখন বয়ান করিব।"

এক দরবেশ ব্যক্তি বলিয়াছেন—"আমি এক রোগী দেখিতে যাইবার জন্য নিয়ত ঠিক করিতেছি। এখন পর্যন্ত উহা হয় নাই এবং যাইতেও পারি নাই।

মোটকথা, মানুষের মনে যতক্ষণ দুনইয়ার প্রভাব বদ্ধমুল থাকে, দ্বীনের কাজে নিয়ত পোখ্‌ত হওয়া সম্ভব নহে। এমন কি, ফরজগুলিও ঠিক ভাবে আদায় হয় না। নিয়ত সম্পর্কে আরও জানা আবশ্যক। যেমন কেহ যদি এই নিয়তে তাহাজ্জুদ না পড়ে যে, ঘুম নষ্ট হইলে ফজর কাজা হইতে পারে তখন ঘুমানই উত্তম। শুধু ইহাই নহে, ইবাদতে মন না বসিলে এই নিয়তে কিছুক্ষণ নির্দোষ কৌতুক দ্বারা মন তাজা করিয়া পুনঃ ইবাদত করিতে আরম্ভ করিবে।

হজরত আবু উবায়দা বলিলেন—"আমি মাঝে মাঝে চিত্ত বিনোদন করিয়া অবসাদ দুর করিয়া লই যাহাতে প্রশান্ত মনে ইবাদত করিতে পারি।"

নিয়তের অন্যান্য দিক

উপরের বর্ণনা দ্বারা বুঝা গিয়াছে যে, কাজের মুল জিনিসটি হইল নিয়ত। অর্থাৎ—কাজ ঘটিবার মূলে থাকে নিয়ত। এখন এই নিয়তের প্রকার ভেদ দেখিতে হইবে। অনেকের ইবাদতের উদ্দেশ্য বা নিয়ত এই থাকে যে, উহার ফলে দোজখের আজাব হইতে বাঁচা যাইবে।

কেহবা, বেহেশত লাভের নিয়তে ইবাদত করিয়া থাকে। ইহারা উভয়ই লোভী এবং নিজ নফ্‌সের গোলাম। দোজখের ভয়ে ইবাদতের দৃষ্টান্ত ঐ অবাধ্য পশুর ন্যায় যে প্রহার ব্যতীত বশীভূত হয় না। ইহারা কেহই আল্লাহর সন্তুষ্টি চাহে না। সেই সব বান্দার ইবাদত-ই খালেস, যাহারা শুধু মাত্র আল্লাহর জন্যই ইবাদত করিয়া থাকে। যাহারা নিজ মাহবুবকে মোহাব্বতের নজরে দেখিয়া থাকে। সেই সব বান্দাই খাঁটি। তাহারা একমাত্র আল্লাহর রেজামন্দী ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে না। বান্দার বন্দেগীর আদর্শ এবং নিয়ত একমাত্র ইহাই হওয়া উচিত। অর্থাৎ—নিজের দেহ ও মন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা এবং অন্য সব কিছু ভুলিয়া যাওয়া।

জনৈক অলী আল্লাহ আল্লাহকে খাবে দেখিলেন। আল্লাহ বলিতেছেন—সকলেই আমার নিকট চায় আর বায়েজীদ আমাকে চায়।

খাঁটি নিয়ত ও উহার মর্ম

নিয়তের বিশুদ্ধতার উপরই ইবাদতের ফলাফল নির্ভর করে। নিয়ত খাঁটি না হওয়া পর্যন্ত ইবাদত খোদার নিকট কবুল হওয়ার যোগ্য হয় না। এই হিসাবে ইখলাস কি জিনিস তাহা জানা দরকার।

আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন :—

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ *

অর্থাৎ—তাহাদিগকে দ্বীন সম্পর্কে খালেস নিয়ত ব্যতীত ইবাদত করার হুকুম দেওয়া হয় নাই।

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে :—

أَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ *

অর্থাৎ—সাবধান একমাত্র খালেস দ্বীনই হইতেছে আল্লাহর।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—আল্লাহ ফরমান যে, "ইখলাস আমার এক রহস্য। যাহার মধ্যে খুলুসিয়াত আছে, তাহাকে আমি দোস্ত জানি।'

হজরত (দঃ) তদীয় সাহাবী মায়ায (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলেন. "হে মায়ায, ইবাদত অল্পই কর। কিন্তু উহা ইখলাসের সাথে হওয়া চাই।

হজরত (দঃ) মা'রুফ করখী নিজ দেহে চাবুক মারিতেন এবং

বলিতেন—হে নফ্‌স, ইখলাস হাসেল কর। যাহাতে নাজাত লাভ করিতে পার।

আবু সোলাইমান বলিয়াছেন—দুনইয়াতে সেই ব্যক্তিই নেকবখত যে প্রতিটি পদক্ষেপ ইখ্‌লাসের সাথে করে।

আবু আইয়ুব নাহিস্‌তানী বলিয়াছেন—নিয়ত করার চেয়ে নিয়তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা অধিক কঠিন কাজ।

এক বোজর্গ ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর কেহ স্বপ্নে দেখিল এবং জিজ্ঞাসা করিল যে, মৃত্যুর পরে তাহার সহিত কি ব্যবহার করা হইয়াছিল। বোজর্গ ব্যক্তি বলিলেন—ছোট বড় সব নেকীই পাল্লায় তোলা হইয়াছে, এমন কি দুনইয়াতে একটি বিড়াল পালিতাম, উহাও পাল্লায় দেখিতে পাইলাম। কিন্তু গাধাটি দেখিলাম না, কারণ উহা মারা গেলে আনা-লানাহুল্লাহে বলিয়াছিলাম। না বলিলে উহাও দেখিতে পাইতাম। একবার কিছু সদকা দিয়াছিলাম। ইহাতে লোকগণ আমার দিকে খুব প্রসংশার দৃষ্টিতে তাকাইল। আমি ইহাতে খুব খুশী হইলাম। এই খুশীর কারণে আমার সদ্‌কা একেবারে নগন্য হিসাব হইয়াছিল।

আবেদ ও শয়তান

বনী ইসরাইল বংশে একব্যক্তি আবেদ ও দরবেশ ছিলেন। লোকে তাহাকে জানাইল যে, কিছু সংখ্যক লোক একটি বৃক্ষ পূজা করিতেছে। আবেদ ব্যক্তি উহা শুনিয়া খুব রাগান্বিত

হইলেন এবং কুড়াল দিয়া গাছটিকে কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। পথে শয়তান মানুষের রূপ ধরিয়া আসিয়া বলিল—আপনি কেন গাছটি কাটিতে যাইতেছেন, আপনাকে খোদা গাছটি কাটিবার হুকুম করেন নাই। আবেদ ব্যক্তি শয়তানের কথা গ্রাহ্য করিলেন না। সুতরাং তর্ক বিতর্ক হইতে উভয়ের মধ্যে ধ্বস্তা ধ্বস্তি শুরু হইয়া গেল। ইহাতে আবেদই জয়ী হইলেন, শয়তান পরাজিত হইল। শয়তান বলিল—আচ্ছা এখন আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি আপনাকে কয়েকটি কথা বলিতেছি যদি ভাল মনে করেন, তবে শুনিবেন। শয়তান বলিল—আপনার তো শুধু ইবাদতের সঙ্গে সম্বন্ধ। আপনি তো পীর দরবেশ বা নবী পয়গাম্বর নহেন। সুতরাং গাছটি নিয়া এত মাথা ঘামাইতেছেন কেন? আপনি গাছটি কাটা ক্ষান্ত দিন। পুনঃ তর্ক বিতর্ক শুরু হইল এবং মারামারিতে পরিনত হইল। এবারও দরবেশই জয়া হইলেন। শয়তান বলিল, আচ্ছা! আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি আপনাকে আঁরেকটি কথা বলি। যদি ভাল মনে করেন তবে রাখিবেন। আপনি এই গাছটি ধ্বংশ করিলে কি লাভ হইবে? যাহারা এই গাছটি পুজা করে তাহারা আরেকটি লাগাইয়া নিবে। তার চেয়ে শুনুন। আমি আপনাকে প্রত্যহ দুই দিরহাম করিয়া দিব, আপনি গাছটি কাটিতে যাওয়া ত্যাগ করুন। আবেদ চিন্তা করিলেন—মন্দ কি! এক দিরহাম নিজে ব্যয় করিব—আর এক দিরহাম আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিব। দরবেশ ফিরিয়া আসিল। শয়তান অতঃপর প্রত্যহ দুই দিরহাম করিয়া দিতে শুরু করিল। কয়েকদিন এই ভাবে চলিল।

তারপর দিরহাম দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। আবেদ রাগ হইয়া পুনঃ কুঠার নিয়া গাছ কাটিতে চলিল। পথে আবার সেই শয়তান দেখা দিল। এবারও সেই কথা কাটাকাটি ও মারামারি হইল। কিন্তু আজ আবেদ পরাজিত হইলেন। আবেদ খুব পেরেশান হইলেন এবং বলিলেন--পুর্বে দুইবার পরাজিত করিয়াছি। এবার কেন হারিলাম ? শয়তান বলিল—পুর্বের দুইবার আপনি ইখলাসের সাথে লড়িয়াছেন, উহাতে আপনার জয় হইয়াছে। এবার আপনার সেই ইখলাস নস্ট হইয়া গিয়াছে। এবার আপনি নিজের স্বার্থে যুদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই আমি আপনাকে কাবু করিতে পারিয়াছি। জানিবেন, নফসের অনুগত বান্দা আমার সহিত জয়ী হইতে পারে না।

ইখলাসের তাৎপর্য

নিয়তের সহিত ইখ্‌লাসের সম্পর্ক রহিয়াছে। ইখলাস অর্থ খাঁটি—অর্থাৎ যাহার সহিত কোন কৃত্রিম জিনিসের মিশ্রণ নাই। নিয়ত যেহেতু সব কাজের মুল এবং কাজ যতক্ষণ খালেস নিয়তে অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর জন্য করা না হয় ততক্ষণ উহা দ্বারা কোন ফল লাভ হয় না। এই জন্য নিয়ত খাটি অর্থাৎ নিঃস্বার্থ হইতে হইবে। সুতরাং ইখলাসের মূল কথা জানা আবশ্যক।

নিয়তের ক্ষেত্রে ইখলাসের একটি দৃষ্টান্ত যেমন রোজা রাখা। এখন রোজাদার যদি নিয়ত পোষণ করে যে, যাহা হুউক. রোজা রাখার ফলে খাওয়া হইতে পরহেজ করা দরকার ছিল উহাও

হইল। একদিনের খরচাও বাঁচিয়া গেল এবং পাকানোর ঝামেলা হইতেও বাঁচা গেল। এই নিয়ত খালেস হইল না। এইরূপ হজ্ব করার সাথে বায়ু পরিবর্তন, দেশ দেখা, মক্কা-শরীফ হইতে সস্তা মূল্যে জিনিস পত্র খরিদ করিয়া আনা প্রভৃতি নিয়ত করিলে হজ্বের নিয়ত খালেস রহিল না। তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করার সাথে সাথে ঘরে চোর ঢুকিতে পারিবে। এইরূপ নিয়ত থাকিলে, দুনইয়া তলবের উদ্দেশ্যে দ্বিনী ইলম শিখিলে, ভিক্ষুকের চিৎকারে অতিষ্ট হইয়া খয়রাত দিলে ইত্যাদি ধরণের নিয়ত রিয়াকারীর মধ্যে গণ্য হইবে। ইহাতে নিয়ত বিশুদ্ধ হইবে না, অর্থাৎ— নিয়তের ইখলাস নষ্ট হইয়া যাইবে।

নিয়ত খাঁটি বলিয়া তখনই গণ্য হইবে, যখন নিয়তের মধ্যে নিজের কোন পার্থিব স্বার্থ জড়িত না হইবে। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছিলেন—ইখ্‌লাসের অর্থ হইতেছে এই যে. মোমেন শুধু এই নিয়ত রাখিবে যে, একমাত্র আল্লাহ্‌-ই তাহার মনিব। অতঃপর সে আল্লাহর হুকুম আহকামগুলি আমল করিবে।

মানুষ যতক্ষণ নিজের অহমিকা বা অস্তিত্ব বিসর্জন দিতে না পারে ততক্ষণ তাহার মধ্যে ইখলাস আসিতে পারে না। এই-জন্য বোজর্গানের দ্বীন ইখলাসকে সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ বলিয়াছেন।

হাদীস শরীফে আছে, কেহ যদি সারা জীবনের মধ্যেও একটি কাজ ইখলাসের সাথে করিয়া থাকে তবে উহা দ্বারা নাজাত হইতে পারে। নিয়তের সহিত নিজের পার্থিব স্বার্থ জড়িত করিলে উহা কখনও ইখলাস বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

ইখ্লাস অর্জনের উপায়

ইখ্লাস অর্জন করিতে হইলে দুনইয়াদারী পরিত্যাগ করিতে হইবে। দুনইয়া হইতে বিমুখ হইলে তখন দিলে আল্লাহর দিকে রুজু হইবে। তখন আল্লাহর কাজে এমন খাঁটি নিয়ত পয়দা হইবে যে, প্রত্যেকটি কাজই তখন আল্লাহর জন্য হইবে।

তখন পানাহার প্রভৃতি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হইবে।

দুনইয়া যাহার মনে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পক্ষে রোজা নামাজও ইখ্লাসের সাথে করা কঠিন হইয়া পড়ে।

বহু আলেম এবং আবেদ এই বিষয় ধোকায় পতিত হইয়া থাকেন। তাহারা মনে করে যে, তাহারা ইখ্লাস অর্জন করিয়াছেন; কিন্তু মূলে রিয়াকারিতে পরিণত হইয়াছে। জনৈক বোজর্গ ব্যক্তি বলিয়াছেন, "আমি তেত্রিশ বৎসর পর্যন্ত জমাতের প্রথম রাকাতে দাঁড়াইতাম। একদিন সামান্য বিলম্বে আসাতে পিছনের কাতারে স্থান নিতে হইল। সেদিন আমাদের নিকট স্পষ্ট হইল যে, আমার প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মূলে নিজেকে লোকের নিকট একজন পাকা নামাজী প্রমাণ করার উদ্দেশ্য ছিল এবং আমি খুব সকালে নামাজে হাজীর হইয়া থাকি। এখন মনে হইতেছে যে, আমার পূর্বের সব নামাজই আমার উপর কাজা দাঁড়াইয়াছে। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, বহু কষ্টকর ইবাদতও মনের সামান্য ধোকায় একদম বেকারও বরবাদ হইয়া যায়। সেইজন্য ইখলাস্ জিনিসটি উত্তমরূপে চিনিতে হইবে এবং

সেই অনুসারে আমল করিতে হইবে। বস্তুতঃ ইহা খুবই কঠিন কাজ। যে কোন ইবাদতই ইখলাসের সাথে করা না হইলে উহা একদম বেকার হইয়া যায়। এবং উহা দ্বারা সওয়াবের কোন আশাই করা যায় না।

ইখলাসের দৃষ্টান্ত

বোজর্গানে দ্বীন বলিয়াছেন, আলেমগণের দুই রাকাত নামাজ মূর্খ লোকদের সারা জিন্দেগীর নামাজ হইতে উত্তম। কেননা, মূর্খ ব্যক্তি, আলেমের রহস্য এবং ইখলাস সম্পর্কে অবগত নহে। সে মনে করে, সে খুবই ইবাদত করিতেছে। এবং উহা যথা সাধ্য লোকের গোচরে আনিবার জন্য চেষ্টাও করিয়া থাকে। কোন ইবাদত লোকের গোচরে হইয়া থাকিলেও উহাও সুযোগ পাইলেই লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা একদম রিয়াকারী! এইরূপ ইবাদতে কোনই সওয়াব হয় না। উহার মধ্যে কতগুলি খুবই সূক্ষ্ম। এই গুলি সবই রিয়ার মধ্যে গণ্য হয়। প্রথমতঃ কেহ একাকী নামাজ পড়িতে থাকিলে কোন লোকজন আসিতে দেখা গেলে মনে মনে এরূপ ধারণা জাগরিত হওয়া যে, ধীরে পড়া যাক। স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, এই নামাজ কি ধরণের হইল।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ মনে করে যে, তাহার নফ্‌স শয়তানের তাবেদারী করিতেছে। সুতরাং সে নফসের এই ওস্‌ওয়াসার

প্রতি আমল দিল না। তখন শয়তান নফস্‌কে অন্য কথা শিক্ষা দেয়। হয়তো নফসের খুব আয়োজন উদ্যোগের সাথে নামাজে উদবুদ্ধ করে এবং সংগে সংগে এই খেয়ালও সৃষ্টি করিয়া দেয় যে, লোকে তাহাকে খুব নামাজী এবং মুত্তাকী মনে করিবে।

তৃতীয়তঃ কেহ প্রথমে চুপে চুপে নামাজ পড়িতে অভ্যাস করিল। পরে যখন নামাজ খুব ঠিক হইল এবং কেরাতাদি দুরুস্ত হইল তখন প্রকাশ্য ভাবে নামাজ পড়িতে শুরু করিল। উহার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ভাবে রিয়া গোপন থাকে। চতুর্থতঃ হইল নামাজের মধ্যে আল্লাহর ভয়-ভীতি। তখন শয়তান তাহাকে এই ভাব জাগাইয়া দেয় যে, তুমি খোদার দরবারে এখন কোন্ মর্তবার অধিকারী হইয়াছ? তখন সে লোকের নিকট নিজ মর্তবা জাহির করিবার জন্য নামাজের মধ্যে খুব বিনয় ও ভীতি জাহির করিতে থাকে।

ইবাদতের মধ্যে মানুষের এইরূপ নানা ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এইগুলি জানা ও বুঝা একান্ত দরকার। অন্যথায় সব ইবাদতই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

রিয়া এবং ইখলাস

মানুষের ইবাদতে যখন রিয়ার ভাগ বেশী হইয়া পড়ে। তখন ইবাদতের সওয়াবের পরিবর্তে আজাবেরই বেশী উপযুক্ত হয়। আর যদি রিয়া এবং ইখ্‌লাস সমান সমান হয়, তবে সওয়াবও

লাভ হইবে না এবং আজাবও হইবে না। আর যদি রিয়ার পরিমাণ সামান্য এবং ইখ্‌লাস বেশীর ভাগ হয় তবে অবশ্য সওয়াব কিছু মিলিতে পারে। তবে রিয়া যুক্ত ইবাদত সম্পর্কে এক হাদীসে আছে যে, আল্লাহ কেয়ামতে বলিবে, "যাহার জন্য এই ইবাদত করিয়াছিলে, তাহার নিকট ইহার প্রতিদান চাও।" তবে নেক কাজের সহিত কোন কোন পার্থিব স্বার্থের নিয়ত জায়েজ আছে। যেমন হজ্বের কালে ব্যবসা করা। অবশ্য ইহাতে হজ্বের সওয়াব পুরাপুরি না পাইলেও হজ্ব বৃথা যাইবে না। কেননা, তাহার আসল উদ্দেশ্য হজ্ব করা। সেইরূপ জেহা-দের উদ্দেশ্যে কাফেরদের সাথে জয় লাভ করা এবং মাল ও গনীমত লাভ করা। তবে যদি গনীমত লাভ করাই জেহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে সওয়াব লাভ করা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

সিদ্‌ক বা সততা

সিদ্‌ক বা সততা শরীয়ত ও মা'রেফতের উভয় দিক কার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। উহাও ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। উহাও ইস-লামেরই একটি দিক। সিদ্‌ক গুণে পরিপক্ক হইলে সিদ্দীক নামে অভি-হিত হইয়া থাকে। সিদ্দীকিন সম্পর্কে আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন :—

رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۝

অর্থাৎ—সিদ্দীকগন যাহা আল্লাহর সহিত অংগীকার করিয়া ছিল—তাহা তাহারা পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছে।

হজরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, মানুষ কখন পূর্ণতা অর্জন করে ? তিনি বলিলেন—সিদ্‌ক অর্থাৎ সততা অর্জনের পরে।

সিদ্‌ক ছয়টি বিষয়ের সহিত সম্পর্ক যুক্ত। এই ছয়টি স্তর অতিক্রম করিলে সে সিদ্দীক নামে অভিহিত হইতে পারিবে। বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোন বিষয়ে সে মিথ্যা বলিবে না। অথবা এমন কোন কথা বলিবে না—শ্রোতা যাহার ভিন্ন পথ করিতে পারে। যদিও মূলে কথা সত্যই হয়। কিংবা কোন সদুদ্দেশ্যেও মিথ্যা বলিবে না—যেমন কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ মিটাইবার জন্য মিথ্যা বলা জায়েজ অথবা দুইজন মুসলমানের মধ্যে আপোষ করিবার জন্য মিথ্যা বলা জায়েজ। এই জাতীয় মিথ্যাও পরিহার করিবে।

দ্বিতীয়তঃ—সত্য বলার এবং সত্যের প্রতি কায়েম থাকার জন্য সর্বদা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে।

ইহার ব্যাখ্যা এই যে, মানুষ মুখে বলে—ইয়্যাকা না'বুদু'—অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি।" এই উক্তি করায় দুনইয়ার দাস হওয়া মিথ্যারই শামিল। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, (পয়সার দাস, টাকার দাস) যাহারা টাকা পয়সার গোলামী করে। মানুষ যখন সংসার এবং লোভ লালসা হইতে মুক্ত হইবে। এমনকি, নিজেকেও ভুলিয়া যাইবে। যাহা কিছু করিবে। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করিবে, নিজের তরফ হইতে ভালমন্দ নেকী বদী কিছুই কামনা করিবে না। মানুষ এই স্তরে পৌঁছিলে সিদ্দীকের দরজা লাভ করিবে।

তৃতীয়তঃ—ইহা নিয়তের সহিত সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর ইচ্ছার উপর পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ করিবে। আল্লাহর ইবাদতের সহিত অন্য কোনও চিন্তা বা খেয়াল মিশ্রিত করিবে না। ইহা ইখ্‌লাস বা সিদ্‌ক উভয়ই। ইবাদতের মধ্যে অন্য কোন কিছুর চিন্তা স্থানদিলে উহাতে সিদ্‌কের দরজা অবশিষ্ট থাকিবে না।

চতুর্থতঃ—দান-খয়রাতের প্রতি অধিক আগ্রহী হওয়া। এমন কি, নিজের জান পর্যন্ত কোরবানী করার প্রয়োজন হইয়া পড়িলে পশ্চাদপদ না হওয়া।

পঞ্চমতঃ—আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত থাকা। নিজের চেয়ে যোগ্যতর লোক থাকিলে তাহার হাতে নিজের পদ সম্পূর্ণ করা।

ষষ্ঠতঃ—নিজের গুনানুসারে কথা বলা।

অর্থাৎ—ভিতর ও বাহিরে এক হওয়া। কাহাকেও ধোকা দিতে চেষ্টা না করা। তবে বাহিরের চেয়ে ভিতরই ভাল হওয়া সিদ্দীকের জন্য অধিকতর শোভনীয়। যদি তাহা না হয় তবে ভিতর বাহির এক হওয়াও সৌভাগ্যের বিষয়।

সপ্তমতঃ—আখেরাতের পথে এবং আল্লাহর রাস্তায় খাটি ভাবে আগ্রহান্বিত থাকা। আল্লাহ সিদ্দীকের পরিচয় নিম্ন আয়াতে পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ اٰمَنُوْا بِهٖ

ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ • أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ •

অর্থাৎ—যাহারা আল্লাহ এক, রসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে। অতঃপর কোন সন্দেহ পোষণ করে নাই এবং জেহাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়াছে, তাহারাই সিদ্দীক। সিদ্‌কের পূর্ণ পরিচয় উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ ও রসূলের প্রতি পূর্ণ ঈমান এবং জান মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাই সিদ্দীকের পরিচয়।

মুহাসিবা ও মুরাকিবা

আত্ম পর্যালোচনা ও ধ্যান।

হজরত (দঃ) বলিয়াছেন :—কেয়ামতে প্রত্যেকের আমল-নামা মীজানে তোলা হইবে। যদি কাহারও শরিষা পরিমাণ নেকী থাকে তবে উহারও প্রতিদান দেওয়া হইবে। আর যদি শরিষা পরিমাণ বদী থাকে তবে তাহাও দেখিতে পাইবে। আল্লাহ পাক এই ওয়াদার সাথে বলেন :—

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ •

অর্থাৎ—মানুষ ভবিষ্যতের জন্য যাহা প্রেরণ করিয়াছে, তাহা সে দেখিতে পাইবে। হাদীস শরীফে আছে, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ সময়কে চারিভাগে ভাগ করিয়া লয়। এক সময় সে নিজের কার্যাবলী পর্যালোচনা করিয়া দেখে, অর্থাৎ—সারাদিন সে কি আমল করিয়াছে—কি নেকী এবং কি বদী করিয়াছে তাহা খতাইয়া দেখে। উহার পর এক নির্দিষ্ট সময় আল্লাহর নিকট নিজ গুনাহ-খাতা ও ত্রুটী বিচ্যুতি এবং অন্যান্য মকসুদের জন্য দোওয়া করিয়া থাকে। নিজে হালাল রুজী কামাই করার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করিয়া লয়। বাকী সময় কোন নির্দিষ্ট কাজে কাটায়। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতে তোমার আমল নামা হাতে আসিবার পূর্বে নিজ নফ্‌সের হিসাব গ্রহণ কর।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন :—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۝

অর্থাৎ—হে ইমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য্যের সহিত কাজ কর, নফ্‌সের সহিত কাজ কর, যাহাতে নেককার হইতে পার।

জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন, এই দুনইয়া একটি ভোগের জায়গা। সেই তেজারত নফসের সংগে। উহার লাভ লোকসান হইল বেহেশত এবং দোজক। সুতরাং তাহারা এই তেজারতে নফ্‌সকে শরীক করিয়াছেন এবং শরীক কারবারে পাঁচটি শর্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

উহা হইল—১। মুশারিতা, ২। মুরাকিবা, ৩। মুহাসিবা, ৪। মুয়াকিবা, ৫। মুয়াতিবা।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ক্রমান্বয়ে নিম্নে বর্ণিত হইবে।

প্রথমতঃ—মুশারিতা অর্থাৎ—ব্যবসা সম্পর্কিত পারস্পারিক চুক্তি। এই চুক্তি এই জন্য প্রয়োজন যে, অংশীদারের মনে হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা আসিতে পারে এবং শত্রুও হইয়া দাঁড়াইতে পারে। সুতরাং অংশীদারের সহিত কড়াকড়ি ভাবে এই সব হিসাব নিকাশ করা উচিত। নফসের সহিত হিসাব নিকাশ দুই দিনের কারবার নহে। ইহা জীবন ভর চলিতে থাকিবে। যদি দুনিয়াদারী কাজ কারবার হয়, তবে উহা এক সময় মিটিয়া যাইবে। আখেরাতের পুঁজি সঞ্চয়ের ব্যাপারেই হিসাব নিকাশ রাখিতে হইবে।

জ্ঞানীবৃন্দ বলিয়াছেন, প্রত্যহ ফজরের বাদে নফ্‌সের হিসাব নেওয়া উচিত। বলিবে—প্রতিটি দমে জীবন শেষ হইয়া যাইতেছে। যে শ্বাস বাহির হইয়া গেল, উহা আর ফিরিবে না। শ্বাস খতম হইয়া গেলে তেজারতের পাট চুকিয়া যাইবে। সুতরাং নেক কাজ যাহা করিবার তাহা সময় থাকিতে করা উচিত। কেননা, এই জীবনের পরে আর কোন কাজ নাই। তখন শুধু কাজের ফলই ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং জীবনের এই সময় অমূল্য জ্ঞান করিবে। বৃথায় জীবন কাটিয়া না যায়।

হাদীস শরীফে আছে—কেয়ামতে লোকের দিন রাত চব্বিশ ঘন্টার পরিবর্তে চব্বিশটি সঞ্চয় গৃহ মিলিবে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি নেক কাজ করিয়াছে, সে একটি সঞ্চয় গৃহ খুলিলেই এত খুশী হইবে যে, যদি সারা দোজখবাসীকে উহার নূরের কিছু অংশ দান করে, তবে তাহারা দোজখের মুসিবত ভুলিয়া যাইবে। অতঃপর অপর

একটি গৃহ খোলা হইবে। উহা সংকীর্ণ এবং অন্ধকার হইবে। উহা হইতে এমন দুর্গন্ধ বাহির হইবে যে, যদি জান্নাতবাসীরা উহার ঘ্রাণ পায় তবে উহা তাহাদের জন্য দোজখ তুল্য হইয়া যাইবে।

অতঃপর আর একটি খাজানা খোলা হইবে। উহা একেবারে খালি থাকিবে। যাহারা দুন্‌ইয়াতে একেবারে নিষ্কর্ম এবং বেহুদা সময় ক্ষেপন করিয়াছে এবং গুনাহ বা সওয়াব কিছুই করে নাই—সেই সময়ের খাজানা গৃহটি শূন্য থাকিবে। উহা দেখিয়া তখন সে ব্যক্তি লজ্জায় শরমে আধোবদন হইবে। এইরূপ চব্বিশটি ঘন্টায় চব্বিশটি খাজানা একে একে খোলা হইবে। দুন্‌ইয়াতে সেই ঘন্টা গুলিতে যে যে কাজ করিয়াছিল, তাহারই উপযুক্ত পুরস্কার সেখানে দেখিতে পাইবে।

অতএব, দুন্‌ইয়াতে প্রতিটি মুহূর্ত যাহাতে নেকীর ভিতর দিয়া অতিবাহিত হয় সেই চেষ্টাই সকলের করা উচিত।

নিজের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুনাহ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে দেহের সাতটি প্রধান অঙ্গ যেমন—তেমনি দোজখের সাতটি দরজা রহিয়াছে। প্রতিটি অংগের গুনাহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়া দোজখে প্রবেশ করিবে। এই চিন্তা করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গুনাহ হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে। যদি তোমার অংশীদার নফ্‌স অবাধ্য হইয়া তেজারতের ক্ষতি করে, লাভের পরিবর্তে নোকছান করে, তবে নফ্‌সকে রিয়াজত দ্বারা বশীভূত করিবে। তোমার রিয়াজতের ফলে যে বাধ্য হইবে।

আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন :—

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ •

অর্থাৎ—তোমার অন্তরে যাহা রহিয়াছে আল্লাহ তাহা অবশ্যই জ্ঞাত, সুতরাং উহা হইতে বাঁচিয়া থাক। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন :—সেই ব্যক্তিই দুরদর্শী, যে নিজের নফ্সের মুহাসিবা করে। অর্থাৎ হিসাব গ্রহণ করে। অতএব, এই উদ্দেশ্যে প্রত্যহ সকালে নিজ নিজ নফ্সের মুহাসিবা করিবে।

দ্বিতীয় মুয়াকিবা—অর্থাৎ—রক্ষণাবেক্ষণ। অর্থাৎ—ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শরীকদারদের হাতে পুজি বা পণ্য দ্রব্য দিয়া অংশীদারকে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। এইভাবে নফ্সের কার্য্যাবলী তদারক করা ও লক্ষ্য রাখা দরকার। ইহাই মুয়াকিবা। শরীকদারকে স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দিলে সে অবাধ্য হইয়া যাইবে। এবং নিজ লোভ লালসার ফলে ব্যবসার পুজি সব নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

নফসের প্রতি লক্ষ্য রাখার উপায় হইল এই যে, তাহাকে ইহা বুঝাইতে হইবে যে, আল্লাহ বান্দার প্রতিটি কার্য দেখিতেছেন। নফসের প্রতি এই খবরদারীই মুয়াকিবা।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করিতেছেন :—

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى •

অর্থাৎ—বান্দা কি জানেনা যে, আল্লাহ সব কিছু দেখিতেছেন? এক হাবসী হজরত (দঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল—যদি আমি

তওবা করি, তবে আমার গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে কিনা? হজরত (দঃ) বলিলেন—হ্যাঁ"। হাবশী পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল—আমারগুনাহ কি আল্লাহ দেখিয়া থাকেন? হজরত (দঃ) বলিলেন, "হাঁ।" ইহা শুনিয়া হাবশী চিৎকার দিয়া জমীনে পড়িয়া গেল এবং সংগে সংগে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۔

অর্থাৎ—আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সর্বদা লক্ষ্য করিতেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ মহিমাময় তাহার কুদরত ও তাহার গুণে সব মুগ্ধ থাকাই কামালিয়াতের আলামত।

এক পীর তাহার বহু সংখ্যক মুরীদের মধ্যে একজনকে খুব পেয়ার করিতেন। অন্যান্য মুরীদগণ ইহাতে খুব হিংসা করিত। একদিন তিনি সব মুরীদগণকে ডাকিয়া প্রত্যেকের হাতে এক একটি পাখী দিয়া বলিলেন—যাও। কোন নির্জন স্থানে গিয়া এগুলিকে জবেহ করিয়া আন। মুরীদগণ সকলেই কোন না কোন নির্জন স্থানে গিয়া সেগুলিকে জবেহ করিয়া আনিল। কিন্তু তাহার সেই প্রিয় মুরীদটি পাখীটি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল। পীর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মুরীদ বলিল—হুজুর! আমি কোন নির্জন স্থান পাইলাম না। যেখানেই গিয়াছি সেখানেই আল্লাহ পাক দেখিতেছেন বলিয়া একিন হইল। সুতরাং আমি পাখী জবেহ করিতে পারিলাম না। পীর অতঃপর সব

মুরীদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"দেখ সে সর্বত্রই খোদাকে হাজের নাজের দেখিতে পায় এই জন্যই ইহার সম্মান।

বিবি যুলায়খা হজরত ইউসুফ (আঃ)কে নির্জনে আহ্বান করিল। অতঃপর নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজ পুজার প্রতিমাটি কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়া দিল। হজরত ইউসুফ বলিলেন—"হে যুলায়খা! তুমি এই প্রাণহীন পাথরকে লজ্জা করিতেছে। যাহার কিছুই দেখিবার বা শুনিবার শক্তি নাই। আর আমার খোদা সর্বত্র হাজের নাজের রহিয়াছেন আর আমি তাহাকে শরম করিব না?

খলীফা হজরত ওমর (রাঃ) একদিন মক্কা শরীফ যাইতেছিলেন—পথে এক ক্রীতদাস রাখালের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে একপাল বকরী চরাইতে বাহির হইয়াছিল। হজরত ওমর রাখালকে বলিলেন—"একটি বকরী আমার নিকট বিক্রয় কর।" রাখাল বলিল—আমি এই বকরীর মালিক নই। সুতরাং আমি তাহার বিনা অনুমতিতে ইহা বিক্রয় করিতে পারিব না। হজরত ওমর বলিলেন, তোমার মালিক ইহা কি করিয়া জানিবে, তুমি বলিবে—"মালীক না দেখুক, খোদা,তা সব কিছুই দেখিতেছেন।" হজরত ওমর সামান্য এক রাখালের হৃদয়ে এহেন ঈমানের পরিচয় পাইয়া তিনি ক্রন্দন করিলেন এবং তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন! তিনি বলিলেন—তুমি দুন্‌ইয়াতেও মুক্তি লাভ করিলে এবং আখেরাতেও মুক্তি লাভ করিবে।"

মুরাকিবার প্রকার ভেদ

মুরাকিবার দুইটি প্রকার রহিয়াছে। এক হইল অতি উচ্চস্তরের মুরাকিবা। উহা হইল এই যে, এক খোদা ব্যতীত অন্য কোনদিকে দিলরুজু না হওয়া। ইহা সিদ্দীকিনের মুরাকিবা। দ্বিতীয় প্রকার মুরাকিবা হইল—জাহির পোরোস্ত অর্থাৎ—লোক দেখানো মুরাকিবা। উচ্চস্তরের লোকদের মুরাকিবা হইল এই যে, তাহাদের চক্ষু খোলা থাকিলেও দেল তাহাদের আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকে। হজরত আবদুল ওয়াহেদ (রহঃ) নামে জনৈক বুজুর্গের নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, দুনইয়ার সব কিছু ভুলিয়া একমাত্র খোদার দিকে দেল নিবিষ্ট থাকে এমন লোক দুনইয়ায় আছে কিনা? তিনি বলিলেন—হাঁ? আছে। দাঁড়াও একটি লোক আসিতেছে তাহাকে দেখ। দেখা গেল, একজন লোক আসিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কাহাকে কাহাকে দেখিতেছেন? তিনি বলিলেন—"কাহাকেও দেখিতে পাই নাই।" হজরত জাকারিয়া (আঃ) এক সময় পথ দিয়া যাইতেছিলেন—তিনি ঐ সময় একটি মেয়ে লোকের গায়ে হাত দিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। লোকগণ ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, আমি ইহাকে একটি প্রাচীর মনে করিয়া ধরিয়াছিলাম।"

এক বুজুর্গ ব্যক্তি কোথাও যাইতেছিলেন। দেখিতে পাইলেন—কতগুলি লোক তীর ছোড়াছুড়ি করিতেছে। একজন উহা হইতে

দূরে চুপ চাপ বসিয়া রহিয়াছে। বুজুর্গব্যক্তি তাহার সহিত কথাবার্তা বলিবার জন্ম অগ্রসর হইলেন। লোকটি বলিলেন—"কথা বলার চেয়ে উত্তম এইযে, খোদার জিকির কর।"

হজরত নূরী (রহঃ) এভাবে মুরাকিবায় বসিতেন যে, তাহার শরীরের একটি পশম যেন নড়িত না।

হজরত শিবলী (রহঃ) তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহা কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছ? তিনি বলিলেন—বিড়ালের কাছে। বিড়াল যখন ইঁদুর শিকার করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসে, তখন সে একান্ত স্থির হইয়া বসিয়া থাকে।" ইহা সিদ্দীকীনের মুরাকিবা।

হজরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী নাজিল হইয়াছিল যে, দুনইয়াদার আলেম আমার পথ হইতে মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে, তাহাদের হাত হইতে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ-তায়ালা পরিনামদর্শী মানুষকে ভাল বাসেন। তাহারা নফ্‌সের খাহেশের বেলায় হুসিয়ার থাকে।

আল্লাহর পথে মানুষের বিচক্ষণতার মূল্য এই যে, কাজের মধ্য যেটুকু দুনুইয়াবী স্বার্থ আসিয়া পড়ে সেটুকু চিনিয়া খাঁটি আল্লাহর জন্য কাজ করা।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন গুনাহ করে, তখন তাহার সদ্‌জ্ঞান লোপ পাইয়া থাকে। হজরত ইসা (আঃ) বলিয়াছেন:—মানুষের যে কোন কাজ তিনটির একটি হইবে। হয়তো একেবারে বাতিল অথবা একেবারে খাঁটি অথবা সন্দেহ যুক্ত। সুতরাং বাতিল ও সন্দেহযুক্ত কাজগুলি সম্পর্কে অবহিত হও।

গুনাহের মুরাকিবা

গুনাহের মুরাকিবা হইল—উহা স্খালনের জন্য চেষ্টা করা। অর্থাৎ কি ভাবে গুনাহ হইতে মুক্তি লাভ হইতে পারে, উহার জন্য তওবা ইসতেগ্‌ফার ও কাফ্‌ফারা আদায়ের চেষ্টা করা।

নিয়ামতের মুরাকিবা

অর্থাৎ—দুন্‌ইয়ায় আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত দর্শন করা এবং উহা ভোগ করিয়া আল্লাহর মারেফত অর্জন করা। এই অবস্থায় নিজের দেহমন সব আল্লাহর দরবারে হাজির রাখিবে। শয়নে উপবেশনে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রাখিবে। এই জন্যই তাফা-ক্কুর অর্থাৎ চিন্তাও ধ্যানকে প্রধান ইবাদত বলা হইয়াছে। যেহেতু মানুষ নিজ প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়া আল্লাহকে ইবাদত করিয়া থাকে। কেননা, মানুষের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহর পরিচয় বহন করে।

সৃষ্টি ও মখ্‌লুক সম্পর্কে মুরাকিবা

দুন্‌ইয়ার সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ রহিয়াছে। আল্লাহর এই বিচিত্র সৃষ্টিতে কোথায় না আল্লাহর পরিচয় রহি-য়াছে? আসমান, জমীন, চন্দ্র, সূর্য, অগনিত তারকা রাজি,

আলোক-অন্ধকার, দিন-রাত্র, বৃক্ষ-লতা, পত্রপুষ্প, সকলেই আল্লাহর অতুলনীয় শক্তি এবং কুদরতের পরিচয়। এই সকলের প্রতি চিন্তা করিলে আল্লাহর মা'রেফত অন্তরে না আসিয়া পারে না। এই সৌন্দর্য এবং সৃষ্টি কৌশল দ্বারা যাহারা আল্লাহকে চিনিতে পারে তাহারা সিদ্দীকের মর্তবা হাসিল করে।

যুহদ্ বা সংযম

যুহুদের মুরাকিবা হইল পানাহারের কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করা। অতি সামান্য খাইয়া তৃপ্ত থাকা এবং আল্লাহর রাস্তায় মশ্‌গুল থাকা শহীদানের কাজ।

মুহাসিবা

তৃতীয় স্তর হইল মুহাসিবা। মুহাসিবা অর্থ পর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ সব কাজগুলি চিন্তা ধারণা করিয়া হিসাব নিকাশ করিয়া দেখা। ইহার উপযুক্ত সময় হইল রাত্রিতে শয্যাগ্রহণের পর। সারাদিনের কাজ কর্মগুলির ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, হক-না হক এবং নেকী-বদী হিসাব নিকাশ করিয়া দেখিবে। উহার ফলাফল নিশ্চয়ই ভাল হওয়ার আশা করা যায়। সারাদিনের কাজ কারবারগুলি মনে মনে হিসাব করিলে অবশ্যই ভুল ত্রুটী এবং গুনাহ খাতা

মনে পড়িবে, গুনাহ গুলির জন্য অবশ্যই মনে লজ্জা আসিবে এবং নেকীর জন্য খোদার শোকরিয়া আদায় করিবে। গুনাহের কথা মনে পড়া মাত্র আল্লাহুর দরবারে তওবা করিতে থাকিবে। কাহারও হক নষ্ট করিয়া থাকিলে উহা আদায় করিবে। এভাবে কত গুনাহ-খাতা হইতে পারে তখন চিন্তা করিলে মনে জাগরিত হইবে। এইরূপ হিসাব-নিকাশ নেওয়ার ফলে পরবর্তী দিনের জন্য হুশিয়ার হইতে পারিবে। আজ যে ধরণের গুনাহ হইয়াছে। উহার কারণ কি কি ছিল সেগুলি হিসাব গ্রহণের সময় একে একে মনে হইবে। হয়তো কোন দুনইয়াদার, ফাসেক বা সেই শ্রেণীর কোন লোকের সংসর্গের কারণে গুনাহে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। হয়তো বা নিজের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে মিথ্যা বলিতে হইয়াছে। এইরূপ কত কারণ হইতে পারে তাহা মুহাসিব, গ্রহণের করার অবশ্যই মনে জাগরিত হইবে। সুতরাং পুনরায় যাহাতে সেই সব ফাঁদে জড়িত হইতে না হয়, সেই জন্য সজাগ থাকিবে। বজুর্গ ব্যক্তির বয়স যখন ষাইট বৎসর। তখন সে নিজের গুনাহের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, সে যদি পড়ে দৈনিক একটি গুনাহ করিয়া থাকে তবে ষাইট বৎসরে একুশ হাজার ছয়শত গুনাহ করিয়াছে। এই কথা মনে হইতেই সে আল্লাহর ভয়ে চিৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। লোকে যখন তাহাকে দেখিতে আসিল তখন তাহার জান বাহির হইয়া গিয়াছে।

মানুষ কতই গাফেল। সে সারাদিন আমোদ প্রমোদ এবং

হাসি তামাশায় কাটাইয়া দিতে চায়। আবার দেখা যায় যদি কেহ কিছু তসবীহ পাঠ করে তবে হাতে ঝুলাইয়া বেড়ায় এবং দিনে যে কত হাজার তসবীহ পাঠ করে উহাও লোককে জানাইবার জন্য বাহানা করে। ইহা চিন্তা করে না যে, প্রতি দিন একটি করিয়া গুনাহ করিয়া থাকে, তবে জীবনে তাহার কত গুনাহ জমা হইয়া থাকিবে।

হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমার হিসাব নিকাশ খোদার দরবারে হইবার পূর্বেই নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ কর। তিনি নিজে রাত্রিতে যখন ঘরে ফিরিতেন, তখন নিজের উপর দোররা মারিতেন এবং নিজকে ভৎ'সনা করিয়া বলিতেন—বল, আজ কি কাজ করিয়াছ?

ইবনে সালাম রহমাতুল্লাহ একবার একটি কাঠের বোঝা মাথায় বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। লোকগণ দেখিয়া বলিল—উহা আপনার শোভা পায়না। তিনি ইহার জওয়াবে বলিলেন—"আমি নিজ নফসের হিসাব নিতেছি। উপরোক্ত ঘটনাগুলি আত্ম-বিচারের নিদর্শন রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ মনজিল মুয়াতিবা

নিজ নফসকে ঢিলা দিলে উহা একান্ত অবাধ্য ও দুঃসাহসী হইয়া উঠে। অতঃপর উহাকে বশে আনা খুবই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এইজন্য নফসের প্রতি অতি সাবধান ও সতর্ক থাকিতে

হইবে। যেমন কখনও যদি কোন হারাম নজর হইয়া পড়ে বা হারাম দ্রব্য হইয়া বসে তবে চক্ষুকে কিছুদিন একেবারে বন্ধ রাখিবে এবং হারাম দ্রব্য খাওয়ার শাস্তি স্বরূপ উপবাস থাকিবে। এইরূপ নিজের উপর শাস্তি নিলে নফস উপরোক্ত ধরণের অবাধ্য হইতে ফিরিয়া থাকিবে।

বুজুর্গানের দ্বীন নফসের অবাধ্যতার জন্য প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শাস্তিদান করিতেন। এক বুজুর্গ ব্যক্তি ঘটনাক্রমে কোন এক না-মুহাররম স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিয়াছিলেন। উহার শাস্তিস্বরূপ নিজেই নিজের হাত আগুনে জ্বালাইয়াছিলেন। বনী ইসরাইলের মধ্যে এক ধার্মিক ব্যক্তি নির্জন বাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে এক রমণী তাহার সেই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দুর্মতি প্রকাশ করিল। আত্ম-সংযম নষ্ট হইতেছে দেখিয়া ধার্মিক ব্যক্তি আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু সে আশ্রমে প্রবেশ করিল। সাধু ব্যক্তি তাহার এই ক্রিয়া কলাপের জন্য অনুতাপ দগ্ধ হইয়া নিজকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিল। সে তাহার পা দুখানিকে এমন শাস্তি প্রদান করিল যে, উহা চিরতরে অবশ হইয়া গেল। এবং দেহের অঙ্গরূপে উহা আর কোন কাজেই আসিল না। হজরত জুনায়েদ বুগদাদী (রহ:) বর্ণনা করিয়াছেন। একদিন ইবনুল কামিনী (র:) নামে জনৈক ব্যক্তির রাত্রে স্বপ্ন-দোষ হইল। তিনি রাত্রিতেই গোছল করিবার ইচ্ছা করি-লেন। কিন্তু শীত বেশী থাকার দরুন শৈথিল্য দেখা দিল। তিনি অগত্যা স্থির করিলেন যে, শুধু গোসলই নহে বরং গোসল

করিয়া সেই বস্ত্র শরীরে শুকাইতে হইবে। সুতরাং উহাই করিয়া নফসের শৈথিল্যের শাস্তি প্রদান করিলেন।

একবার কোন এক বুজুর্গ ব্যক্তি কোন গায়র মুহাররম স্ত্রীলোককে দেখিয়া ফেলিলেন। ইহাতে তিনি প্রমাদ গণিলেন এবং পানি পান করা বন্ধ রাখিয়া নিজ নফ্‌সকে শাস্তিদান করিলেন।

হজরত হাস্‌সান (রাঃ) একবার এক বাগানের দিকে যাইতেছিলেন। বাগানটি তাহার খুব পছন্দ হইল। তিনি কাহারও নিকট বাগানের মালীকের খোঁজ নিলেন। এই প্রশ্ন করার পর তাহার এই অনাবশ্যক উৎসাহ সম্পর্কে খেয়াল হইল। নফসের এই অবান্তর উৎসাহের শাস্তি স্বরূপ এক বৎসর যাবত নফল রোজা রাখিয়াছিলেন।

হজরত তাল্‌হা (রাঃ) একবার এক খেজুর বাগিচায় নামাজ পড়িতেছিলেন। এমন সময় তাহার সম্মুখে দিয়া একটি অতি সুদৃশ্য পাখী উড়িয়া গেল। উহাতে তিনি তাহার নামাজের রাকাত বিস্মৃত হইলেন। উহার সদকা স্বরূপ তিনি সমগ্র বাগানটিই সদকা করিয়া দিলেন।

মালিক বিন দয়ীম বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় রিবাহ্ মায়ের আনফুসী নামে জনৈক দরবেশ গৃহে প্রবেশ করিয়া মায়ের সংগে দেখা করিতে চাহিলেন। মা তখন নিদ্রিতা ছিলেন। উহা আসরের নামাজের শেষ ওয়াক্ত ছিল। তিনি বলিলেন—"ইহা ঘুমাইবার কেমন সময় ?" রিবাহ এই অনধিকার চর্চ্চার জন্য নিজকে শুধু ভৎ'সনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না বরং নিজের প্রতি ইহার

শাস্তি গ্রহণের নিমিত্ত এক বৎসর পর্যন্ত মাথায় বালিশ দিয়া শয়ন করিতেন না।

মাজমা নামে এক ব্যক্তি উপরে ছাদের দিকে তাকাইতেই এক রমণীর প্রতি চক্ষু পতিত হইল। অতঃপর তিনি কসম করিলেন যে, তিনি আর কখনও উপরের দিকে তাকাইবেন না।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি প্রাচীন বুজুর্গানে দ্বীনের আত্ম-নিগ্রহের দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ সামান্য অসর্তকতার জন্যও তাহারা নিজ নিজ নফ্‌সকে শাস্তিদান করিতেন। ইহার অর্থ এই নহে যে, উপরোক্ত ঘটনাগুলিতে বর্ণিত শাস্তিগুলি শরীয়ত নির্দ্ধারিত কোন কাফ্‌ফারা। বরং উহা তাহারা নিজ নিজ বিবেচনানুযায়ী নিজের প্রতি শাস্তি গ্রহণ করিতেন। তবে কাহারও পক্ষে অতখানি শাস্তি গ্রহণ সম্ভব না হইলেও অপেক্ষা কম বা সহজ কোন প্রতিবিধান গ্রহণ করাও ফলদায়ক হইতে পারে। ইহারই নাম মুয়াতিবা বা শাস্তি গ্রহণ।

পঞ্চম মন্‌জিল মুজাহিদা

মুজাহিদা অর্থ আত্মার উন্নতির জন্য কঠোর চেষ্টা সাধনা করা। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) কোনদিন জামাত তরক হইলে সারারাত্রি নিদ্রা যাইতেন না। এবং সারারাত্রি ইবাদতে কাটাইয়া দিতেন। ইহাও আত্ম-শুদ্ধি বা নফ্‌সকে কাবু করিবারই

পন্থা। তবে বুজুর্গানে দ্বীন উহার জন্য নিজের প্রতি অধিক মাত্রায় ইবাদত চাপাইয়া দিতেন। একবার এইরূপ এক ঘটনায় তিনি দুই লাখ টাকা মুল্যের জমীন সদ্‌কা করিয়া দিয়াছিলেন। হজরত ইবনে ওমরের একবার মাগরিবের নামাজে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। উহার সদ্‌কাস্বরূপ তিনি দুইটি ক্রীতদাস মুক্তি করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব, নফসের অবাধ্যতার কারণ দেখা দিলে বিজ্ঞ আলেমের দরবারে যাইবে—এবং তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবে।

রিয়াজত বা কৃচ্ছ্র সাধন

প্রবৃত্তি বা নফ্‌সকে দুর্বল রাখিবার জন্য আধ্যাত্মিক সাধকগণ রিয়াজত করিতেন। আত্মার উন্নতি এবং মা'রেফতের পথে অগ্রসর হইবার জন্য কৃচ্ছ্র সাধনায় ফল প্রসূ হইয়া থাকে। প্রাচীন খ্যাতি নামা অলী আল্লাহগণের রিয়াজতের কতিপয় ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

হজরত দাউদ তায়ী (রহঃ) রুটীর পরিবর্তে আটা গুলিয়া খাইতেন। তিনি বলিলেন, রুটী তৈয়ার করিতে যে সময় ব্যয় হইবে ততক্ষণ আল্লাহর এবাদত করিয়া কাটাই না কেন ?

হজরত আহমদ বিন রযীন (রহঃ) ফজর হইতে আসর পর্যন্ত এক স্থানে বসিয়া কাটাইতেন। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"এই চক্ষু তো কেবল আল্লাহর কুদরত এবং

কারিগরি দেখিবার জন্য। অন্য জিনিস দেখিলে যেমন সময় ব্যয় হয়। তেমনি গুনাহ হইয়া থাকে।"

হজরত আবু দারদা (রহঃ) বলিতেন, কেবল তিনটি কারণে এই জীবন আমার কাছে প্রিয় মনে হয়, এক হইল রাত্রি। আল্লাহর সাজ্‌দায় অতিবাহিত করা, সারাদিন এবাদতে থাকা, তৃতীয় সৎলোকের সংসর্গে কাটান।

হজরত জুনায়েদ (রহঃ) বলিয়াছেন, আটানব্বই বৎসর বয়োক্রম কালেও হজরত সর্‌রী সক্‌তী (রাঃ) বিছানায় শয্যা গ্রহণ করিতেন না, ইহা তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখি নাই।

হজরত আবু কাত্তানী (রহঃ) হজরত আবু মোহাম্মদ জরিরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি মক্কা শরীফ অবস্থান কালে এক বৎসর ধরিয়া শয্যা গ্রহণ করেন নাই, কাহারও সহিত কথা বলেন নাই এবং কোন প্রকার আরাম করেন নাই, এরূপ কঠিন এবাদত কিরূপে করিলেন? তিনি বলিলেন—"কেবল মনের আগ্রহেই আমি ইহা করিতে পারিয়াছি।"

হজরত মু'সেলী (রহঃ) এত কাঁদিতেন যে, তাহার চক্ষু হইতে পানির পরিবর্তে রক্ত প্রবাহিত হইত। তাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কেন এরূপ কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, বহু দিন পর্যন্ত পানি ঝরাইয়াছি কিন্তু উহাতে ইখ্‌লাস ছিল না— এখন উহার কাফ্‌ফারা দিতেছি। তাহার ইন্তেকালের পরে কেহ স্বপ্নে তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, চোখের রক্ত

ঝরানোর জন্যই চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত আমার আমলনামায় কোন গুনাহ লিখিত হয় নাই।

হজরত ওয়ায়েস করনী (রহঃ)-একেক রাত্রি একেক এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কোন রাত্রি সাজ্‌দার কোন রাত্রি রুকুর।

হজরত সুফীয়ান সওরী (রহঃ) একবার হজরত রাবেয়া বসরীর নিকট গিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি নামাজে মশগুল রহিয়াছেন। সুফীয়ান সওরী বলিতেছেন—আমি নিজেও এক কোনে নামাজে দাঁড়াইয়া গেলাম। এইভাবে রাত্রি শেষ হইল। আমি বলিলাম। রাত্রিটা আল্লাহর এবাদতে কাটিয়াছে এজন্য আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা উচিত। ইহার শোকর আদায় করার জন্য রোজা রাখা হউক।"

উপরের ঘটনাগুলি ওলি আল্লাহগণের এবাদত ও রিয়াযতের নিদর্শন। এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

মানুষের নফসের স্বভাব হইল আল্লাহর এবাদত হইতে পলায়ন করা এবং অলসতা করা। নফ্‌সকে তাম্বিহ তাকীদ করিতে হইবে। ইহাতে সে ক্রমে অনুগত হইবে।

আল্লাহ পাক বলিয়াছেন—"উপদেশ দাও, উহা ফলদায়ক হইতে পারে! ইহা অন্যের বেলায় যেমন সত্য নিজের বেলায়ও তেমনি সত্য। নিজ নফ্‌সেরও নসিহত গ্রহণের উপযুক্ততা রহিয়াছে। অতএব, নিজ নফ্‌সকে প্রথমে উপদেশ দাও। উহাতে বশীভূত না হইলে উহাকে শাস্তি দান কর। তাহাকে বল, হে নফ্‌স। তুমি নিজকে খুব জ্ঞানী মনে করিতেছ। আল্লাহর

ফেরেশ্‌তা একদিকে তোমাকে গেরেফ্‌তার করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আর তুমি কিনা খেলা-ধূলায় আমোদ-প্রমোদ লিপ্ত রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে? হে নফ্‌স! তোমার দুশমন যাহার নাম মৃত্যু সে তোমার জন্য ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে। কে জানে। সে কখন আসিয়া তোমাকে ঝাটিয়া ধরিবে? সকাল-বিকাল, রাত-দিন, শীত-গ্রীষ্ম কিছুরই সে অপেক্ষা রাখে না। তোমাকে ছাড়িয়া দিলেও একদিন না একদিন তাহার হাতে তোমাকে পড়িতে হইবে। হে নফ্‌স! তুমি এতই উদাসীন যে, দুনইয়ার মোহে তুমি মজিয়া রহিয়াছ। তোমার চেয়ে নির্বোধ আর কে আছে? তোমার না খোদার ভয় আছে, না রসূলের মোহাব্বত। গুনাহের জন্য তোমার মোটেই ভয় নাই। আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে তুমি কিরূপে বে-পরওয়া হইয়া চলিয়াছ? তুমি তো কাফের হইতেও নিকৃষ্ট। তুমি খোদাকে অমান্য করিতেছ। কোরআনের প্রতি তোমার ঈমান নাই। এক লক্ষ্য চব্বিশ হাজার পয়গাম্বরের প্রতি তোমার আস্থা নাই। হে খবিস নফ্‌স। তুই কমিনা, তুই এই সব মিথ্যা মনে করিবার ফিকিরে আছিস্‌। হে নফ্‌স! স্মরণ কর, মন্দ কাজ করিলে উহার পরিণামে মন্দই লাভ হইবে। আল্লাহর কহর গজব স্মরণ কর। মনোযোগ দিয়া শোন! কেন আল্লাহ নানা-রকম রোগ-ব্যধি দান করেন। যদি তিনি কেবল রহমান ও রহীমই হইতেন তবে লোকে এত বিপদাপদে কেন জড়িত হইত। হে গাফেল নফ্‌স। গুনাহের পরিবর্তে একদিন তোকে দোজখ

ভোগ করিতে হইবে। একটু ভাবিয়া দেখ। তোমাকে নেকী করিতে বলা হইয়াছে। নেকী করিলে তাহার প্রতিফল পাওয়া যাইবে। আর গুনাহ করিলে উহার পরিবর্তে দোজখ ভোগ করিতে হইবে। যেমন বীজ বপন করিবে তেমনি ফল ভোগ করিবে।

হে নফ্স! চিন্তা করিয়া দেখ, মাল দৌলত কামাই করিবার জন্য তুমি কতই না ফিকির তদবীর করিয়া থাক। উহা লাভ করিবার জন্য কত না চেষ্টা-তদবীর করিতে থাক। তখন আল্লাহর রহম ও করমের কথা তোমার মোটেই স্মরণে আসে না। কেন এই ঘৃণ্য দুনইয়ায় বে-হুদা সময় নষ্ট করিতেছে নিজের খায়েশ পরিত্যাগ কর। কেননা, দোজখ দুনুইয়ার সর্বাপেক্ষা কঠিক বিপদ হইতেও জঘণ্য। অতি অল্প দিনের মধ্যে এই জীবন শেষ হইয়া যাইবে। জীবনে কোন এক সময় তওবা করিবে বলিয়া ফেলিয়া রাখিও না। মৃত্যু যে কখন আসিয়া পড়িবে উহার কোনই হদিস নাই। তখন হায়! হায়!! করিতে করিতে খালী হাতে বিদায় হইতে হইবে। সুতরাং যাহা করিবার আজই করিয়া লও বরং এখনই করিতে শুরু কর। যদি মৃত্যুর সময় তওবা কর তবে উহা কোন কাজেই আসিবে না। সুতরাং হে নফ্স! সময় থাকিতে সাবধান হও। হে নফ্স! সব চেয়ে কঠিন কথা এই যে, তুমি মৃত্যুকে ভুলিয়া গিয়াছ। মনে মনে রাখিও, অচিরেই সে তোমাকে পাকড়াও করিবে এবং তোমার ক্ষমতা রহিত করিয়া দিবে। তুমি মাটিতে মিশিয়া যাইবে, ইহার পর আফসুসে হাত মারিলে কোনই কাজ হইবে

না। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, তুমি আখেরাতের পরিবর্তে দুন্‌ইয়া খরিদ করিতেছ। অথচ তুমি সোনার পাত্রের বিনিময়ে মাটির পাত্র সহসাই ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই দুন্‌ইয়া এবং ইহার জেন্দেগী অতি ক্ষণস্থায়ী। ইহা অচিরেই ফানা হইয়া যাইবে। উহার পর অনন্ত কাল ব্যাপী আখেরাতের জীবন শুরু হইবে। উহা কখনও ফুরাইবে না, সুতরাং এখানে সব খোয়াইয়া গেলে সেখানে কেবল দুঃখ আর পরিতাপই ভোগ করিবে। ইত্যাকার ভাবে নিজ নফ্‌সকে উপদেশ দিতে থাকিবে।

আল্লাহর ধ্যান ও জিক্‌র

এক ঘণ্টা আল্লাহর সৃষ্টির সম্পর্কে চিন্তা করা এক বৎসর এবাদত করা হইতে উত্তম। আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদে বারবার চিন্তা করার নির্দেশ দিয়াছেন। সুতরাং চিন্তা করিবার তাৎপর্য কি সেই বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

হজরত ইব্‌নে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত আছে। কতক লোক আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা করিতেন। এই সম্পর্কে হজরত (দঃ) তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, তোমরা আল্লাহর স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যাইও না—কেননা, উহা তোমাদের বোধগম্য বিষয় নহে। বরং আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য এবং কুদরত সম্পর্কে চিন্তা কর। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত

আছে—হজরত রসূলে করিম (দঃ) এক সময় নামাজ পড়িতেছিলেন এবং ক্রন্দন করিতেছিলেন। হজরত আয়শা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আপনার সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়াছেন। তবুও আপনার কাঁদিবার কারণ কি? হজরত (দঃ) বলিলেন—আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাজিল করিয়াছেন।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ

وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ •

নিশ্চয়ই আসমান ও জমীনের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবারাত্রির আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীবৃন্দের জন্য আল্লাহর নিদর্শন রহিয়াছে।" এই আয়াত নাজেল হইবার পরও যে আল্লাহর জাত সম্পর্কে চিন্তা করে তাহার জ্ঞানের প্রতি শতাধিক।

হজরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট লোকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ন্যায় মহান ব্যক্তি দুনইয়াতে আর কেহ আছে কিনা? হজরত ঈসা বলিলেন—হাঁ সেই ব্যক্তি যে চুপ থাকে এবং আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। যখন কথা বলে তখন সৎ কথা বলে এবং যাহা কিছু দেখে উহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর কালাম পাঠ করা এবং বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের অনুসন্ধান করা চক্ষুর এবাদত।

হজরত আবু সুলায়মান দারানী (রহঃ) বলিয়াছেন দুনইয়ার

ভাবনা আখেরাতের পথ বাধা স্বরূপ। আখেরাত সম্পর্কে চিন্তা এক নেকী।

হজরত দাউদ তায়ী একবার আসমান রাজ্য সম্পর্কে চিন্তা করিতে করিতে এরূপ বিভোর হইয়া পড়িলেন যে, তিনি এক প্রতিবেশীর ছাদে গিয়া পড়িলেন। প্রতিবেশী চোর মনে করিয়া তলোয়ার নিয়া বাহির হইল এবং হজরত দাউদ তায়ীকে দেখিতে পাইল। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কে এরূপ নিক্ষেপ করিল? তিনি বলিলেন, এই জগতের সৃষ্টির নৈপুণ্য সম্পর্কে চিন্তা করিতে করিতে বে-খেয়াল হইয়া হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে।

মুরাকিবা বা ধ্যানের রহস্য

চিন্তা বা ধ্যানের আসল উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ করা। মানুষ এই পৃথিবীতে জন্ম লাভ করিয়া কিছুই জানিত না। এই দুনইয়া কি? ইহার পরিণামে কি রহিয়াছে? জীবনের রহস্য কি? এ বিষয়ে মানুষ অজ্ঞ ছিল। সুতরাং সে চিন্তা করিয়া দেখিলে গবেষনা করিল, এই ভাবে এক একটি গবেষণা দ্বারা তৃতীয় একটি বিষয় উদ্ধার করিল। যেমন, পাথরের উপর লোহা ঠুকিয়া আগুন আবিষ্কার করিল। সেই আগুনের আলোকে তাহার পথের আঁধার দূর হইল। অন্তত্র জিনিস দেখিতে পাইল। চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা জ্ঞানের পথে মানুষ এই ভাবে অগ্রসর হইয়াছে। আখেরাতের রাস্তায়ও এই ধ্যান গবেষণার

অনেক মূল্য রহিয়াছে। আল্লাহর মা'রেফতের পথেও এবং ধ্যান ও গবেষণার পথে একটির পর একটি তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়। এই ভাবে মা'রেফতের অসংখ্য রাস্তা খুলিয়া যায়। কাজেই মা'রেফতের পথে ফিক্‌র বা ধ্যান একটি প্রধান অবলম্বন।

চিন্তার বিষয় বস্তু

চিন্তার বিষয় বস্তু অফুরন্ত। সৃষ্টির যে কোন বিষয় নিয়াই চিন্তা করা যাউক না কেন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে উহার ফলাফল লাভ হইবে। পার্থিব বা পারলৌকিক যে বিষয় নিয়াই চিন্তা করা হউক না কেন উহাতে কোন না কোন ফল লাভ হইবেই। অর্থাৎ দুন্‌ইয়া এবং আখেরাত সবই তো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, সুতরাং আল্লাহকে চিনা, তাহার অসীম কুদরতের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা, উদ্দেশ্য থাকিলে যে কোন বিষয়ের মধ্যে উহা লাভ হইতে পারে। তথাপি এই চিন্তা ও ধ্যান একটি নির্দিষ্ট পথে করাই বাঞ্ছনীয়। যে ব্যক্তি নিজকে আল্লাহর প্রেমিকরূপে কল্পনা করিবে, তাহার সব কাজকর্ম আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকা উচিত। যতক্ষণ তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ সে আল্লাহর প্রেমিক হইতে পারে না। আল্লাহর প্রেমিকের ধ্যান ধারণা চারিটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ মনে করা যায়। প্রথমতঃ, প্রেমিক তাহার প্রেমিকার রূপ ও সৌন্দর্যের ধ্যানে নিয়োজিত থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ প্রেমি-

কার কাজকর্ম এবং গতিবিধির প্রতি সর্বদা আকৃষ্ট থাকিবে। তৃতীয়তঃ, ইহাও হইতে পারে যে, নিজ প্রেমাস্পদের নিকট প্রিয় এবং বাঞ্ছিত হওয়ার জন্য নিজের প্রতি নজর রাখে। অর্থাৎ নিজ প্রেমাস্পদের অভিপ্রেত আচার আচরণ নিয়া মশগুল থাকা। যাহাতে তাহার নিকট বাঞ্ছিত হওয়া যায়। চতুর্থতঃ, আল্লাহর নিকট অবাঞ্ছিত ও অপ্রিয় কাজে লিপ্ত না হওয়া। বান্দা কর্তৃক এই চারি শ্রেণীর কাজই হওয়া সম্ভব। সুতরাং মানুষ যদি নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে তবে তাহার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তাহার স্বভাব কোন পথে প্রবাহিত হইতেছে এবং প্রকাশ্যতঃ কোন কোন গুনাহের মধ্যে পতিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত ভিতরের সন্ধানও নিতে হইবে। মনের গতিবিধি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে যে. উহা খোদার নাফরমানীর পথে অগ্রসর হইতেছে কিনা? যেহেতু কতকগুলি গুনাহ বাহিরের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগঠিত হয়, আর কতকগুলি মনের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। এইগুলি উদ্ধারক করিবার পর সেগুলি দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিবে। যেমন, ভাবিয়া দেখিবে নিজের রোজগারে পথটি সঠিক কিনা কিংবা উহাতে কোন গলৎ বিষয় রহিয়াছে। যদি কোন দোষণীয় কিছু থাকে, তবে উহা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবে। এই দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং মনের প্রত্যেকটি ধারণা ও কামনার বিচার করিবে। ইহার ফলে আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য নিজের দেহ ও মন নিয়োজিত হইবে এবং ধীরে ধীরে অন্তরের রোশনী বৃদ্ধি

পাইবে। নিজের বিশেষ বিশেষ অঙ্গগুলির প্রতি চিন্তা করিবে। উদাহরণ স্বরূপ জিহ্বার কথা ধরা যাউক। জিহ্বাকে কতকগুলি বিষয় হইতে সংযত করিবে। যেমন, পরনিন্দা, বাহুল্য কথা বলা বেশী কথা বলা ইত্যাদি। এই সব হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য জিহ্বাকে চুপ রাখা, সত্য. বলা, তেলাওয়াত ও জিক্‌রে লিপ্ত ও সদুপদেশ দানে নিয়োজিত রাখিবে।

চক্ষুও একটি প্রধান ইন্দ্রিয়। ইহার সৃষ্টিও কার্যকারিতা এবং উপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে চিন্তা করিবে। চক্ষু এক আল্লাহর এক অপূর্ব নেয়ামত। ইহা না হইলে জীবন বৃথা হইত। এই চক্ষু আল্লাহর কতই করুণার দান। কি উপায়ে ইহার অর্থ সদ্ব্যবহার হইতে পারে উহা গভীরভাবে চিন্তা করিবে। উহা দ্বিধাহীন মনে বুঝিতে হইবে যে, আল্লাহর অভিপ্রেত কাজেই চক্ষুকে ব্যবহার করিতে হইবে এবং যে কাজে আল্লাহর নিষেধ ও অসন্তুষ্টি সেখানে চক্ষু বন্ধ রাখিতে হইবে। হারাম সৃষ্টি হইতে চক্ষুকে বাঁচাইবে, আল্লাহর কুদরত কৃতজ্ঞতাপুর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবে এবং গ্রন্থাদি পাঠ করিতে চক্ষুকে কাজে লাগাইবে। আল্লাহর অনভিপ্রেত এবং নিষিদ্ধ বস্তু হইতে চক্ষু সংযত করিবে। এইরূপ কর্ণ, হাত, পা সবগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষয় চিন্তা করিবে। এই চিন্তাই মুরাকিবা। ইহার ভিতর দিয়া আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি নৈপুণ্য মানুষের প্রতি আল্লাহর অপার করুণা এবং মানব জীবনের মহা উদ্দেশ্য ও কর্তব্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হইবে। এভাবে আল্লাহর প্রতি অনুভূতি জাগ্রত হইবে এবং তাহার আনুগত্যের পথে ক্রমশঃ

নিকটতর হইতে থাকিবে। এই তাফাক্কুর বা চিন্তার কথাই হাদীসে উক্ত হইয়াছে যে, এক ঘণ্টার চিন্তা এক বৎসরের এবাদতের সমান।

বাতেনী বিষয়ের প্রতি চিন্তা

বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় বাতেনী অর্থাৎ আভ্যন্তরিন বিষয়গুলির প্রতি মনোনিবেশ করিবে। অর্থাৎ স্বভাবে যেগুলি দোষ ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছে সেগুলি দুর করিবার চেষ্টা করিবে। যে সকল সদ্‌গুণ এবং সৎ স্বভাবের অভাব রহিয়াছে। সেগুলি অর্জন করিবার চেষ্টা করিবে। সদ্‌গুণগুলি বর্জনের পথে যে সব অন্তরায় রহিয়াছে, সেগুলি অর্জন করিবার চেষ্টা করিবে।

ক্ষতিকর রিপুসমূহ

যে সকল রিপু মানুষকে গুনাহের পথে ধাবিত করে সেগুলি ক্ষতিকর রিপু নামে অভিহিত করা যায়। এক হিসাবে ইহা অসংখ্য তবে মোটামুটি দশটি স্বভাবই হইতেছে ইহার মুল ভিত্তি। সেগুলি হইতেছে এই :— ১। কৃপণতা, ২। অহঙ্কার, ৩। আত্ম-গরিমা, ৪। প্রতারণা, ৫। হিংসা, ৬। ক্রোধ, ৭। লোভ ৮। জুলুম, ৯। ধন লিপ্‌সা, ১০। যশোঃ লিপসা।

উপরোক্ত দশটি স্বভাব একান্ত ক্ষতিকর। দুন্‌ইয়ার শান্তি এবং আখেরাতে মুক্তি লাভের জন্য এই দশটি স্বভাব হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে।

আখেরাতের মুক্তির জন্য যে সকল গুনাবলী অর্জন করা জরুরী উহারও মূল ভিত্তি দশটি :—

১। গুনাহের কাজে লজ্জিত হওয়া। (তওবা)

২। কষ্ট মসিবতে ধৈর্য ধারণ করা। (সবর)

৩। আল্লাহর হুকুমের প্রতি রাজী থাকা। (রেজা)

৪। আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামতে কৃতজ্ঞ থাকা। (শোকর)

৫। আল্লাহর ভীতি।

৬। আল্লাহর রহমতের প্রতি উম্মেদ রাখা। (রজা)

৭। সংযম ও কচ্ছতা অবলম্বন করা। (যোহদ্)

৮। সরলান্তকরণে আল্লাহর এবাদত করা। (এখ্‌লাস)

৯। আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি সদ্ব্যবহার করা।

১০। আল্লাহর প্রতি ভালবাসা। (হোব্ব্‌ ফিল্লাহ)

ধ্বংশ ও মুক্তি এই ক্ষেত্র সমূহে মানুষের জন্য চিন্তা ভাবনার একান্ত অবকাশ রহিয়াছে। এ বিষয় ইতি-পুর্বেও কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এইগুলি এক একটি করিয়া চিন্তা করিবে এবং ক্ষতিকর স্বভাবগুলি বর্জন করিবে।

এমন লোক রহিয়াছে যে সব বিষয়েই সতর্ক এবং পরহেজ-গার হওয়া সত্বেও দুই একটি বিষয়ে দুর্বল থাকিয়া যায়। যেমন কোন আলেম ব্যক্তি সব বিষয়ে সতর্ক হওয়া সত্বেও নিজের

এলেম সম্পর্কে গোড়ামী প্রকাশ করিয়া থাকে। এবং কারণে অকারণে নিজের বিদ্যা অপরের নিকট জারি করিয়া থাকে। যদি কেহ তাহার মতের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তাহা সহ্য করিতে পারে না, বরং তাহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। ইহা কোন সদগুণ নহে বরং আত্মগরিমা। ইহা অহংকারের শামিল। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে ইহা বাধা স্বরূপ। এই ধরনের অন্যান্য স্বভাব সম্পর্কে চিন্তা করিবে। উহা এক একটি করিয়া সংশোধন করিতে থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ সম্পর্কে ধ্যান ও চিন্তা। অর্থাৎ খোদা প্রদত্ত অফুরন্ত নেয়ামত এবং আল্লাহর বিচিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা। আল্লাহর স্বত্বা সম্পর্কে চিন্তা করা চাই না। মানুষের জ্ঞান উহা অনুধাবন করিতে অক্ষম। তাহা ছাড়া এই রাস্তা অতিশয় বিপদজনক। আল্লাহর জাত সম্পর্কে চিন্তা করিতে গিয়া গোমরাহ্ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। এই কারণেই উহা নিষেধ করা হইয়াছে। যেহেতু মানুষের পক্ষে আল্লাহর নূরের তেজ সহ্য করা অসাধ্য। যেমন, চামচিকা সূর্যের আলোকে কিছুই দেখিতে পায় না। যেহেতু সূর্যের কিরণ সহ্য করার মতো শক্তি তাহার চোখে নাই। এইরূপ মানুষও আল্লাহর জাত সহ্য করিতে অপারগ। সে উহার চেষ্টা করিলে পথভ্রষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সাধারণ মানুষের পক্ষে খোদার জাত সম্পর্কে এতটুকুই জানা যথেষ্ট যে,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ •

অর্থাৎ—তাহার তুল্য কিছুই নাই। বিশেষ শ্রেণীর তত্ত্ব জ্ঞানীগণ আল্লাহর জাত-সেফাত সম্পর্কে অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

চিন্তার তৃতীয় বিষয় হইল খালকুল্লাহ বা আল্লাহর সৃষ্টি।

এই বিশ্ব সংসার আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমান। তিনি মহা সৃষ্টিকর্তা অপরূপ নির্মান কুশলী। তিনি 'কুন্' শব্দে এই মহা-বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা তাহার অসীম কুদরতের পরিচয়। সেই কুদরতের শান এবং মহিমার কোনই সীমা নাই, পারাপার নাই।

আল্লাহ পাক তাহার নিজ মহিমা ও কুদরতের পরিচয় সূত্রে বলিয়াছেন :—

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ

قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَادًا ۰

অর্থাৎ—হে মোহাম্মদ। আপনি লোকদিগকে বলিয়া দিন যে, যদি সমুদ্রের সব পানি কালি হয় তথাপি আল্লাহর কথা শেষ হওয়ার পুর্বে কালি খতম হইয়া যাইবে। যদি সেইরূপ আরও দরিয়ার পানি কালিরূপে ব্যবহার করে।

সৃষ্টি সম্পর্কেও মানুষ চিন্তা করিয়া অবাক হইতে পারে কিন্তু উহার রহস্য ও নৈপুন্য সম্বন্ধে অতি সামান্যই জানিতে পারিবে।

সৃষ্টি সম্পর্কে মোটামুটি এতটুকু জানা যায় যে, উহা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ, যে সম্পর্কে কিছু জানা যায়, আর এক ভাগ, যে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সুতরাং যাহা অদৃশ্য সৃষ্টি সে বিষয়

চিন্তা ভাবনার কোন প্রশ্নই উঠেনা। অদৃশ্য বস্তু যেমন আরশ, কুরসী, লৌহ, কলম ফেরেশতা, বেহেশত, দোজখ প্রভৃতি। এই সকল বিষয় চিন্তা করা সম্ভব নহে। কেননা, এই সকল বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ যতটুকু জানাইয়াছেন, ততটুকুই জানা যায়। এতদ্ব্যতীত যাহা দৃশ্য ও দৃষ্টি গোচর উহার কোন সীমা সংখ্যা নাই। উহার মধ্যে ছোট বড় সব জিনিসই আল্লাহর অস্তিত্বের উজ্জ্বল প্রমান বহন করিতেছে। সুতরাং উহার প্রত্যেকটি বিষয় নিয়াই চিন্তা করা যাইতে পারে এবং উহার মাধ্যমে আল্লাহর অসীম কুদরতের প্রতি ঈমান আনিতে পারে। উহার মধ্যে অনেকগুলি সৃষ্টি এমন রহিয়াছে যেগুলি অতীব বিশাল ও বিরাট এবং উহা অসীম বিস্ময় সৃষ্টি করে। যেমন, আসমান, চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র পাহাড়, পৃথিবী, বন, দরিয়া প্রভৃতি। সে ছাড়া মেঘ, বর্ষা, কুয়াশা, বিজলী, বরফ এমন আরো কত কিছু।

ঐ সকল সৃষ্টির প্রত্যেকটি সম্পর্কে চিন্তার অবকাশ আছে। আল্লাহও এই সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করিতে বলিয়াছেন। আল্লাহর এই সকল বিস্ময়কর সৃষ্টি রহস্য চিন্তা করিবার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন—

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَاتٍ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ
عَلَيْهَا وَهُمْ ...

অর্থাৎ—এই আসমান জমীনে কতনা নিদর্শন রহিয়াছে, সে

গুলির উপর দিয়া অনবরত তাহারা আনা গোনা করিতেছে, অথচ সেদিকে তাহাদের মোটেই ভ্রুক্ষেপ নাই।

আল্লাহ তায়ালা আরো এরশাদ করেন, আসমান এবং জমীনের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবারাত্রির বিভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানীবৃন্দের জন্য রহিয়াছে আল্লাহর নিদর্শন। সুতরাং এইসব বিষয়ের এক একটির জন্য রহিয়াছে চিন্তা করার প্রচুর অবকাশ।

দুন্ইয়াতে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর সৃষ্টি মানুষ নিজেই। উহা সন্ধান করিতে তাহাকে দূরে যাইতে হয় না। উহাতে কতোই বিচিত্র কৌশল এবং কারিগরী রহিয়াছে। মানুষ নিজেই নিজে চিনিতে পারিল না। মানুষ যদি নিজকে নিজে চিনিতে পারিত তবে সে তার সৃষ্টিকর্তাকেও চিনিত। আল্লাহ নিজেই এ কথা বলিয়াছেন,

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ - وَفِي أَنْفُسِكُمْ

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٭

অর্থাৎ—বিশ্বাসীদের জন্য এই পৃথিবীতে আমার নিদর্শনগুলি রহিয়াছে এবং তোমাদের মধ্যেও রহিয়াছে তোমরা কি স্মরন করিতেছ না?

মানুষের সৃষ্টি নৈপুন্য

মানুষ নিজ সৃষ্টি সম্পর্কে এভাবে চিন্তা করিতে পারে। প্রথমতঃ তুমি চিন্তা কর, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? আল্লাহ তোমাকে আমাকে এক ফোটা অপবিত্র পদার্থ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। জন্মের পুর্বে সে পিতার মেরুদণ্ডে অবস্থিত ছিল। তৎপর সে মাতৃগর্ভে স্থান লাভ করিল। মাতৃগর্ভে প্রথমে জমাট রক্ত, পরে মাংসপিণ্ড এবং ক্রমান্বয়ে উহাতে অস্থিপুঞ্জ ও শিরা সমুহ সৃষ্টি হইল। পরে আল্লাহ উহাতে জীবন স্থাপন করিলেন। ইহা সকলেই আল্লাহর অপূর্ব নৈপুণ্য ও কুদরতের নিদর্শন। তিনি দেহের প্রতিটি অংগ পরিমিত ও প্রয়োজন মত সৃষ্টি করিয়াছেন। মস্তকটি সুদৃশ্য এবং গোলাকৃতি করিয়া সৃজন করিয়াছেন। শরীরের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংগ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা মুখ ও ও জিহ্বা মস্তকের সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। যাহাতে এই সমস্ত অংশ সুরক্ষিত এবং উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। দেহের দুই পাশে দুই খানা হাত সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক হাতে তিনটি করিয়া জোড়া রহিয়াছে। ফলে উহা ইচ্ছানুযায়ী নামাইতে উঠাইতে, প্রসারিত করিতে এবং গুটাইতে পারা যায়। এইরূপ হওয়াতে ইহা কতো প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হইতে পারিতেছে। আবার দেখ, প্রত্যেক হাতে পাঁচটি করিয়া আঙ্গুল সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহাতে ছয়টীর কোন প্রয়োজনই ছিল না। আবার চারিটি হইলেও বহু কাজে অসুবিধা দেখা দিত। প্রত্যেকটি

অংগুলিতে তিনটি গুটাইতে ও প্রসারিত করিতে পারা যায়। অঙ্গুলগুলিকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া যে কোন জিনিস ধরা যায়।

চক্ষু দুইটি অতি ক্ষুদ্র পদার্থ। অথচ উহা কতই বিচিত্র। উহা আলাদা এক একটি প্রাণীর ন্যায়। উহার তারকা দুইটি কিরূপ নিখুঁত ও মসৃন। উহার ভিতরে অতি সুক্ষ্ম পর্দা সমূহ রহিয়াছে। উহার একটি মাত্র পর্দা বিনাশ হইলে দৃষ্টিশক্তি বিনাশ হইয়া যাইবে। চোখের মধ্যে এত বিচিত্র কারিগরী রহিয়াছে যে, উহা সম্যক বর্ণনা করিতে গেলে পূর্ণ একখানা গ্রন্থেও কুলাইবে না।

একই দেহ, একই রক্ত, মাংস, একই উপাদান হইতে সৃষ্ট, অথচ দৃষ্টিশক্তি একমাত্র চক্ষুতেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। উহার নিকটেই নাক এবং কান, উহাদের বিন্দু মাত্র দেখিবার শক্তি নাই। কি বিস্ময়কর কারিগরী। প্রত্যেকেরই দৃষ্টিশক্তি চক্ষুতেই সঞ্চারিত হইবে। কস্মিনকালেও নাকে বা অন্য কোথাও সঞ্চারিত হইবে না।

নাসিকার সৃষ্টি কৌশল লক্ষ্য কর। উহার দুইটি প্রধান কাজ রহিয়াছে। ঘ্রাণ লওয়া এবং প্রশ্বাস করা। উহা এমন একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ যে, নাসিকা ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গই ইহার উপযুক্ত নহে। চক্ষু এবং কর্ণ অত্যাশ্চর্য কারিগরীর নিদর্শন হইলেও ঘ্রাণ গ্রহণ এবং শ্বাস প্রশ্বাসের বেলায় উহার কোনই দখল নাই। একই দেহের রক্তে প্রত্যেকটি অংগ সঞ্চারিত হইতেছে কিন্তু নির্দিষ্ট এক একটি অংগের যে কাজ ও বৈশিষ্ট তাহা

সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকিতেছে। কস্মিন্‌কালেও উহার কোন ব্যতিক্রম হইতেছে না। সুতরাং একটি অঙ্গ বিকল হইলে অন্য কোন অঙ্গের দ্বারা উহার অভাব পূরণ হয় না। দেহরাজ্যের এই বিচিত্র বিধান লঙ্ঘন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। ইহা একবার মাত্র চিন্তা করিলে আল্লাহর অসীম কুদরতের কথা মনে না জাগিয়া পারে না।

দেহের অস্থিপুঞ্জের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখা যাক। উহার কতকগুলি কোমল এবং কতকগুলি দৃঢ়। অস্থিগুলি পরস্পরের সহিত এমন ভাবে সংযুক্ত যে, উহাতে কোন খুঁত ও অসামঞ্জস্য নাই। এক অংগের অস্থি অপর অংগের অস্থির সহিত বিচিত্র নিপুনতার সহিত সংযুক্ত। ফলে এক অংগ অপর অংগকে সাহায্য করিতেছে এবং থাকার কারণে প্রত্যেক অংগ গুটাইতে এবং প্রসারিত করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না। গর্দান, কোমর এবং হাটুর জোড়া গুলিতে অপরূপ কারিগরী কলা-কোশল রহিয়াছে। মানুষের একটি কংকাল লক্ষ্য করিয়া দেখিলে উহার কারিগরী দেখিয়া অবাক হইতে হয়। ইহার শিরাগুলি, মাংস পেশী ও সামঞ্জস্যের সহিত বিন্যস্ত রহিয়াছে। উহাতে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিলে দেহ বিকল এবং অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই সবের মূলে তো এক ফোটা কদর্য পানি। শরীরের এই অস্থি পুঞ্জের সংখ্যা কেহ কি গণনা করিয়া দেখিয়াছে? উহার সংখ্যা সর্ব মোট দুইশত বিয়াল্লিশ খানা। এই অস্থি সমূহকে গোশ্‌ত ও শিরা দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছে। আবার সেই গোশ্‌ত চামড়া দ্বারা

আচ্ছাদিত করিয়া সংরক্ষিত করা হইয়াছে। শরীরের মধ্যে তিনটি জলাধার অদৃশ্য আছে। উহাতে নহরের ন্যায় প্রবাহ চলাচল করিতে থাকে। উহার একটি হইল মস্তিস্ক। সেখান হইতে সারা দেহে রক্ত ধারা প্রবাহিত হয়। উহার ফলে সারা দেহে চেতনা এবং অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। উহার একটি ধারা মেরুদণ্ডের দিকে রহিয়াছে।

দ্বিতীয় হাউজ হইতেছে হৃদপিণ্ড। উহাই দেহের পুষ্টি বৃদ্ধির কারণ। তৃতীয় কলিজা—উহা হইতে সারা দেহে শিরা সমূহ প্রসারিত হইতেছে। এইরূপ দেহের ভিতর বাহিরে প্রত্যেকটি অংগের ভিন্ন ভিন্ন কাজ রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি নিয়া চিন্তা করা উচিত। উহাতে আল্লাহর অপূর্ব কারিগরী সম্পর্কে ধারণা বদ্ধমূল হইলে এবং মা'রেফতের পক্ষে বিরাট সহায়ক হইবে।

চক্ষু দেখ, কতকগুলি অতি সুক্ষ্ম পর্দার সমন্বয়ে সৃষ্টি। উহার উপরে আবরণী এবং কালি সর্বদা চক্ষুদ্বয়কে ধুলা বালি প্রভৃতি অনিষ্টকর বস্তু হইতে রক্ষা করিতেছে। এই ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয়ের সৃষ্টি নৈপুন্য বর্ণনা করিতে গেলে বিরাট এক গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইবে।

কানের বিষয় চিন্তা কর। উহাতে কত কৌশল নিহিত রহিয়াছে। কানের ছিদ্রপথে এমন গুণ বিশিষ্ট মাংস রহিয়াছে যাহাতে শব্দ মাত্রই প্রতিধ্বনিত হইয়া মস্তিস্কে সংবাদ পৌঁছাইয়া দেয়। বায়ু তো নাসিকার ছিদ্র দিয়াও প্রবেশ করে এবং বাহির হইয়া যায়। অথচ উহা কখনও শ্রবণে সাহায্য করে না কর্ণেরও রূপ একটি মাত্র সূক্ষ্মছিদ্র রহিয়াছে। সেই ছিদ্র

পথে শব্দ বায়ুতে যে তরঙ্গ তোলে উহা গিয়া কর্ণের পর্দায় আঘাত দেয় অমনি উহা তরিৎ বেগে মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। আশ্চর্য যে. কানের পর্দার এই যে বিশেষ গুণ. ইহা দেহের অন্য কোন অংগেরই নাই। অথচ একই রক্তমাংস, একই খাদ্যোৎপাদনে এই দেহ বর্দ্ধিত, গঠিত এবং উহার মূল সৃষ্টির উপাদানও একটি মাত্র। কি আশ্চর্য কারিগরী! আবার সেই কর্ণের ছিদ্রপথকে বাহিরের ধূলাবালি ও আবর্জনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপরে কিরূপ প্রাচীর সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহার ফলে শব্দের এবং বায়ুর প্রবল ঝাপটা হইতে কানের ছিদ্র রক্ষা পাইতেছে। কানের ছিদ্রপথে এক প্রকার তিক্ত আটাল পদার্থ রহিয়াছে উহা বিস্বাদ বলিয়া উহাতে কোন কীট্ বা পোকা প্রবেশ করে না। এইরূপ মুখ. নাক, জিহ্বা প্রত্যেকরই বিচিত্র গুণ রহিয়াছে।

জিহ্বার প্রতি লক্ষ্য কর, উহা এক টুকরা মাংস বই কিছুই নহে। উহাতে কিইনা আশ্চর্য গুণ নিহিত রাখা হইয়াছে। সকল জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করিবার গুণ উহাতে আল্লাহ রাখিয়াছেন। স্বাদ ব্যতীত কোন জিনিসই মানুষ খাইতে পারে না। এবং না খাইলে জীবন কি ভাবে রক্ষা হইবে? তিক্ত, মিঠা, ঝাল, কসায়, খাট্টা, লবনাক্ত যে কোন স্বাদই হউক না কেন: জিহ্বায় দেওয়া মাত্রই উহা যাচাই হইয়া যায়। স্বাদ যাচাই করার ক্ষমতা একমাত্র জিহ্বা ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অংগেরই নাই। ইহাই বিচিত্র। এই দেহ একই রক্ত মাংসে গঠিত। অথচ দেহের মধ্যে কত বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট। যে উদ্দেশ্যে যে

অংগটি সৃষ্ট উহা দ্বারা কেবল সেই কাজই সাধিত হইতেছে। অন্য কোন অংগেরই ক্ষমতা নাই সেই শক্তি হরণ করার। দেহ রাজ্যে এই যে, নিয়ম ও শৃংখলা এবং শাসন—ইহাতে মানুষের কোনই হাত নাই। অদৃশ্য কুদরতের হাতই যে এই নিয়ম শৃংখলা বিধান করিতেছেন এবং যে অংগকে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে যে বৈশিষ্ট দান করিয়াছেন উহার কোন ব্যতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

মানুষের দেহের অভ্যন্তরে অপূর্ব কারিগরী রহিয়াছে। ধরুন, মস্তিষ্ক। সামান্য পরিমাণ মস্তিষ্কের কি বিপুল ধারণ ক্ষমতা। কত জ্ঞান, বিদ্যা, স্মৃতি, কথা, কাহিনী, দৃশ্য ও রূপ উহাতে অংকিত হইয়া থাকে। উহা কোথায় কি ভাবে রক্ষিত হয়। মানুষ উহার কিছুই জানিতে পারে না। পাকস্থলীর বিষয় চিন্তা করুন। উহাতে খাদ্য পরিপাক হইতেছে। উহার সারাংশকে গুর্দা রক্তে পরিণত করিতেছে। আবার সংগে সংগে উহা দেহের সকল শিরায় শিরায় প্রবাহিত করিয়া দিতেছে। রক্তকে আবার পরিশুদ্ধ করিয়া উহার অসার অংশ মল-মূত্র, কফ, পিত্ত ইত্যাদিতে বিরক্ত হইয়া নির্দিষ্ট নিয়মে বহির্গত হইয়া যাইতেছে। উহাতে সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম হইলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। দেহের কার্য ক্ষমতা একেবারে বিকল হইয়া যায়। সুতরাং দেহের অভ্যন্তরে আপনি এই সকল যথানিয়মে যাহার কুদরতে চলিতেছে, তিনিই সর্বশক্তিমান স্রস্টা মা'বুদ। এই সকল কুদরতই তাহার অস্তিত্বের পরিচয়। এই অসীম কুদরতের মালিক, তাহার প্রতি

কৃতজ্ঞতায় অবনত হইতে হইবে। প্রাণী জগতে সামান্য একটি মশা মাছি হইতে শুরু করিয়া বিরাট দেহ বিশিষ্ট হাতী পর্যন্ত সবই একই নিয়মের অধীন। প্রত্যেক প্রাণীর দেহেই মোটামুটি একই নিয়ম ও বৈশিষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। যে গুলি বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। প্রাণী জগতে মানুষই সর্বশ্রেষ্ট। আল্লাহ-পাক বলিয়াছেন :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ ●

অর্থাৎ—আমি বনী আদমকে সম্মানদান করিয়াছি।

বনী আদমের সম্মানের কারণ হইল তাহার জ্ঞান। সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষকেই জ্ঞান দান করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল আল্লাহর এই অসীম কুদরত, অপূর্ব কৌশল ও অতুলনীয় সৃষ্টি নৈপুণ্য উপলব্ধি করিয়া তাহাকে চেনা এবং তাহার প্রতি ঈমান আনা, একমাত্র তাহারই এবাদত করা ও তাহার বান্দা রূপে নিজকে সমর্পন করা। আল্লাহর এই কুদরতগুলি পর্যালোচনা করিয়া আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করাই মুলে মা'রেফত। এই জন্যই বলা হইয়াছে :

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ اَلْفِ سَنَةٍ ●

অর্থাৎ—হাজার বৎসর এবাদতের অপেক্ষা এক ঘন্টা চিন্তা অধিক উত্তম।

আল্লাহর নিদর্শন

অতঃপর এই জমীনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ। এই পৃথিবী কত বিচিত্র। মাটির তৈরী। মুলতঃ ইহা একটি মাটির সুবৃহৎ পিণ্ড। আবার ইহার উপর পানির অংশ লক্ষ্য কর। নদ-নদী ও অকূল সমুদ্রেই উহার তিন ভাগের দুই ভাগ। ইহার উপরে কত দীর্ঘ ও বিশাল পর্বত সমুহ বিরাজমান। উহা কত দৃঢ় ও কঠিন। উহা মৃন্ময় ও প্রস্তরময়। উহার বিশালতা ও স্থিতি কত বিচিত্র। সমুদ্রের ন্যায় উহারও কোন কোনটির যেন কুল কিনারা নাই। পৃথিবীর বন-জঙ্গলগুলি লক্ষ্য কর। কত বিশাল বন জঙ্গল। কত বৃক্ষলতা গুল্ম উহাতে পরিপূর্ণ। মাটির কতগুণ, উহাতে প্রতি নিয়ত উদ্ভিদ জন্ম হইতেছে। শস্য ফলমূল জন্মিতেছে। উহাই খাইয়া মানুষ জীবন ধারণ করিতেছে। কত কোটি কোটি লোকের খাদ্য প্রতিদিন এই মাটি হইতে উৎপন্ন হইতেছে। কত রকমারী ফল, কত শস্য উহার সীমা সংখ্যা নাই। মানুষ পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ সকলেই এই পৃথিবীতে জন্মিতেছে, বাঁচিতেছে এবং খাদ্য-পানীয় লাভ করিতেছে। আবার এই পৃথিবীর গঠন কি বিস্ময়কর। ইহা কত বড়, কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করাও কঠিন। ইহা আবার শূন্যমার্গে আবর্তিত হইতেছে। কি মহাশক্তি আকর্ষণে ইহা শূন্য মণ্ডলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ইহা ক্ষণকালের জন্য স্থির থাকিতেছে না। এখানে দিবারাত্রির আবর্তন, ঋতুর পরিবর্তন কতনা বৈচিত্র্য ইহাতে লক্ষ্য করা যায়। রৌদ্র তাপে

সমগ্র পৃথিবী শুষ্ক-শীর্ণ হইয়া যায়, বর্ষার প্লাবনে আবার সেই পৃথিবী সবুজ শ্যামল হইয়া উঠিতেছে। এমনই ঋতুর আবর্তনে পৃথিবী এক একবার এক এক শোভা ধারণ করিতেছে। বৃক্ষের এক একটি পত্র পল্লবের প্রতি চিন্তা করিলে অভিভূত না হইয়া পারা যায় না। উহার প্রতিটি পল্লবে খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ রহিয়াছে। কবি উহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

বর্‌গে দরখ্‌তানে সব্‌জ দর্‌ নজ্‌রে হুশিয়ার
হর্‌ ওয়ার্‌কে দফতরিস্ত, মা'রেফতে কের্‌দেগার।

অর্থাৎ— বৃক্ষের প্রতিটি পত্র পল্লব ঘোষণা করিতেছে আল্লাহরই সুস্পষ্ট পরিচয়। পৃথিবীর গর্ভে খনিজ সম্পদগুলি সম্পর্কে চিন্তা কর, পৃথিবীর পার্বত্য অঞ্চলে অফুরন্ত খনিজ সম্পদ রহিয়াছে। লোহা, তামা, অভ্র, শিশা, স্বর্ণ, সোডিয়াম, কয়লা, কেরোসিন, গ্যাস, পেট্রোল, রূপা, লবন এবং আরো কত কি? খনির এই গুপ্ত-ধন ভাণ্ডার দ্বারা পৃথিবীর মানব সভ্যতা প্রভূত উন্নত হইয়াছে। এই সব খনিজ দ্রব্য মানুষ কত প্রয়োজনে ব্যবহার করিতেছে। এই সব দ্রব্য ব্যতীত মানব সভ্যতা উন্নত হইতে পারিত না। মানুষের প্রয়োজনের জন্যই আল্লাহ এই সম্পদ পৃথিবীর অভ্যন্তরে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ উহার সন্ধান লাভ করিয়া উহা দ্বারা তাহাদের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে। আল্লাহ তাহার সৃষ্টির সেরা মখলুকের সুখ শান্তি এবং রক্ষণাবেক্ষণের এই সকল উপাদান যথাস্থানে যথা সময়েই সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। খোদা-পন্থী লোকের এই সকল বিষয় মুরাকাবা করা উচিত। কেননা,

উহাতে আল্লাহ্র অপূর্ব নিদর্শন সমূহ নিহিত রহিয়াছে। এক মাত্র চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই উহা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

জীব জগতে আল্লাহর নিদর্শন

কীট-পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাটকায় জীব জন্তু এই পৃথিবীর বুকে আমরা অহরহ বিচরণ করিতে দেখিতেছি। উহাদের কত জাত, কত শ্রেণী। কতক বা পায়ে হাটিয়া চলে, কতক হামাগুড়ি দিয়া মাটিতে গড়াইয়া বেড়ায়। উহাদের কতকগুলি গৃহ পালিত, যাহাদের দ্বারা মানুষের নানাবিধ কাজ হয়। গরু, মহিষ, উট, ঘোড়া, ভেড়া, বকরী প্রভৃতি মানুষের কতই প্রয়োজনে লাগিতেছে। উহাদের একটি হইতে অপরটি কতই বিভিন্ন। গরু দেখ। কত শান্ত নিরীহ প্রাণী। উহা তৃন-লতা খাইয়া কি সুমিষ্ট দুধ দান করে। উহা কতই উপকারী এবং তৃপ্তিদায়ক। যে খাদ্য হইতে গোবর উৎপন্ন হইতেছে, সেই খাদ্য হইতেই দুধও উৎপন্ন হইতেছে। একই পাকস্থলীতে উহার জন্ম, অথচ না দুধের মধ্যে গোবরের মধ্যে দুধের কোন চিহ্ন দেখা যায়। কি অপূর্ব কুদরতে ইহা শোধিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীগুলির মধ্যে সহজাতগুলি আল্লাহর অসীম কুদ্‌রতের পরিচায়ক পিপীলিকা কত ক্ষুদ্র প্রাণী। অথচ ইহার সহজাত জ্ঞান বিশেষ ভাবে লক্ষনীয়। সে কি নিপুঁনভাবে তাহার ঘর নির্মান করে।

মাটির নীচে শুষ্ক স্থানে সে গর্ত করিয়া উহাতে বাস করে এবং বর্ষা কালের জন্য সেখানে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, উহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। প্লাবনের মুখে পড়িলে সকলে জড়াজড়ি করিয়া একটি পিণ্ডের আকৃতি ধারন করে এবং উহা পানির উপর উলটিয়া পালটিয়া ভাসিতে থাকে। যেন নীচেরগুলি শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মারা না যায়। এই পিপীলিকা সম্পর্কে কোরআন শরীফে একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

হজরত সোলায়মান (আঃ)এর সৈন্য বাহিনী হইতে পিপীলিকার দলপতি তাহার প্রজাবৃন্দকে সতর্ক করিয়াছিলেন, কোরআন-পাকে উহা উল্লেখ আছে। এইরূপ ক্ষুদ্র প্রাণী জগতে উই পোকা মৌমাছি এবং মাকড়শা। পাখী জগতে বাবুই, কবুতর প্রভৃতির মধ্যে আল্লাহর কুদরতের অপূর্ব নিশানা লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ সেই সবের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া লোকদিগকে বলিয়াছেন :—

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ •

ঈমানদারদের জন্য এই দুনইয়াতে আল্লাহর নিদর্শন সমূহ রহিয়াছে। সেগুলি সম্যক বর্ণনা করা তো দুরের কথা এক একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর মধ্যে কি অতুলনীয় সৌন্দর্য, অচিন্তনীয় বৈশিষ্ট। আশ্চর্য গতিবিধি চিন্তা করিলে অভিভূত না হইয়া পারা যায় না। উহাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহরই মহা কুদরতের পরিচয়। ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

আল্লাহর আর একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি সমুদ্র। কি বিশাল

ইহার আয়তন। সমগ্র স্থল ভাগের তুলনায় ইহা তিনগুণ বড় সমুদ্রের এই পানিরাশি না থাকিলে সূর্যের উত্তাপে সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া মেঘ সৃষ্টি হয়। সেই মেঘ সারা পৃথিবীময় পানি সিঞ্চন করিয়া পৃথিবীকে উর্বর ও শ্যামল করিয়া তুলে।

সমুদ্র যে কেবল পানির আঁধার তাহাই নহে। পৃথিবীর ন্যায় উহাতেও নানা বিচিত্র জীব-জন্তু, বিরাটকায় মৎস্য এবং অফুরন্ত ধন-রত্ন রহিয়াছে। মুক্তার ন্যায় বহু মূল্যবান পাথর, সামুদ্রিক ঝিনুক গর্ভেই সৃষ্টি হয়। এই সবই ভাবিবার বিষয়। উহা আল্লাহরই অস্তিত্ব এবং কুদরতের মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

সমুদ্রের এই সীমাহীন পানিতে মানুষ কিস্তি ভাসাইয়া দেয়। দেশান্তরে গমন করে, ব্যবসায় বাণিজ্য চালায়, আল্লাহর অসীম কুদরতেই পানির উপর কঠোর এবং লোহার কিস্তি ভাসিতেছে।

এই পানিই দুন্‌ইয়ার জীবন। পানি ব্যতীত উদ্ভিদ প্রাণী কিছুই বাঁচিতে পারে না।

মানুষ একটু মাত্র চিন্তা করিলেও সৃষ্টির এই সকল রহমত উপলব্ধি করিয়া আল্লাহর অস্তিত্ব জানিতে পারে।

আল্লাহর আর একটি সৃষ্টি বায়ু সমগ্র শূন্য মণ্ডল জুড়িয়া বায়ুসমুদ্র বিরাজ করিতেছে। অথচ ইহা এতই সূক্ষ্ম যে মানুষ উহার মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা ডুবিয়া রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত এক মুহূর্তও থাকিতে পারে না। অথচ উহাকে আদৌ দেখিতে পায় না। মানুষ আহার না করিয়া দুই এক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বায়ু ব্যতীত সে এক মুহূর্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারে

না। শ্বাস প্রশ্বাসে প্রতি মুহুর্তে বায়ু গ্রহণ ও বর্জন করিতে হয়, অন্যথায় মানুষ বাঁচিতে পারে না।

এই বায়ু কল্যানে নদীবক্ষে নৌকা এবং জাহাজ গুলো ভাসিয়া থাকে।

বায়ু ব্যতীত উহা একদণ্ডও ভাসিয়া থাকিতে পারে না। বাতাস মেঘ সমূহকে আসমানে বহন করিয়া বেড়ায়, এবং সর্বত্র বর্ষার পানি ছিটাইয়া দেয়। ঠাণ্ডা বাতাস মেঘে সঞ্চিত পানিকে বরফে পরিনত করিয়া দেয়। সেই বিপুল বরফরাশি গ্রীষ্মের তাপে ধীরে ধীরে গলিয়া প্রবাহিত হয়। উহাই নদ-নদীতে পানি সঞ্চারিত করে, নতুবা সূর্যের উত্তাপ সমগ্র নদ নদী মরুভূমিতে পরিণত হইত। ক্ষেতে শস্য জ্বলিয়া যাইত। এইরূপ কত অসংখ্য কাজের জন্য আল্লাহর জীব ও উদ্ভিদজগত রক্ষা ও বৃদ্ধি বায়ু ছাড়া সম্ভব হইত না।

এই গুলো আল্লাহর কুদরতের সৃষ্টি। এই নিয়া ধ্যান ও মুরাকিবা করিবে। অন্তত: এই সবসৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর কারিগরী অনুসন্ধান করিবে এবং চিন্তা করিবে।

আল্লাহ তাহার অপরূপ সৃষ্টির কথা কুরআন পাকে উল্লেখ করিয়াছেন।

কুরআন পাকে এক স্থানে উল্লেখ আছে:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ

وَمَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ • وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ •

অর্থাৎ—এই আসমান ও জমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, উহা খেল তামাশার সৃষ্টি নহে, এবং সত্য ব্যতীত সৃষ্টি করা হয় নাই। তবে অনেকেই সে বিষয়ে অজ্ঞ। আসমান রাজ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিদ্যমান। এই বিশাল আসমানের দিকে লক্ষ্য করিলে কে বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারে? কত উচ্চে অবস্থিত এই আসমান, কি উপাদানে উহা তৈরী, কিসের সাহায্যে রক্ষিত, মানুষ উহার কিছুই জানিতে পারে নাই।

সেই আসমান রাজ্যের দৃশ্য অদৃশ্য গ্রহ, উপ গ্রহ ও নক্ষত্র রাজি বিরাজমান। উহার কতকগুল গতিশীল আবার কতগুলি স্থির নিশ্চল। উহার প্রত্যেকটি উজ্জ্বল। উহার কোনটি কতদূরে অবস্থিত. উহার একটি হইতে অপরটির দূরত্ব কত লক্ষ মাইল তাহাও পরিমান করা অসম্ভব। আবার এই সকল নিয়ে যে বিশ্ব, উহা কত বিরাট ও বিশাল, তাহা কল্পনায় আনাও অসম্ভব। এই সকলই একটা নির্দিষ্ট নিয়মে স্ব-স্ব নির্দ্ধারিত পথে আবর্তন করিতেছে। উহাতে চুল পরিমানও ব্যতিক্রম হইতেছে না

উহার নিয়ম শৃঙ্খলার সামান্যতম ব্যতিক্রম ঘটিলে হয়তো এই সৃষ্টি মুহুর্ত্তে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইত। সুতরাং এই বিস্ময়কর সৃষ্টি ইহার নিয়ম ও শৃংখলা দেখিয়া এই বিশ্বাস হওয়াই স্বভাবিক যে, এই সবের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন অস্রষ্টাই রহিয়াছেন, তিনি এক এবং একক তাহার সার্বভৌম ক্ষমতায় কাহারও দখল থাকিতে পারে না। যদি তাহাই থাকিত তবে এই সৃষ্টি একই নিয়মে চলিতে পারিত না। কেননা, যদি সৃষ্টিকর্ত্তা একের অধিক হইত। তবে সৃষ্টির

মধ্যে অবশ্যই বিশৃংখলা সৃষ্টি হইত। এবং সে হয় তো অন্যরূপ সৃষ্টি করিতে চাহিত। ইহাতে সৃষ্টি ধ্বংশই হইত। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতে উহা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন,

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۔

অর্থাৎ, আসমান জমীনে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ সৃষ্টিকর্তা থাকিত তবে উভয়ই ধ্বংশপ্রাপ্ত হইত। এইজন্য আল্লাহ তাহার অন্যান্য সৃষ্টি ও আসমান সম্পর্কে চিন্তা করিতে বলিয়াছেন।

কুরআন পাকে এক স্থানে বলা হইয়াছে :—

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۔ وَهُمْ عَنْ اٰيَاتِنَا مُعْرِضُوْنَ ۔

"এবং আমি আসমানকে সুরক্ষিত ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু তাহারা (ফকিরগণ) আমার নিদর্শন সম্পর্কে অস্বীকার করিতেছে। অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থাৎ—সমুহের সৃষ্টি অবশ্যই মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিন্তু অধিকাংশ লোক সে বিষয়ে অজ্ঞ। আল্লাহর এই বিস্ময়কর সৃষ্টি

সম্পর্কে স্থানে স্থানে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয় চিন্তার উদ্রেক হওয়াই সৌভাগ্যের লক্ষণ। যাহারা এই দুনইয়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবন কাটাইয়া দেয়, আহার বিহার এবং ধন-সম্পদ উপায় ও বুদ্ধির চেষ্টায় জীবন কাটাইয়া দেয়, কোথা হইতে এই দুনইয়ায় আসিল কোথায় যাইতে হইবে, কেনই বা এই দুনইয়ায় আসিল, কেনই বা চলিয়া যাইতে হইতেছে। কে তাহাকে সৃষ্টি করিল, কেন সৃষ্টি করিল, সেই সৃষ্টিকর্তার কি পরিচয়, কি ভাবে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে, কিছুই ভাবিল না। সে একান্তই দুর্ভাগ্য। সে হতভাগ্য! এই মানব জীবন এবং বিচিত্র সংসার, এই অপরূপ সৃষ্টি, উহার কত রূপ, কত বৈচিত্র্য, কত বৈশিষ্ট্য। সেই সবের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইলে সে নিশ্চয়ই তাহার চক্ষু থাকিতেও নাই। কান থাকিলেও বধির। সেই জন্যই আল্লাহ তাহাকে বারংবার চিন্তা করিতে বলিয়াছেন। কোন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করিতে হইবে। তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন। সেই সব চিন্তা করিলে আল্লাহর পরিচয় হৃদয়ে স্পষ্টভাবে জাগরিত হয়। ঈমান পরিপক্ক হয় আল্লাহর অপার কুদরত সম্পর্কে মনে গভীর ধারনা জন্মে এবং মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন পরিপূর্ণ হয়। সুতরাং জ্ঞানী মাত্রেই চিন্তা করা উচিত। এই চিন্তার ফলে যেমন আল্লাহর পরিচয় হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় তেমনি পার্থিব জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়। সেই জন্যই এক ঘণ্টা চিন্তা করা এক বৎসর নফল ইবাদত করা অপেক্ষা অধিকতর সওয়াব। কারণ ইহাতে একাধারে মারেফত হাসিল হয়। সৎ চিন্তায় লিপ্ত থাকা যায়, শয়তানের ওস্‌ওয়াসা

হইতে দূরে থাকা যায় এবং মুরাকাবার ফল পর্যন্ত হইয়া থাকে। মুজাহিদা লাভ হইলে তাহার মারেফত অর্জিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। তবে এই চিন্তার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন রহিয়াছে। নিয়ম কানুন ছাড়া এলো পাথারী চিন্তা করিলে তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হয় না। যাহারা এই পথে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছেন, তাহাদের পথ অনুসরণ করিতে হইবে। তাহারা হইতেছেন কামিল মুরশিদ। তাহাদের নিকটই ইহা শিক্ষা করিতে হইবে। তবেই আশানুরূপ ফল লাভ হইবে। চিন্তার বিষয় সম্পর্কে উপরে যাহা বলা হইয়াছে, উহা ছাড়াও আল্লাহর সৃষ্টিতে অসংখ্য বিষয় চিন্তা করা যায়, তাহার ইয়াত্তা নাই। তবে ক্রমশঃ নিকটবর্তী জিনিস নিয়া চিন্তা করিবে। প্রথমে নিজ শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, নিজের গুণাবলী দয়া-মায়া, প্রেম-ভালবাসা, ব্যথা বেদনা সুখ-দুঃখ আনন্দ, হাসি-কান্না প্রভৃতি নিয়া চিন্তা করিবে। কেতাবে আছে, "মান আ'রাফা নাফ্‌সাহু ফাক্বাদ আ'রাফা রাব্বাহু" যে নিজকে চিনিয়াছে, সে তাহার প্রতিপালককে চিনিয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, নিজের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা পর্যালোচনা করিলে আপনা হইতে মহান স্রষ্টা প্রভুর অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

এইরূপ নিকটবর্তী জিনিসের সম্পর্কে চিন্তার সূত্রে ক্রমান্বয়ে দূরবর্তী জিনিসের প্রতি চিন্তার উদ্রেক হইবে। এবং উহার হাকিকত উপলব্ধি হইতে থাকিবে। সুতরাং প্রথমে নিজ সম্পর্কে পরে এই জমীন ইহার সৃষ্ট বস্তুগুলি সম্পর্কে অর্থাৎ, জড় পদার্থ, জীব-জন্তু, বৃক্ষলতা, অগ্নি-পানি বায়ু, মাটি প্রভৃতি সম্পর্কে ভাবিবে। অতঃপর

আসমান এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি বিস্ময়কর সৃষ্টি, উহার আবর্তন বিবর্তন, উহার অবস্থান ও সৃষ্টিতে উহার আবশ্যকতা সম্পর্কে চিন্তা কর, উহা কতই রহস্যময়, কত বিচিত্র সৃষ্টি, কি বিস্ময়কর লীলা খেলা, এসব যতই ভাবিবে মনে হইবে আল্লাহ যেন অন্তরে ক্রমশঃ অনুভূতি জাগরিত করিতেছেন। উহার পরে আরো দূরে আরো সূক্ষ্ম বিষয়ে চিন্তায় নিমগ্ন হও। আরশ, কুরসী, লওহ কলম, রূহ, ফেরেশতা প্রভৃতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য সৃষ্টি সম্পর্কে মোরাকাবা কর। ফলে নিজের আভ্যন্তরীন সূক্ষ্ম লতাফাগুলি জাগ্রত ও উজ্জল হইবে। উহাদের অনুভূতি দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। এবং সৃষ্টির অন্যান্য সূক্ষ্ম রহস্যগুলির হাকিকত জ্ঞাত হইতে পারিবে। ইহা মা'রেফতেরই স্তর বিশেষ বলা যায়। এই সব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার স্তরগুলি ক্রমান্বয়ে থালেককে আরো উর্দ্ধে নিয়া যায় উহার শেষ সীমা নাই। আল্লাহ যাহাকে যে পরিমান উন্নতি দান করেন। উহাই তাহার পক্ষে শেষ সীমা। নতুবা আল্লাহর মারেফতের কোন শেষ সীমা নাই। তবে মানুষের ক্ষেত্রে নবুয়তেই সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে। নবী হজরত মুহম্মদ-মুস্তফা (দঃ) পর্যন্ত সেই নবুয়তের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ট সীমা ছিল উহা শেষ হইয়া গিয়াছে। উহার পরে নবী (দঃ) এর উম্মতগণের মধ্যে অলী আউলিয়াগণ বিভিন্ন মর্যাদা লাভ করিবেন। তাহারা নিজ নিজ আমল ও প্রচেষ্টা অনুসারে আল্লাহর নৈকট্যের দরজা লাভ করিবেন।

তাওয়াক্কুল

আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা। তাওয়াক্কুল ঈমানের এক বিশেষ অংগ। উহা ব্যতীত ঈমান পুর্ণতা লাভ করিতে পারে না। মানুষের প্রতি পদে অভাব ও অক্ষমতা রহিয়াছে। সুতরাং কোন ক্ষেত্রে অসমর্থ ও অপারগ হইয়া নিরাশ হওয়া যেমন অন্যায় তেমনি আল্লাহর শক্তি, সাহায্য প্রার্থনা আল্লাহর সৃষ্ট কোন শক্তির সাহায্য প্রার্থী হওয়া। আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন :—

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ •

তোমরা যদি প্রকৃত মোমেন হও, তবে আল্লাহর প্রতি ভরসা কর।

আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ •

আল্লাহ সেই সকল লোকদেরকে ভালবাসেন। এক মাত্র আল্লাহর প্রতি যারা নির্ভরশীল।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ •

আল্লাহর উপর যে নির্ভর করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ •

এক আল্লাহই কি তাহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আরও বহু আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

হাদীস। হজরত (দঃ) নিজ উম্মতের সংখ্যা অধিক দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন আল্লাহর তরফ হইতে অহী আসিল।

"হে রসূল। আপনি আপনার উম্মত সম্পর্কে সন্তুষ্ট। আল্লাহ বলিলেন—"আমি আপনার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার বিনা হিসাব নিকাশে বেহেশতে প্রবেশ করাইব।" এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিল—হে রসূলুল্লাহ। বিনা হিসাব নিকাশে কাহারা বেহেশতে দাখিল হইবে? হজরত (দঃ) উত্তর করিলেন, "ঐ সকল লোক যাহারা আল্লাহ্র প্রতি ভরসা স্থাপন করিয়া থাকিবে।" সাহাবী বলিলেন—"হে আল্লাহ্র রসুল। আপনি দোওয়া করুন। আমি যেন সেই সত্তর হাজারের মধ্যে দাখিল হইতে পারি।" হজরত (দঃ) তাহার জন্য দোওয়া করিলেন ইহা শুনিয়া অন্য এক সাহাবী দোওয়ার জন্য হজরতের নিকট আবেদন জানাইলেন। হজরত (দঃ) তাহার জন্যও দোওয়া করিলেন।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—বান্দাগণ যদি খোদার প্রতি ভরসা করে, তবে তাহার রুজী এমন ভাবে মিলিবে, যেমন পাখীরা মিলিয়া থাকে। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি ভরসা করে, তাহার সব অভাব অভিযোগ আল্লাহ-ই পুরন করেন। আল্লাহর প্রতি ভরসাকারীর রুজী এমন ভাবে পৌঁছে যাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না, আর যাহারা দুনইয়ার কোন আশ্রয় অবলম্বন করে আল্লাহ তাহাদিগকে দুনইয়ার হাতেই সমর্পন করেন।

হজরত ইবরাহীম (আঃ)-এর তাওয়াক্কুল—হজরত ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন নমরূদের অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করার জন্য চড়কীতে

বসাইল, তখন তিনি বলিলেন—"হাস্‌বি আল্লাহ ওয়া নেয়া মাল ওয়াকীল। অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ভরসা একমাত্র আল্লাহ-ই আমার জন্য যথেষ্ট।" তিনি চড়কা হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া যখন শূন্য পথে ছিলেন তখন জিবরীল (আঃ) আসিলেন এবং বলিলেন, হে পয়গম্বর আপনার কোন অভাব আছে কি? নবী বলিলেন—কিছুই নহে, আমি একমাত্র খোদার উপরই ভরসা স্থাপন করিয়াছি।"

হজরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহর ওহী নাজিল করিলেন, যে বান্দা শুধু আমার প্রতি ভরসা করে আমি তাহাকে দুন্‌ইয়ার সব রকম ফেরেব হইতে রক্ষা করিয়া থাকি এবং তাহার সব মুশকিল উদ্ধার করিয়া দেই।"

হজরত ইবরাহীম (আঃ) এক পাদ্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার রুজী কি ভাবে লাভ করেন, পাদ্রী বলিল—উহা রেজিক দাতাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

একজন আবেদ লোককে কেহ জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি তো সারা দিন-রাত্র এবাদতে মশগুল থাকেন—আপনার রুজী কোথা হইতে আসে? তিনি মুখ হাঁ করিয়া দাঁতগুলি দেখাইয়া বলিলেন—যিনি এই পেষণ যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন—তিনি খাদ্যেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমি সে বিষয় কখনও চিন্তা করি নাই।"

হজরত ওয়ায়েস করনী (রহঃ)-এর নিকট হজরত ইবনে হাব্বান (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কোথায় অবস্থান করিব? তিনি কোন এক স্থানের নির্দেশ করিলেন। তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেখানে রুজী-রুটীর কি ব্যবস্থা আছে? হজরত

ওয়ায়েস (রহঃ) বলিলেন "খোদার প্রতি ভরসা নাই এমন দেলের প্রতি আফসুস।

তাওয়াক্কুলের হাকিকত

ইতি পুর্বে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভাবে ঈমান আনার পর মুমিনের অন্তরে যে নির্ভরতা জন্মলাভ করে, উহারই নাম তাওয়াক্কুল। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর তাহার কাজে কোন চুঁ-চেরা না করাই তাওয়াক্কুলের পরিচয়। সর্বাবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে। ধন সম্পদ আল্লাহ দান করিলেও সে জন্য অহংকারে ফুলিয়া যাইবে না। মোট কথা, জীবনে যে কোন অবস্থায় আল্লাহর প্রতি আস্থা এবং নির্ভরতা পোষণ করিবে। একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত এই যে, কেহ কোন মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়া আদালতে নিজ নির্দোষিতা প্রমানের জন্য উকিল নিযুক্ত করিয়া থাকে, সেই উকিলের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা চাই। অন্যথায় সেই উকিল নিযুক্ত করা যাইতে পারে না। অবশ্য যে উকিল নিযুক্ত করিবে, তাহারও বিশেষ গুণ থাকা চাই। অর্থাৎ—উকিল হিসাবে তাহার যোগ্যতা মুয়াক্কেলের কাজ আন্তরিকভাবে করার নিশ্চয়তা প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ণ আস্থা থাকিলেই তখন তাহাকে উকিলরূপে নিযুক্ত করা হয়। আল্লাহ পাকের বেলায়ও তেমনি। বান্দার সব ব্যাপারে আল্লাহ-ই অভিভাবক।

এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার নামই তাওয়াক্কুল। অবশ্য আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকা সত্বেও মানুষের মনে ইতস্ততের ভাব আসিয়া থাকে। তবে তাওয়াক্কুলের জন্য মনে পূর্ণ স্থিরতা এবং নিরুদ্‌বিঘ্ন ভাব সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক।

তাওয়াক্কুলের উচ্চ, মাধ্যম এবং নিম্ন স্তর আছে। প্রথমতঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভরসা রাখিয়া নিজ সাধ্যমত চেষ্টা তদ্‌বীর করা এবং উহার ফলাফলের জন্য আল্লাহর প্রতি নির্ভর রাখা। ইহা সাধারণ মু'মিনের তাওয়াক্কুল।

দ্বিতীয়তঃ অবোধ শিশু যেমন ক্ষুধা লাগিলে ক্রন্দন ছাড়া আর কিছুই জানে না এবং একমাত্র ক্রন্দন ব্যতীত তাহার হাতে আর কোনই তদ্বির প্রচেষ্টা নাই। এক শ্রেণীর মুমিন বান্দাও তদ্রূপ রহিয়াছেন। যাহারা নিজেদের অভাব অভিযোগ এবং প্রয়োজন একমাত্র আল্লাহই গোচরীভূত করিয়া থাকেন। তাহাদের অন্য কোনই চেষ্টা তদ্‌বীর নাই। প্রথমোক্ত তাওয়াক্কুল হইতে উহা উচ্চ শ্রেণীর তৃতীয় উহা হইতেও উচ্চশ্রেণীর তাওয়াক্কুল অর্থাৎ কোনই প্রার্থনা বা তদ্বির নাই। তাহার ঈমান এই যে, আল্লাহই সব দেখিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করিয়া যাহা দান করেন উহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তাহার নিজের তরফ হইতে কোনই তলব বা প্রার্থনা থাকিবে না। ইহা হইল তাওয়াক্কুলের সর্বশেষ অবস্থা, অর্থাৎ নিজেকে সর্বতোভাবে খোদার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া।

উপরোক্ত অবস্থা ত্রয়ের মধ্যে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমোক্ত অবস্থায় মানুষের কিছু এখতিয়ার থাকে, অর্থাৎ তাওয়াক্কুলের

সাথে নিজে ভাল-মন্দ সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং কাজও করে। দ্বিতীয় অবস্থায় যদিও নিজ এখতিয়ার আল্লাহর হাতেই সোপর্দ করা হয়, তবুও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এবং কাকুতি মিনতি থাকে, তৃতীয় স্তরে উন্নীত হওয়ার পরে এতটুকুও থাকে না। শুধু মৃতের মত নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর সোপর্দ করিয়া দেওয়া হয়। তখন তাহার মধ্যে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ, অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোন গতিবিধি এবং শক্তি নাই—এই বিশ্বাসের উপরে বদ্ধমূল হয়। ইহা হইতেছে তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর।

উচ্চ স্তরে তাওয়াক্কুলের একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। হজরত আবু ইয়াজিদ আবু মুসা দোয়েলীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাওয়াক্কুল কি? তিনি বলিলেন—"দোজখবাসীদিগকে আজাবগ্রস্ত এবং বেহেশতবাসীদিগকে সুখী ভাবও তাওয়াক্কুলের পরিচায়ক নহে! বরং আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলকারী উহা হইতে অনেক উচ্চে।

আবুমুসা আশ্‌আরী বলিয়াছেন, তাওয়াক্কুল কারীর নিজ ইচ্ছায় এবং প্রচেষ্টায় কিছুই চাই না। ইহার দৃষ্টান্ত হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর কাজ হইতে নেওয়া যাইতে পারে। তিনি হজরত (দঃ)-এর সহিত যখন "গারে সূরে আশ্রয় নিয়া" ছিলেন, তখন তিনি জানিয়া শুনিয়া সর্পের গর্তের মুখে নিজের পায়ের গোড়ালী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সাপের ভয় করিলেন না। যেহেতু তিনি আল্লাহর প্রতি-পূর্ণ ভরসা স্থাপন করি-

য়াছিলেন। দেখা যাইতেছে যে, উচ্চ-স্তরের তাওয়াক্কুলের অর্থ হইল—"লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ-এর প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখা। অর্থাৎ কোন গতিবিধি এবং শক্তি নাই একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত। সর্বোচ্চ শ্রেণীর তাওয়াক্কুলের আদর্শ হইল আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামতই হউক, আর কষ্টই হউক, উহার মধ্যে কোনই পার্থক্য না করা।

তাওয়াক্কুল ও কাজ

তাওয়াক্কুলের সাথে কাজের অর্থ এই যে, রুজী রোজগার ত্যাগ করিয়া একদম বসিয়া যাওয়া অথবা সম্মুখে বাঘ পড়িলে উহা হইতে বাঁচিবার চেষ্টা না করা অথবা রোগ হইলে চিকিৎসা পরিত্যাগ করা, এইরূপ করা শরীয়তের বিরোধী। মু'মিনের সব আমল শরীয়তের আওতার ভিতরে হইতে হইবে। তাওয়াক্কুল শরীয়তেরই অন্তর্গত। যে সকল কাজ শরীয়তে জায়েজ রহিয়াছে উহা করা তাওয়াক্কুলের খেলাফ নহে। সুতরাং শরীয়তের আওতাভুক্ত কাজে তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় না। উহার চারিটি অবস্থা হইতে পারে। অর্থ না থাকিলে উহা উপার্জন করা মাল থাকিলে উহার রক্ষণাবেক্ষন করা, মাল, অপচয় হওয়ার অপেক্ষা উহার হেফাজতের ব্যবস্থা করা, ভবিষ্যতের জন্য মালের ক্ষতির অপেক্ষা উহার সতর্কতা অবলম্বন করা।

তাওয়াক্কুলের সাথে জ্ঞান ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ কিছু করা চাই না। অর্থাৎ মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই জানে যে, হাত দ্বারা না করা পর্যন্ত উহা হইবার নয়, এই ক্ষেত্রে হাত নাড়িয়া কাজ করার মধ্যেই তাওয়াক্কুল রহিয়াছে। যেমন, রুটী ভাংগিয়া মুখে না দিয়া তাওয়াক্কুল করিয়া বসিয়া থাকা যে, আল্লাহ খাওয়াইলে রুটী আপনা হইতে মুখে আসিবে অথবা স্ত্রী-সহবাস ব্যতীতই সন্তান জন্মিবে। এই ধরণের কাজ আদতের খেলাফ। আল্লাহ জাহেরী কাজ কর্মের জন্য বিধান করিয়াছেন উহা অবলম্বন করিয়াই তাওয়াক্কুল করিবে। অর্থাৎ স্বাভাবিক বাহ্যিক অবলম্বন গুলি যে, আল্লাহরই প্রদত্ত শক্তি এবং আল্লাহর হুকুমেই কার্যকরী হয়, এই ধারণা রাখিলে তাওয়াক্কুল অংগহীন হইবে না।

তাওয়াক্কুল হারাম

খাদ্য পনিয়ের কোন সংস্থান নাই এমন স্থানে নির্জনবাস করা এবং তাওয়াক্কুল করা যে, সেখানে তাহার খাদ্য লাভ হইবে। এইরূপ তাওয়াক্কুল হারাম। আল্লাহ মানুষের জন্য যে সব বাহ্যিক উপায় ও অবলম্বন সৃষ্টি করিয়াছেন সে সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই ইহার কারণ।

একটি ঘটনা কোন এক যুগে এক ব্যক্তি সংসার পরিত্যাগ করিয়া একাকী বাস করিত। এবং কোন ব্যবস্থা ও অবলম্বন ছাড়াই আল্লাহ তাহাকে রেজেক পৌঁছাইবেন, এইভাবে

তাওয়াক্কুল করিয়া বসিল। কিছুদিন যাইতে না যাইতে তাহার অবস্থা একেবারে কাহিল হইয়া পড়িল। সে যুগের পয়গাম্বরের কাছে আল্লাহর তরফ হইতে অহি নাজিল হইল যে, "তাহাকে বলিয়া দাও। সে যেন লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করে। কেননা মানুষের রুজী আমি একে অন্যের সাহায্যের সহিত ব্যবস্থা করিয়াছি। পয়গাম্বরের উপদেশানুসারে সে ব্যক্তি লোক সমাজে বাহির হইল বটে, কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল যে, তাহার তাওয়াক্কুলের অংগহীন হইতেছে। পুনঃ আল্লাহ অহী নাযিল করিয়া বলিলেন—'সে ব্যক্তি আমার নিয়ত ভঙ্গ করিতে চাহিয়াছিল। আমি বাহ্যিক জগতের জন্য যে কানুন নির্দ্ধারিত করিয়াছি, সে উহার বিপরিত পথে চলিতেছিল। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, খোদার নির্দ্ধারিত স্বাভাবিক বিধি বিধান মানিয়া চলা উচিত। তাওয়াক্কুল ঈমানের অংগ, তাওয়াক্কুল ব্যতীত ঈমান কামেল হইবে না। তবে দুনইয়ার জেন্দেগীতে আল্লাহর যে কাজের জন্য যে, নিয়ম করিয়াছেন, যে আসবাব বা অবলম্বন দিয়াছেন উহা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিবে না। সম্ভবতঃ এরূপ করিলেও তাহার অব্যাহতি জুটিবে না। কেননা যে ব্যক্তি রুটী, রুজী হইতে ভাগিয়া সফরে উহা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়ায়। তবে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করিয়া মৃত্যু বরণ করা কোন নেকী নহে। কেননা আল্লাহ এই জেন্দেগী দিয়াছেন জ্ঞান ও এবাদত দ্বারা উহা সাফল্য করিয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং উহা রক্ষার জন্য ডাল-রুটী প্রয়োজন। উহা ব্যতীত জীবন ধারণ সম্ভব নহে।

দেখা যাইতেছে যে, তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চস্তরেও পাথিব অবলম্বন জরুরী। আর বাহ্যিক অবলম্বন সত্বেও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল পূর্ণ মাত্রায় থাকিবে।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) খেলাফতের পদে বসার পরেও প্রত্যেহ কাপড়ের গাঁট নিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেন। লোকেরা বলিল, আপনি এখনও তেজারত করিবেন তবে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করিবেন কিরূপে? তিনি বলিলেন—আমার পরিবার পরিজন প্রতিপালনের জন্য উপার্জন করা আবশ্যক। অতঃপর বায়তুল মাল হইতে তাহার ও পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য একটা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়।

তাওয়াক্কুল ও সংযম

তাওয়াক্কুলের জন্য সংযম জরুরী। সংযম ব্যতীত তাওয়াক্কুল পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। হজরত জুনায়েদ বুগদাদীর পীর হজরত জাফর হাদ্দাদ (রহঃ) বলিয়াছেন, "আমি একাধারে বিশ বৎসর তাওয়াক্কুল করিয়াছি। উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। রুজী যাহা উপার্জন করিয়াছি উহা ফকীর মিস্‌কিনকে দান করিয়া দিয়াছি। এইরূপ হজরত জুনায়েদ ও তাওয়াক্কুল করিতেন কিন্তু উহা তাহার পীরের নিকটও ব্যক্ত করিতেন না। তিনি বলিতেন "আমি তাওয়াক্কুলের কথা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি।"

হজরত ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) তাহার এক মজদুরকে নির্দ্ধারিত মজুরীর চেয়ে কিছু বেশী দিতে চাহিয়া ছিলেন। মজদুর উহা লইতে অস্বীকার করিল। তিনি সেই মজদুরের পশ্চাতে উক্ত মজুরীসহ আরেকজন শাগরেদ পাঠাইলেন, যেন সে উহা তাহাকে কিছু দুর অগ্রসর হইয়া দিয়া আসে। শাগরেদ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—তখন উহা গ্রহণ করা তাহার পথে লোভ লালসাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইত। পরে সে খেয়াল মন হইতে দুর হইয়া থাকিবে। সুতরাং অতিরিক্ত যাহা দিয়াছি উহা লইতে তাহার আপত্তি না থাকিতে পারে।

তাওয়াক্কুলের পরিচয় হইল যে, উপার্জন করিলেও সেই টাকা পয়সার উপর নির্ভর না করা। বরং একমাত্র আল্লাহর রহম ও করমের উপরই নির্ভর করা। এই ধরণের তাওয়াক্কুলকারী তাহার অর্থ-সম্পদ হারাইয়া গেলেও সে জন্য সে মোটেই কাতর হয় না। কেননা তাহার ভরসা থাকে একমাত্র খোদার উপর। অর্থ সম্পদের উহার তাহার ভরসা থাকে না। আল্লাহ যদি দান করেন তবে উহা তাহার মজুরী, আর যদি দান না করেন তবে উহাও তাহার মজুরী। উহাতে দুঃখ বা ক্ষোভের কোন কারণই দেখা দেয় না।

একমাত্র আল্লাহর প্রতি ভরসা। অতি উচ্চ শ্রেণীর তাওয়াক্কুল। এরূপ তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তি দুনইয়ার ধন সম্পদ হারাইলে কোন দুঃখই করে না বরং এই ভাবিয়া শান্তনা লাভ করে যে আল্লাহর নেয়ামত ছিল উহা আল্লাহ নিয়াছেন। কত লক্ষ লক্ষ লোক আল্লাহর নেয়ামত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। সে ছাড়া কে জানে,

সেই মালের উপলক্ষে হয়তো আল্লাহর না-ফরমানীতেও গেরেফ-তার হইতে হইত। সুতরাং মাল চলিয়া যাওয়ায় ক্ষোভ না করিয়া খোদার শোকরই আদায় করা চাই। তাওয়াক্কুলের এই মর্তবা অর্জন করা অসম্ভব না হইলেও কঠিন অবশ্যই।

হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন—মানুষ রাত্রিতে না জানি কত কি চিন্তা করিয়া নিদ্রা যায়। সে পরদিন নিজ উন্নতির জন্য এই ব্যবস্থা করিবে। সেই সব চিন্তা অজ্ঞাত সারে তাহাকে গুনাহের দিকে লইয়া যায়। আল্লাহই তাহাকে গুনাহ হইতে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যখন তাহার সেই উদ্দেশ্য নিজের লক্ষ্য অনুযায়ী সফল হয় না, তখন সে নিজ বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতে থাকে। অথচ উহা যে খোদারই অনুগ্রহ তাহা আদৌ চিন্তা করে না। এই জন্য হজরত ওমর (রাঃ) বলিতেন—"কাল আমি গরীব থাকি বা ধনী হই. সে জন্য আদৌ আমার চিন্তা নাই। কেননা, আমি সর্বাবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করিয়া থাকি।"

প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র এবং সম্বলহীনতাকে ভয় করা শয়তানের ওস্‌ওয়াসারই শামিল।

এক আবেদ ব্যক্তি তাওয়াক্কুল করিয়া মসজিদে অবস্থান করিল। মসজিদের ইমাম বলিলেন—"হে আবেদ! তোমার যখন খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই তখন তোমার রুজী রোজগার করা উচিত।" আবেদ বলিল—"আমাকে এক ইয়াহুদী দুই খানা করিয়া রুটী দিয়া যায়, ইমাম বলিলেন, তবে তো ভালই—তবে

তুমি এখন নির্জন বাস অবলম্বন করিতে পার।" আবেদ বলিলেন, হে ইমাম! তোমার প্রতি আফসুস্। তোমার মত লোকের ইমামতি করা চাই না, যেহেতু আল্লাহর প্রতি ভরসার তুলনায় এক ইয়াহুদীর প্রতি ভরসাকে উত্তম মনে করিবে।

কোন ইমাম একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার জীবিকার উপায় কি?" সে ব্যক্তি বলিল—"দাঁড়াও। এখনই বলিতেছি।" আমি তোমার পিছনে নামাজ পড়িয়াছি উহা দোহ-রাইয়া লই। কেননা তোমার তো আদতে আল্লাহর প্রতি ঈমান নাই। সুতরাং তোমার পিছনে আমার নামাজ পড়া বৃথা গিয়াছে। যে সব আল্লাহওয়ালা মুত্তাকী লোক এই পথে গিয়াছেন তাহারাই ভাল জানেন, আল্লাহ কি ভাবে তাহাদের রুজী পৌঁছাইয়া থাকেন। কেননা রেজেকের জামীন আল্লাহ নিজে এবং ইহা আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করিয়াছেন—

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ۝

অর্থাৎ—পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নাই যাহার রেজেকের জন্য আল্লাহ জামিন নহেন!

হুযায়ফা নামক এক দরবেশকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি হজরত ইব্রাহীম আদহামের নিকট কেন অবস্থান করেন? তিনি বলিলেন—"তবে শোন! এক সময়ে আমরা উভয়ে মক্কা শরীফে যাইতেছিলাম। কুফায় উপস্থিত হইলে, আমরা ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া পড়িলাম। হজরত ইবরাহীম আদহাম (রহঃ) ক্ষুধার কথা

জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি বলিলাম, জি হুজুর। তিনি একখানা কাগজে বিস্‌মিল্লাহ লিখিলেন। অতঃপর লিখিলেন—হে আল্লাহ সর্বাবস্থায় তুমিই আমার আশ্রয়। তুমি সর্বব্যাপী। আমরা শুধু তোমারই শোকর করি এবং তোমারই ইবাদত করি। আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণার তুমিই জামিন। এই মর্মে চিঠি লিখিয়া তিনি আমার হাতে দিলেন এবং প্রথমে যাহার সহিত সাক্ষাত হয় তাহার হাতে দিতে বলিলেন। আমি বাহির হইয়া দেখিতে পাইলাম উটের পিঠে সুওয়ার হইয়া এক ব্যক্তি আসিতেছে। আমি চিঠিখানা তাহার হাতে দিলাম। সে ব্যক্তি চিঠিখানা পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই চিঠির মালিক কোথায়? আমি তাহার ঠিকানা বলিলাম। সে ব্যক্তি ছয় শত মোহরের একটি থলি আমার হাতে দিল। আমি লোকের নিকট পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সে একজন খৃষ্টান। আমি সেই মোহরের থলিটি ইব্রাহীম আদহামের হাতে দিলাম। তিনি বলিলেন—দাঁড়াও, থলির মালিক এখনই আসিতেছে। ইতিমধ্যে সেই খৃষ্টানটি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হজরত ইব্রাহীম আদহামের হাতে ইসলাম কবুল করিল।"

হজরত ইয়াকুব বসরী (রহঃ) বলেন যে, আমি ক্রমাগত দশদিন হরম শরীফের ভিতরে অভুক্ত ছিলাম। ক্ষুধা যখন অসহ্য হইল তখন হরমের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম একটি শালগম পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষুধার তাড়নায় সেইটি উঠাইয়া খাইতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু সবরের তাকীদ অনুভব করিলাম। দশদিন ভুখা থাকিবার পর শালগম দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্ত করিব? সুতরাং শালগম হাত হইতে ফেলিয়া

দিয়া হরমশরীফে ফিরিয়া আসিলাম। একটু পরেই এক ব্যক্তি রওগনী রুটী বাদাম প্রভৃতি লইয়া আমার নিকট হাজির হইল এবং বলিল, "আমি সমুদ্রে পড়িয়াছিলাম। তখন মানত করিয়াছি যে, প্রথমে ফকীর-দরবেশের সহিত সাক্ষাত হইবে তাহাকে ইহা দান করিব।" তখন আমি প্রত্যেক বস্তু হইতে এক এক মুষ্টি উঠাইয়া তাহাকে দান করিলাম। এবং আল্লাহ পাকের অশেষ শোকর আদায় করিলাম। আমি চিন্তা করিলাম আমাকে রেজেক পৌছাইবার জন্য তিনি সমুদ্রের বায়ুকে প্রবল করিয়া তুফান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এইভাবে রেজেক পাঠাইয়াছেন অথচ আমি অন্যত্র রুজী তালাশ করিতেছিলাম।

পরিবার পরিজনওয়ালা ব্যক্তির তাওয়াক্কুল

পরিবার পরিজনভুক্ত ব্যক্তিগণও তাওয়াক্কুল করিবেন। সে তাওয়াক্কুল সংসার ত্যাগী দরবেশের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর না হইয়া সাধারণ শ্রেণীর ন্যায় হইবে। অবশ্য সে জন্য তাহার সওয়াব কম পাইবে না। সংসার ভুক্ত ব্যক্তিগণের বাল-বাচ্চা ও পরিবার পরিজ-নের ভরণ পোষণের জন্য পূর্ণ সংসারী হইতে হইবে এবং আয় উপার্জন করিতে হইবে। হজরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) বলিয়াছেন—সংসার ভুক্ত ব্যক্তিগণ দুনইয়াদারী বর্জন করিয়া নির্জনবাস এবং পাতা খাইয়া জীবন ধারণের ন্যায় তাওয়াক্কুল করিতে পারে না। পরিবার পরিবৃত্ত ব্যক্তির আয় উপার্জন করিতে হইবে। কেহ নিজে ব্যক্তি-

গতভাবে ভুখা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার উপর নির্ভরশীল পরিবার ভুখা রাখা জায়েজ হইবে না। অবশ্য অনেক পরিবারভুক্ত অলী দরবেশকেও উপার্জন পরিত্যাগ করিতে এবং সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করিতে দেখা যায়। উহা তাওয়াক্কুলকারীর সবর ইয়াকীনের উপর নির্ভরশীল।

মায়ের পেটে সন্তান খাদ্য খাইয়াই বাঁচে। আবার সুমিষ্ট হওয়ার পর মায়ের বুকে আল্লাহর হুকুমের সঞ্চিত দুধ পান করিয়া জীবন ধারণ করে।

যাহাই হউক। কেহ যদি এই ইয়াকীনের উপর তাওয়াক্কুল করে যে, আল্লাহ রেজিকের জামীন এবং সে এবাদত গুজারিতে লিপ্ত হয়। এই তাওয়াক্কুল জনিত সব পরীক্ষা অম্লান বদনে সহ্য করিয়া যায়, তাহার তাওয়াক্কুল অবশ্যই উচ্চ শ্রেণীর। আর যাহারা আল্লাহর রেজেক দানের ওয়াদার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া দুনইয়ায় আল্লাহর কর্তৃক সাধারণ রীতি নীতি এবং সুন্নতের দৃষ্টিতে কামাই উপার্জন করে নিজে সংযত ভাবে খায়, পরে এবং নিজ পরিজনকে ভরণ পোষণ করে উহাও তাওয়াক্কুলের ভিতরে গণ্য এবং সে ব্যক্তি বিশেষ সওয়াবের অধিকারী হইবে।

হজরত জুনায়েদ বুগদাদী (রহঃ)এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—'আমি রুজী অনুসন্ধান করিতে চাই।'' তিনি বলিলেন, ''তোমার যদি বিশ্বাস ইহা থাকে যে, আল্লাহ তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—তবে অবশ্যই উহা করিতে পার।'' সে ব্যক্তি বলিল—"থাকি অদৃশ্য পর্দার আড়াল হইতে কি আসে?'' হজরত জুনায়েদ

বলিলেন—"এরূপ ধারণা করা আল্লাহকে পরীক্ষা করার শামিল। অথচ এখানে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।" তখন সে বলিল—"তবে কি করা যায়?" তিনি বলিলেন—"রেজিকের জন্য আল্লাহর জামীনই যথেষ্ট।"

ঘরে খাদ্য সঞ্চয় করা

ঘরে খাদ্য জমা করিয়া রাখা তাওয়াক্কুলের নিশানা নহে। কেননা খাদ্য ঘরে জমা করিয়া রাখিলে খোদার উপর তাওয়াক্কুলের প্রশ্ন আসে না। আর রিজিক জমা করিলেই যে উহা ভোগ করিতে পারিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? তবে নিয়ত খাঁটি থাকিলে এবং রেজিক জমা করিয়াও উহা আল্লাহর রেজিক এবং যাহার কিসমতে আছে, সেই উহা ভোগ করিবে অথবা অভাবগ্রস্থকে দান করা হইবে এইরূপ নিয়তে খাদ্য জমা করা তাওয়াক্কুলের খেলাফ হইবে না। তবে তাওয়াক্কুলকারী এবং আল্লাহর প্রতি শোকর গুজার বান্দার পরিচয় এই যে, উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক রেজিকে সন্তুষ্ট থাকা উহা পুরোপুরি না জুটিলে সবর করা।

হজরত ইব্রাহীম খওয়াস (রহঃ)এর মতে চল্লিশ দিনের খাদ্য ঘরে সঞ্চয় করা তাওয়াক্কুলের বহির্ভূত নহে। কথা এই যে, রেজিক থাকা বা না থাকা, কম থাকা বা বেশী থাকার সাথে তাওয়াক্কুলের প্রশ্ন জড়িত নহে। কারণ আল্লাহ কাহাকেও পরিমিত রুজী দান করেন, আবার অপর্যাপ্ত রুজীও আল্লাহই দান করেন। কেহ সারা-দিন রুজী অন্বেষণ করিয়াও ভুখা থাকিয়া যায়, কেহবা বিনা চেষ্টায়ই

অফুরন্ত রেজিকের মালিক হইয়া যায়। উহা সবই আল্লাহর হাত এবং ব্যবস্থাধীন। কাজেই রুজী থাকিলেও তাওয়াক্কুল আল্লাহর প্রতি এবং না থাকিলেও রুজী আল্লাহরই হাতে। উহারই নাম তাওয়াক্কুল। জাহাজে চড়িলেই তুমি গন্তব্য স্থানে পৌছিবে উহার নিশ্চয়তা কি? যদি আল্লাহ নিরাপদে পৌছান তবেই পৌছিতে পারিবে। আবার নদীতে নৌকা ডুবিলেই যে মরিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? যদি আল্লাহ চান তবে বাঁচিয়াও যাইতে পার। কাজেই পার্থিব উপায় একটা বাহ্যিক উপলক্ষ স্বরূপ। উহার পশ্চাতে আল্লাহর মরজিই কার্যকরী হইতেছে। সর্বাবস্থায় অর্থাৎ রুজী বা রুজীর সমান হাতে থাকুক ভরসা একমাত্র আল্লাহর প্রতি। ইহার নাম প্রকৃত তাওয়াক্কুল।

তাওয়াক্কুলের নীতি

মাল-পত্র রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে কয়েকটি নীতির প্রতি লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, ঘরের মাল চুরি যাওয়ার আশঙ্কা থাকিলেও ঘরের দরজা খুব মজবুত করিয়া আঁটিবে না এবং মাল রক্ষণা-বেক্ষণ সম্পর্কে প্রতিবেশীকে অনুরোধ করিবেন না।

হজরত দীনার (রহঃ) ঘরের দরজা কোন রকমের ছিদ্রের সাহায্যে বন্ধ করিতেন এবং বলিতেন যে, কুকুর প্রবেশের আশঙ্কা না থাকিলে তিনি এতটুকুও করিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ, চোরে নিতে পারে এমন কোন মালই সংগ্রহ না করা। একবার মগীরাহ মালেক বিন দিনারের নিকট কিছু মাল প্রেরণ করিলেন। তিনি উহা এই বলিয়া ফেরত দিলেন যে, উহাতে তাহার দেলে শয়তানী ওয়াসওয়াসা পয়দা হইতেছে এবং উহার প্রতি চোরের দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়া সম্ভব, ফলে সে নিজেও গুনাহগার হইবে।

তৃতীয়তঃ, ঘর পরিত্যাগ করিবার কালে নিয়ত করিবে যে, মাল-পত্র চুরি হইয়া গেলে সে জন্য কোন ফরিয়াদ করিবে না এবং চোরকে মাফ করিয়া দিবে। হয়ত উহার দ্বারা অত্যধিক অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তির অভাব মোচন হইয়াছে অথবা সে হয়তো আর চুরি করিবে না। এরূপ নিয়তের পরে নিজের মাল চুরি গেলে উক্ত মাল সদ্‌কায়ে পরিণত হইবে। ফলে চোর ও মালিক উভয়ই উপকৃত হইবে। এরূপ নিয়তের ফলে এক দিরহামের পরিবর্তে শত দিরহাম সদকার সওয়াব লাভ হইবে।

চতুর্থতঃ, মাল চুরি হইয়া গেলে সে জন্য মোটেই দুঃখিত হইবে না। মনে করিবে উহা অবশ্যই কোন কল্যাণের জন্যই ঘটিয়াছে। সুতরাং মাল যদি আল্লাহর রাস্তায় সদকার নিয়ত করে তবে উহা পুনঃ তালাশও করিবে না, এমন কি, চোর যদি উহা ফিরাইয়া দিয়া যায়, তবুও উহা কবুল করিবে না। অবশ্য উহা ফেরত নিলে তাহার মালিকানা নষ্ট হইবে না। তবে তাওয়াক্কুলের সওয়াব পাইবে না।

হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) একবার উট হারাইলেন। প্রথমে তিনি তালাশ করিলেন। যখন পাওয়া গেল না "ফী ছাবিলিল্লাহ"

বলিলেন। অতঃপর কেহ উটের সন্ধান দিল। প্রথমে তিনি উট আনিতে যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন আবার ক্ষান্ত হইলেন। বলিলেন "উহা ফিরাইয়া আনার কোন প্রশ্নই উঠে না।"

এক বুজুর্গ ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে একটু মলিন এবং বিমর্ষ দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই ব্যক্তি বলিলেন—"আলায়ে ইল্লিনে অনেক বালাখানা দেখিলাম। মনে করিয়াছিলাম উহার কোনটিতে আমার স্থান হইবে, কিন্তু জানিতে পারিলাম উহার একখানাও খালী নহে। উহা ঐ সকল লোক দ্বারা পুর্ণ হইয়াছে যাহারা একবার "ফী-ছাবীলিল্লাহ, বলিয়া পুনঃ উহা ফিরিয়া পাইবার প্রত্যাশা করে নাই। গায়েবী আওয়াজ দ্বারা জানিতে পারিলাম যে. যদি আমিও ঐরূপ আল্লাহর সহিত ওয়াদা করিতাম তবে আমারও সেখানে স্থান লাভ হইত।

মক্কা শরীফে এক ব্যক্তি শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। সে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল তাহার পার্শ্বে একটি থলিয়া রাখাছিল উহা নাই। তাহার নিকট অপর এক ব্যক্তি শুইয়াছিল। সে সন্দেহ করিয়া তাহাকে ধরিল এবং বলিল—তুমিই আমার থলিয়া নিয়াছ। সে ব্যক্তি কোনই প্রতিবাদ না করিয়া তাহাকে নিজ গৃহে নিয়া গেল এবং যত টাকা ছিল বলিয়া দাবী করিল তাহাই তাহাকে দিয়া দিল। সে পরে জানিতে পারিল যে, উহা তাহারই কোন বন্ধু কৌতুক করিবার জন্য লুকাইয়া রাখিয়া ছিল। তাহার নিকট গিয়া নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাহিল এবং টাকা ফিরাইয়া দিল।

কিন্তু সে ব্যক্তি ফেরত লইতে অস্বীকার করিল এবং বলিল—"আমি উহা দিবার সময় আল্লাহরই জন্য দিবার নিয়ত করিয়াছি। এখন উহা ফেরত লইবার ইচ্ছা নাই। তুমি ইচ্ছা করিলে উহা গরীব মিস্‌কীনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে পার।"

বুজুর্গানের দ্বীনের ইহাও নীতি ছিল যে, তাহারা কোন রুটি বা খাদ্য কাহারও জন্য দিবার এরাদা করিলে যদি ঘটনা বশতঃ তাহাকে না পাওয়া যাইত তবে উহা পুনঃ ফেরত লইতেন না। মিসকীনকে দিয়া দিতেন।

তাওয়াক্‌কুলের পঞ্চম নীতি হইতেছে এই যে, চোর যদিও জালেম—তবুও তাহার জন্য বদ্‌ দোওয়া না করা এবং অপহৃত মালের জন্য আফসুস না করা।

হজরত রবি' বিন খশমের ঘোড়া চুরি হইয়া গিয়াছিল। তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন চোর ঘোড়া লইয়া যাইতেছে। লোকগণ বলিল—"আপনি চোরকে ধরিলেন না কেন? তিনি বলিলেন, "আমি মাফ করিয়া দিয়াছি।' লোকগণ চোরকে বদ্‌দোওয়া করিতে লাগিল! তিনি তাহাদিগকে বদ্‌দোওয়া করিতে বারণ করিলেন।

এক বুজুর্গের নিকট লোকে জিজ্ঞাসা করিল—জালেমের প্রতি বদ্‌দোওয়া করা উচিৎ কিনা? তিনি বলিলেন—

"তাহার জুলুমই তাহার পরিনামের জন্য যথেষ্ট। আমি কেন তাহার গুনাহকে ভারী করিতে যাইব?'

হাদীস শরীফে আছে—জুলুমের পরিবর্তে বদ্‌-দোওয়া করিয়া

লোক দুন্ইয়াতেই উহার প্রতিশোধ চুকাইয়া লইতে চায়। অনেক সময় বদ-দোওয়াকারীর প্রতিই জালেমের দাবী আসিয়া বর্তে।

ষষ্ঠ নীতি—চোরের জুলুমকে জুলুম মনে করিয়া বদ্ দোওয়া না করা। যেহেতু চোর ইহা জুলুম বলিয়া মনে নাও করিতে পারে। অথবা এই মনে করিয়া শোকর করা যে, তাহার দুন্ইয়ার মাল চুরি গিয়াছে, দ্বীন তাহার বহাল আছে। দুন্ইয়ার মালের নোকসান কোন চরম নোকসান নহে।

হজরত ফুজাইলের পুত্রের মাল এক সময় চুরি হইয়া গিয়াছিল। তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন। ফুজাইল জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার কি হইল, মালের জন্য কাঁদিতেছ? তিনি বলিলেন—"না। চোরের কার্য কলাপের জন্য কাঁদিতেছি। কেয়ামতের দিন কি করিয়া ইহাদের মুক্তি হইবে?

সর্বসাধারণে স্তরের মু'মিনদের জন্য শরীয়তে যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। অর্থাৎ যদি কাহারও খাদ্য সঞ্চিত না থাকে—এবং উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে আর ইহার ভাবনা চিন্তায় স্বাভাবিক এবাদত বন্দেগীতে খলল আসিয়া পড়ে তবে তাহাদের পক্ষে ঘরে খাদ্য সঞ্চয়ই বেহেতর। তবে এই শ্রেণীর লোক শরীয়তে দাবী না হইলেও তাওয়াক্কুলের মর্যাদা হারাইবে। আল্লাহই প্রকৃত রক্ষক এবং হেফাজতকারী। ইহার প্রতি দৃঢ়ভাবে ইয়াকীন রাখিয়া যদি কেহ দুন্ইয়ার স্বাভাবিক রীতি নীতি অনুসারে চোরের ভয়ে কারো ঘরে তালা লাগায়, শত্রু সংগে অস্ত্র বহন করে, শীত হইতে বাঁচিবার জন্য গরম কাপড় পরিধান করে, এবাদত বন্দেগী

করিবার জন্য খুব আছুদা হইয়া খানা খায়, উহাতে তাওয়াক্কুল বাতিল হইবে না। অবশ্য যদি মনে করে যে, ইহা ব্যতীত আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই, তবে উহাতে তাওয়াক্কুল বাতিল হইবে।

এক বন্দ্‌ হজরত রাসূলে করিমের (দঃ) এর নিকট সাক্ষাৎ করিতে আসিলে হজরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—"উট কোথায় রাখিয়াছ? বন্দ্‌ বলিলেন—"আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করিয়া আসিয়াছি। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিলেন—"প্রথমে কোন স্থানে বাঁধিয়া আস পরে তাওয়াক্কুল কর।

যদি কেহ কষ্ট দেয় উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের খেলাফ। কেননা, আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ—'তাহাদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা কর।' ইহা কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যদি কোন হিংস্র জন্তু বা সাপ বিচ্ছু যন্ত্রনা দেয়, তবে সে ক্ষেত্রে সবর করা চাই না।

রোগ ব্যাধির চিকিৎসার বেলায় তাওয়াক্কুল

রোগ অর্থ কোন কিছুর অভাব হওয়ার কারণে শরীরে অসুস্থতা বোধ করা। উহার প্রতিকার তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথমতঃ যেগুলির প্রতিবিধান নিশ্চিত, যেমন ক্ষুধার বেলায় খাদ্য, পিপাসার বেলায় পানি, উত্তাপের বেলায় ঠাণ্ডা এবং শীতের বেলায় উত্তাপ

ইত্যাদি। এইগুলি বর্জন করাই বরং তাওয়াক্কুলের খেলাফ। দ্বিতীয়তঃ যাহার কোন নিশ্চয়তা নাই এবং শরীয়তগত ভিত্তিও নাই। বরং শরীয়তে নিষিদ্ধ রহিয়াছে। যেমন যাদু, টোনা, আমালিয়াত প্রভৃতি করা। এইগুলি আদৌ করা চাই না।

তৃতীয়তঃ—ঐ সকল চিকিৎসা যাহার ফলাফল নিশ্চিত নহে। যেমন হাকীম কবিরাজের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করা। ইহা শরীয়ত মতে জায়েজ আছে। তবে এই ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল ত্যাগ করিবে না। এই সম্পর্কে হজরত (দঃ) এর নির্দেশ রহিয়াছে। উহা এই যে, তোমরা চিকিৎসা কর, চিকিৎসা দ্বারা যে কোন রোগ আরোগ্য হইতে পারে মওত ব্যতীত। লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল—যাদু, টোনা, মন্ত্র-তন্ত্র হইতেও কি চিকিৎসা হইতে পারে? হজরত (দঃ) ব ললেন—"ইহা খোদার হুকুমের অধীন। আমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ সর্বদা এই উপদেশ দিয়াছেন যে, আমার উম্মতগণকে আমি যেন সিংগা লাগাইতে বলি। উহার জন্য উত্তম দিনগুলি হইল মাসের সতের উনিশ এবং একুশ। রক্তাধিক্য অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং সে জন্য এই চিকিৎসা করা চাই। এইরূপ সাপ. বিচ্ছু দমন করা, ঘরে আগুন লাগিলে উহা নির্বাপিত করা তাওয়াক্কুলের খেলাফ নহে।

হজরত (দঃ) ঔষধ ব্যবহার করিতেন এবং রক্ত মোক্ষণ করাইতেন। ওহী নাযিল হইলে মাথায় হঠাৎ বেদনা হইত। তখন মেহেদী ব্যবহার করিতেন। কখনও বা যখমের উপর মাটির প্রলেপ দিতেন।

এইসব দৃষ্টে প্রমাণিত হইতেছে, রোগে ঔষধ ব্যবহার করা সুন্নত। তবে এখানেও তাওয়াক্কুল করিতে হইবে। উহা হইল এই যে, যিনি ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার উপরে তাওয়াক্কুল করিবে ঔষধের উপর নহে।

চিকিৎসা পরিত্যাগ করা

কোন কোন ওলী আল্লাহ চিকিৎসা আদৌ করাইতেন না। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, আল্লাহর তরফ হইতে রোগের পরিণাম কি হইতে পারে উহা মা'লুম হওয়ার কারণে হয়তো চিকিৎসার প্রয়োজনই মনে করেন নাই।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে অন্তিম রোগের চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়া হইলে তিনি বলিলেন—"আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। সুতরাং চিকিৎসার প্রয়োজনই থাকে না।" কোন কোন আল্লাহর ওলী আল্লাহর চিন্তায় এরূপ নিমগ্ন রহিয়াছেন যে, চিকিৎসা করা বা অন্য কোন দিক ধ্যানই তাহাদের হয় নাই।

কেতাবে উল্লেখ আছে—হজরত আবু দরদা (রহঃ) যখন পীড়িত অবস্থায় কাতর। তিনি আর্তনাদ করিতেছিলেন, লোকগণ তাহার আর্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"গুনাহের জন্য তওবা করিতেছে।" লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল "কোন বিষয় ইয়াদ রহিয়াছে কি?" তিনি বলিলেন "হাঁ! গুনাহের তওবা যেন কবুল হয়।" লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল—"কোন চিকিৎসক

ডাকিব কি ?" তিনি বলিলেন "চিকিৎসার চেয়ে উত্তম কাজে নিযুক্ত আছি।"

অনেক সময় লোকগণ হতাশ হইয়া বা কষ্ট সহিষ্ণু হইবার জন্য কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত মসিবত উত্তীর্ণ হইবার নিয়তে চিকিৎসা বর্জন করিয়া থাকে। কোন কোন সময় লোকে নিজ গুনাহের কাফ্ফারার জন্যও চিকিৎসা বর্জন করিয়া থাকে। মনে করে যে, আল্লাহ যদি এই রোগের দরুণ গুনাহ মার্জনা করিয়া দেন।

হজরত ঈসা (আঃ) বলিতেন "যে ব্যক্তি নিজের রোগকে গুনাহের কাফ্ফারা মনে না করে সে দ্বীনদার নহে।

হজরত মূসা (আঃ) এক রোগীর জন্য দোওয়া করিতেছিলেন। আল্লাহর তরফ হইতে ওহী আসিল যে, রোগ তাহার রহমতের শামিল।

কোন কোন সময় লোক এজন্যও রোগের চিকিৎসা বর্জন করিয়া থাকে যে, সুস্থাবস্থায় আল্লাহর এবাদত বন্দেগী এবং জিকির হইতে গাফেল রহিয়াছে। রোগের সময় আল্লাহ ইয়াদ করা হয় এবং রহমত প্রার্থনা করা হয় সুতরাং চিকিৎসা বর্জন করিয়া স্বেচ্ছায় রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

বুজুর্গ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন—দারিদ্র, রোগ-ব্যাধি এবং দুনইয়াবী বিপদ-আপদ দ্বারা আল্লাহর ঈমানদারদিগকে, পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

হজরত আলী (কঃ) কোন এক গোত্রের লোকদিগকে দেখিলেন তাহারা রং মাখাইতেছে এবং সাদা পোষাক পরিধান

করিতেছে। তিনি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা, বলিল"—আমাদের ঈদের দিন। তিনি বলিলেন, মুসলমানের ঈদ তো ঐদিন যে দিন তাহার গুনাহ ব্যতীত অতিবাহিত হয়।

এক বুজুর্গের নিকট কেহ কুশল জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন—"কুশলে তো সেই দিন থাকি যে দিন গুনাহ ব্যতীত কাটে।"

ফেরাউন চারিশত বৎসর জীবিত ছিল। এই সুদীর্ঘ জীবনে তাহার কোন দিন রোগ-ব্যাধি হয় নাই। যদি কখনও রোগ ব্যাধি হইত সে তখন খোদাই দাবী করা ছাড়ান দিত।

কোন কোন বুজুর্গ বলিতেন, কোন মু'মিন বান্দার একাধারে চল্লিশ দিন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটান ভাল নয়।

একদিন হজরত (দঃ) রোগ ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন। দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে হইতে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি বলিল—"আমার তো আজ পর্যন্ত কোন রোগ ব্যাধি হয় নাই।" হজরত (দঃ) বলিলেন—"আমার সম্মুখ হইতে ভাগ। তিনি আরও বলিলেন—"যদি কোন দোজখী দেখিতে হয় ইহাকে দেখ।"

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) একদিন হজরত রসূলে করীম (দঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—শহীদের মর্যাদা কাহারা লাভ করিবে?

হজরত (দঃ) বলিলেন—"যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রে বিশ বার মৃত্যুকে স্মরণ করে।"

উপরোক্ত কারণে বুজুর্গানে দ্বীনগণ রোগ হইলে উহা আল্লাহর রহমত মনে করিতেন।

এক সময় হজরত ওমর (রাঃ) সিরিয়া সফরের উদ্যোগ করিতেছিলেন। সেখানে তখন মহামারী চলিতেছিল। লোকেরা তাহাকে সফর হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "আমরা যেখানে যাই আল্লাহর রাজী রাস্তাতেই যাইতেছি। তিনি যেখানে আমাকে পৌঁছান, উহাতেই আমার কল্যাণ রহিয়াছে।"

হজরত ওমর (রাঃ) বিষয়টি জানিবার জন্য হজরত আওফ (রাঃ)-কে ডাকিলেন। তিনি বলিলেন, হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—"যেখানে মহামারী আছে সেখানে যাওয়া হইতে বিরত থাক। আর যদি অবস্থিতি স্থানে মহামারী লাগিয়া যায় তবে সে স্থান পরিত্যাগ করিও না।"

হজরত ওমর এই পরামর্শ সন্তুষ্ট হইলেন। যেহেতু ইহা হাদীস মুতাবেক ছিল। মহামারীর স্থান পরিত্যাগ করা এই জন্য নিষেধ যে, তাহা হইলে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা কে করিবেন। কোন হাদীসে আছে, মহামারীর স্থান হইতে পলায়ন করা জেহাদ হইতে পলায়ন করার শামিল।

———

রোগ গোপন রাখা

রোগ প্রকাশ না করা তাওয়াক্কুলের পরিচয়। চিৎকার আর্তনাদ ও বিলাপ করিয়া লোকদিগকে জানান মকরূহ বলা হইয়াছে। তবে রোগ যদি বাস্তবিকই যন্ত্রণাদায়ক হয় তবে উহাতে দোষ হইবে না।

হজরত আলী (কঃ) একবার রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল—'কেমন আছেন?' তিনি বলিলেন, 'ভাল নয়।" উহা শুনিয়া লোকগণ বিস্ময়বোধ করিল, তিনি বলিলেন—আল্লাহর সামনেও বাহাদুরী দেখাইতে হইবে কি? হজরত (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"তোমরা স্বাস্থ্যের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর।" হজরত (দঃ) নিজে ছবরের জন্য দোওয়া চাহিতেন।

রোগ-ব্যাধি ব্যতীত রোগের ভান করা ভাল নহে। তদ্রূপ রোগ-ব্যাধির কারণে আল্লাহর প্রতি অভিযোগ করাও প্রয়োজন নহে। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশ করা দোষনীয় নহে। তবুও রোগ-ব্যাধি হইলে ছবরের উদ্দেশ্যে গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয়। কেননা উহা বাড়াবাড়ি হইতে পারে এবং শ্রোতারা উহাকে আল্লাহর বিরুদ্ধে শেকায়েত বলিয়া মনে করিতে পারে। রোগ-ব্যাধিতে হায়-মাতম করা দুরুস্ত নহে। উহাও ছবর ও তাওয়াক্কুলের লাঘব করে।

হজরত ফুজাইল বিন আয়াজ, হজরত বশরহাফী প্রভৃতি আউলিয়াগণ যখন রোগাক্রান্ত হইতেন তখন তাহারা ঘর হইতে

বাহির হইয়া চলাফিরা করিতেন। যাহাতে লোকে তাহাদিগকে দেখিতে না আসে।

আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত ও সন্তুষ্টি

দুনইয়ার সব কাজ-কর্ম এবং নেক আমল খোদার মুহাব্বত দৃঢ় করার উপলক্ষ মাত্র। আল্লাহর মুহাব্বত এবং মা'রেফত অর্জনই মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদার সম্বল। লোকের সবুর, তওবা ও যোহদ প্রভৃতি গুণাবলী বুনিয়াদী বিষয়। মুহাব্বত ও রেজা উহারই অন্তর্গত। আসল জিনিস হইল দুনইয়াতে সব কিছুর উর্ধে আল্লাহর মা'রেফত অর্জন করা। যদিও পূর্ণভাবে পারা না যায়—তবুও যেন দুনইয়ার তুলনায় আল্লাহর মুহাব্বত বেশী থাকে। আল্লাহর হাকীকতের প্রতি মুহাব্বত অতি কঠিন কাজ। এক শ্রেণীর দার্শনিক আলেম আল্লাহর মুহাব্বত অসম্ভব বলিয়াছেন। তাহাদের ধারণা মানুষ যেহেতু জড় দেহী সুতরাং সে জড় পদার্থকেই ভাল বাসিতে পারে। আল্লাহর আনুগত্য এবং ফরমাবরদারী সম্ভব কিন্তু তাহাকে ভালবাসা সম্ভব নহে। দার্শনিক আলেমদের এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। আল্লাহর মুহাব্বত সম্পর্কে শরীয়তের প্রামাণ্য দলীল উল্লেখ করা যাইতে পারে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন—

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ •

অর্থাৎ—আল্লাহ তাহাদিগকে ভালবাসেন এবং তাহারাও আল্লাহকে ভালবাসে।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাহার রসূলকে দুনইয়ার সব কিছু হইতে না ভালবাসে তাহার ঈমান কামেল নয়।" এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন "ঈমান কি? হজরত (দঃ) ইরশাদ করিলেন—আল্লাহ এবং রসূলের সাথে সর্বাপেক্ষা অধিক মুহাব্বতের নাম ঈমান। আর সে পর্যন্ত কেহ কামেল মু'মেন হইতে পারে না, যে যতক্ষণ আল্লাহ এবং তাহার রসূলকে মাল, পরিবার-পরিজন এবং দুনইয়ার সব কিছু হইতে অধিক মুহাব্বত না করিতে পারে।

এক ব্যক্তি হজরত (দঃ)-কে মুহাব্বতের দাবী করিল। হজরত (দঃ) বলিলেন—"দারিদ্রের জন্য প্রস্তুত হও।" অতঃপর বলিল—"আল্লাহকে মুহাব্বত করি" হজরত (দঃ) বলিলেন—'তবে মুসিবত বরদাশত করিবার শক্তি সঞ্চয় কর।"

আজরাইল (আঃ) হজরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জান কবজ করিবার জন্য আসিলে তিনি বলিলেন, "দোস্ত কি দোস্তের জান কবজ করিতে পারে?" আল্লাহর তরফ হইতে নেদা আসিল—"দোস্ত কি দোস্তের নিকট আসা অস্বীকার করিতে পারে?" ইহা শুনিয়া হজরত ইবরাহীম (আঃ) আজরাইলকে জান কবজ করিতে অনুমতি দিলেন।

এক এ'রাবী হজরত (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেয়ামত কবে হইবে? হজরত বলিলেন—সেদিনের জন্য তুমি কি জোগাড়

করিয়াছ? এরাবী বলিলেন—"রোজা-নামাজ বেশী করিতে পারি নাই। তবে আল্লাহ এবং তাহার রসূলকে মুহাব্বত করি।" হজরত (দঃ) বলিলেন, "নিশ্চিত থাক, তুমি যাহাদিগকে ভালবাস কেয়ামতে তাহাদের সাথেই থাকিবে।"

হজরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) বলিয়াছেন—"যে একবার আল্লাহর মুহাব্বতের স্বাদ পায় সে দুনইয়াকে ঘৃণা করিতে শুরু করে।"

হজরত হাসান বসরী (রহঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর মুহাব্বত যাহার হাসিল হয়, সে আল্লাহকে ভালবাসিতে শুরু করে। আর যে দুনইয়া চিনিয়া ফেলে সে দুনইয়াকে মুহাব্বত করিতে শুরু করে। সে আর আল্লাহকে মুহাব্বত করিতে পারে না। স্মরণ রাখ! মুসলমান গাফেলী অবস্থায়ই কেবল খুশী হইতে পারে। কেননা আল্লাহর স্মরণ হইলে সে চিন্তিত না হইয়া পারে না।

হজরত ঈসা (আঃ) কতকগুলি লোককে দেখিলেন—অতি জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের অবস্থা এইরূপ কেন? তাহারা বলিল, আল্লাহর ভয়ে আমরা ভীত। হজরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, তোমাদের পক্ষে ন্যায্য। তোমাদিগকে আল্লাহ ভালবাসেন।

তিনি আরেক শ্রেণীর লোককে দেখিলেন—উক্ত লোকদের চেয়েও দুর্বল এবং জীর্ণ শীর্ণ। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, আল্লাহর মুহাব্বতে তাহাদের দশা এইরূপ হইয়াছে। হজরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ তোমাদের আশা পূর্ণ করিবেন। তোমরা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত। আমি এমন লোকের নিকট বসিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি।

আল্লাহর মুহাব্বতের হাকিকত

এক শ্রেণীর মানুষের ধারণা আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত আনায়ন করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এই ধারণা ভ্রান্ত, এবিষয়ে উপরেও কিছু উল্লেখ করিয়াছি। এখনও এই বিষয় কিছু আলোচনা করিব। আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম, উহা সকলের পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে। তবে মুক্তির জন্য যখন আল্লাহর মুহাব্বত ব্যতীত গত্যন্তর নাই তখন এই বিষয়ে মোটামুটি কিছু জানা কর্তব্য।

মুহাব্বত কাহাকে বলে তাহা প্রথমে জানিতে হইবে। কোন জিনিস ভাল মনে হওয়ার কালে উহার দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করে অথবা উহার দিকে নিজের আকর্ষণ অনুভব করিতে থাকে। এই ভাল লাগা বা আকর্ষণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ইশ্‌ক অর্থাৎ গাঢ় মুহাব্বত পয়দা হয়। উপরোক্ত দুই অবস্থার মধ্যবর্তী আর একটি অবস্থা আছে উহা শত্রুতা, না ভালবাসা। কোন জিনিস ভালও না লাগা এবং মন্দও না লাগা।

মানুষের প্রকৃতি ও পঞ্চেন্দ্রিয়

মানুষের নিকট কোন জিনিস ভাল লাগার জন্য উহার হাকিকত বা মূল রহস্য জানা দরকার হয়। যে কোন জিনিস হউক না কেন, মানুষের নিকট উহার তিনটির অবস্থার একটি হইবে। ভাল

বা মন্দ কিংবা এতদুভয়ের মাঝামাঝি। যে কোন জিনিষের গুণাগুণ জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের নিকট উহা ভাল বা মন্দ কিছুই সাব্যস্ত হইবে না। মানুষ নিজ অনুভূতি এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ কোন সাহায্যেই কোন জিনিসকে জানে এবং বিচার করে। যেমন দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা দৃশ্যমান বস্তুগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। মনোরম বাগ-বাগিচা, ফুল, ফল এবং উত্তম দৃশ্যাবলী দেখিয়া থাকে এবং উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলে উহা ভাল বা ভালবাসার কারণ হইয়া থাকে। এইরূপ উত্তম সুর বা শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে সুমধুর অনুভব হয়। ফলে উহার প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়র সাহায্যে উত্তম ঘ্রাণ বিশিষ্ট জিনিসের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। জিহ্বা দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ পাওয়া যায়। ফলে সুস্বাদু জিনিসের প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। স্পর্শ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নরম কোমল জিনিসের প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত মানুষের মধ্যে ষষ্ঠ আরেকটি গুণ দেওয়া হইয়াছে। উহা হইতেছে মানুষের বোধ শক্তি এবং জ্ঞান। ইহা ছাড়া অন্যান্য সব গুণে মানুষ আর পশুতে কোন প্রভেদ নাই।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, দুনইয়াতে তিনটি জিনিস আমার নিকট প্রিয়। নারী, সুগন্ধি এবং নামাজ। নামাজ চোখের জ্যোতি। হজরত (দঃ) নামাজকে সকলের উচ্চে স্থান দিয়াছেন। যাহারা শুধু পশুর ন্যায়ই ইন্দ্রিয়ের অনুগত এবং জ্ঞানের আলো হইতে বঞ্চিত তাহারা নামাজের মর্যাদা বুঝিতে পারে না। যাহাদের

জ্ঞানের চক্ষু রহিয়াছে, তাহারা প্রত্যেক জিনিসের ভিতরের রহস্য বুঝিতে পারে। তাহারা এই সকল চাকচিক্যের উর্দ্ধে আল্লাহর অপার সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়। দুন্‌ইয়ার এই সকল সৌন্দর্য তাহাদের চক্ষে হেয় মনে হয়।

আল্লাহর মুহাব্বত অর্জনের তরিকা ও উপায়

আল্লাহর মুহাব্বত অর্জনের সর্বোত্তম তরিকা হইতেছে আল্লাহর প্রতি গভীর মনোনিবেশ করা। উহা পাঁচটি উপায় অর্জন হইতে পারে। প্রথমতঃ মানুষ দুন্‌ইয়াতে নিজের উন্নতি এবং স্থায়ীত্ব প্রাণপণে কামনা করে। যাহাতে তাহার অবনতি, ধ্বংশ এবং পতন উহাকে সে এড়াইয়া চলে এবং অবজ্ঞা করে। যেহেতু দুন্‌ইয়াতে সে স্থায়ীত্ব কামনা করে। সুতরাং যখন সে স্থায়ীত্ব কামনা করে তখন সে যাহাতে চিরস্থায়ী হইতে পারে উহার চেষ্টা কেন করে না? এই বাহ্যিক জগতের চেয়ে ব্যর্থ জিনিস আর কি হইতে পারে? ইহার সব কিছুই অচিরে ফানা হইয়া যাইবে। যাহা অচিরেই লয় হইয়া যাইবে উহাতে ডুবিয়া থাকায় কখনও আনন্দ লাভ হইতে পারে না। মানুষ তো সন্তান সন্ততি কামনা করে। দুন্‌ইয়ারই সুখের জন্য, উন্নতির জন্য এবং স্থায়ীত্বের জন্য। তাহার চিন্তা করা উচিত যে, দুন্‌ইয়ার কোন কিছুই চিরস্থায়ী

নয়। সে স্থায়ীত্ব অন্যত্র রহিয়াছে। সুতরাং উহাকেই মনে-প্রাণে কামনা কর জীবনের লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ উহাতেই আকৃষ্ট হয়, যাহাকে সে ভালবাসে। এই জন্যই বলা হয় যে, মানুষ সদ্ব্যবহারে বাধ্য। হুজরত (দঃ) দোওয়া করিতেন যেন কোন পাপাচারী ব্যক্তির উপকারের ঋণ তাহাকে করিতে না হয়। কেননা, তাহার উপকারের কারণে আমার অন্তর তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

তৃতীয়তঃ নেক লোকের সহিত মুহাব্বত হওয়া। এমন কি যাহার সহিত জীবনে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নাই এমন ব্যক্তির নেক কাজ ও আদল-ইনসাফের সুখ্যাতি শুনিয়া অন্তরে মুহাব্বত হইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ মানুষ স্বভাবতঃই সুন্দর জিনিস দেখিয়া খুশী হইয়া থাকে এবং সেই কারণে সে সৌন্দর্যও ভালবাসে। এই কারণে প্রিয়-দর্শন মানুষও মানুষের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে। আর তা হওয়াই চাই। অবশ্য উহার পশ্চাতে কোন কু-প্রবৃত্তির লালসা না থাকা চাই। এইরূপ কোন কোন সুন্দর বাগান বা সবুজ ফসলের ক্ষেত দেখিয়া মানুষ আনন্দিত হইয়া থাকে। মানুষ যদি এই অপরূপ সৌন্দর্যের ভুল উদ্দেশ্য আল্লাহর রূপের সন্ধান পাইত তবে একান্ত মনে তাহাকেই ভালবাসিতে শুরু করিত।

পঞ্চমতঃ মানুষের রুচী ও প্রকৃতির অনুযায়ী কোন কিছু হইলে উহা মানুষের আপনা হইতেই ভাল লাগে। প্রকৃতির অনুকুল হইলে. উহা মানুষের আপনা হইতেই ভাল লাগিয়া থাকে। যেমন

জুয়ারী জুয়ারীকে পছন্দ করিবে। বালক বালকের কাছে, আলেম আলেমের কাছে, সুফী দরবেশ, সুফী দরবেশের কাছে বসিলে শান্তি পাইবে। অনেক সময় মানুষের মুল প্রকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য এবং ঐক্য ঘটিয়া থাকে। ইহার কারণে একে অন্যের মধ্যে প্রকৃতিগত দিল লক্ষ্য করা যায়। উহা মূলে সৃষ্টিগত সাদৃশ্য। ইহার ফলে মানুষে মানুষে প্রকৃতিগত মিল লক্ষ্য করা যায়। হজরত (দ:)এর একটি হাদীসে ইহার প্রমান রহিয়াছে। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, রুহের মধ্যে পরস্পরে ঘনিস্টতা এবং দূরত্ব হইয়া থাকে ঘনিষ্টতা এবং দুরত্ব হইয়া থাকে। ঘনিষ্টতা হইলে উহার সহিত মুহাব্বত এবং বৈশাদৃশ্য হইলে উহার সহিত শত্রুতা হয়।

সৌন্দর্যের রহস্য

কেহ কেহ দেহের রং এবং লাবন্যকেই রূপ বলিয়া থাকে। ইহারা মূলে কামনার বশীভূত এবং জ্ঞান বহির্ভূত ধারণা পোষন করে। প্রকৃত পক্ষে যাহার স্বভাবে সৌন্দর্য ও মাধুর্য নাই যে সে সুন্দর নহে। জ্ঞানী লোকের মতে প্রত্যেক জিনিসের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সৌষ্ঠব ও পূর্ণতাই উহার সৌন্দর্য হইল বাকা, টেরা না হওয়া এবং উহা দ্বারা গঠিত বৃত্তটি নিখুঁত হওয়া। উহা কালো কালিতে হওয়ায় উহার মূল সৌন্দর্য কোন ব্যাঘাত ঘটায় না। রেখাটি রঙ্গীন কালিতে হইলেও কোন লাভ নাই। কেননা উহাতে আসল সৌন্দর্য নাই।

মোট কথা, বাহ্যিক রূপ বা সৌন্দর্য আসল রূপ নহে। উহা শুধু চোখের নিকট প্রিয় হইতে পারে। কিন্তু যদি উহাতে আসল রূপ অর্থাৎ উহার প্রার্থিত স্বভাব এবং মাধুর্য না থাকে তবে উহা চোখের নিকটও প্রিয় থাকে না।

মাকাল ফল দেখিতে কম সুন্দর নহে। কিন্তু উহার প্রতি মানুষের ঘৃণা ছাড়া কিছুই আসে না। কেননা উহার কদর্য স্বাদ উহা কুৎসিৎ এবং নিকৃষ্ট হওয়ার প্রমাণ।

অনেক জিনিস এমন রহিয়াছে। যাহা মানুষের চোখে দেখারও প্রয়োজন পড়ে না, স্বভাব ও গুণের জন্য উহা এমনিই ভালবাসে। স্নিগ্ধ বায়ু মানুষ দেখিতে পায় না, কিন্তু উহা মানুষের কতই প্রিয় কতই না কাম্য।

গুণী মানুষকে চক্ষে না দেখিয়াও উহার সুনাম সুখ্যাতি এবং কীর্তির প্রতি মানুষ মুগ্ধ হয়। ইহাই হইতেছে মানুষের আসল রূপ।

সুতরাং ইহাই প্রকৃত পক্ষে সত্য যে, মানুষ রক্ত-মাংসের দেহকেই ভালবাসে না, ভালবাসে মানুষের গুণ ও স্বভাব। এবং প্রকৃত জ্ঞানী সেই ব্যক্তি যে মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণ ও উত্তম স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করে।

এই একই কারণে লোকে হজরত রসূলে করিম (দঃ)কে ভালবাসে এবং আবু জহলকে নিন্দা এবং ঘৃণা করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মানুষের রূপ দুই প্রকার। এক জাহেরী (বহ্যিক দ্বিতীয় বাতেনী (আভ্যন্তরীণ)। বাতেনী রূপ ও সৌন্দর্যের মূল উৎস হইল, সেই মূল সৌন্দর্যের আঁধার আল্লাহ্, তাহারই আনুগত্য এবং তাবেদারী আমাদের প্রতি ওয়াজেব।

মানুষের ভালবাসার একমাত্র লক্ষ্য

মানুষের ভালবাসার একমাত্র লক্ষ্য হইল আল্লাহ রাব্বুল-আ'লামীন। এক আল্লাহ ব্যতীত ভালবাসার উপযুক্ত এই সংসারে আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি দুন্‌ইয়াকে ভালবাসে এবং খোদাকে ভুলিয়া যায়; সে একেবারেই জাহেল। অন্যপক্ষে সে খোদাকে ভালবাসে এবং সেই সম্পর্কে অন্যান্য সকলকে ভালবাসে। সে যথার্থ পথে রহিয়াছে। যে ব্যক্তি বাপ-মা, ভাই ভগ্নি, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন এবং গরীব-দুঃখী ও অন্যান্য সকলকে যথারীতি ভালবাসে সে আল্লাহর হুকুমেরই তাবেদারী করে। ইহাদের প্রতি ভালবাসা এবং কর্তব্য পালন করা, মূলে আল্লাহকেই ভালবাসা। আল্লাহর প্রতি ভালবাসার কারণগুলি বর্ণনা করিতেছি। কারণ, মানুষ নিজের জীবন, উন্নতি, গুণগরিমা ভালবাসে। এই ক্ষেত্রে মানুষকে মনে করিতে হইবে যে, ইহা তো একমাত্র খোদারই দান। সুতরাং নিজের প্রতি যে ভালবাসা উহা আল্লাহর প্রতিই কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। যেহেতু মানুষের মধ্যে যা' কিছু সুন্দর উহা তো সব আল্লাহ-ই দান করিয়াছেন। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহ না হইলে মানুষ কিছুই অর্জন করিতে পারিত না। এমনকি, এই দুন্‌ইয়াতে তাহার আগমনও হইত না। মানুষ যদি আল্লাহকে ভাল না বাসিয়া শুধু নিজের প্রতি ভালবাসায় আবদ্ধ হয়, তবে উহার দৃষ্টান্ত যেমন, গাছকে উপেক্ষা করিয়া গাছের ছায়াকে ভালবাসে। ইহা মানুষের নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ ঐ জিনিসকেই ভালবাসে যে তাহার নিকট উপকারী বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সে তাহার সদ্ব্যবহার করে। সুতরাং মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা হিতকারী এবং দয়া প্রদর্শনকারী এক আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে? কাজেই এই হিসাবেও আল্লাহই একমাত্র ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য। এই প্রকৃত হিতকারী ও সদ্ব্যবহারকারীকে মানুষ যদি বিস্মৃত হয়, তবে উহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে?

তৃতীয় কারণ :—দূরবর্তী অদেখা কোন গুণী বা নেককার মানুষের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার উদয় হওয়া। ইহার জন্য আল্লাহই ভালবাসা পাওয়ার উপযুক্ত। কেননা নেককার মানুষের প্রতি ভালবাসা একমাত্র আল্লাহই জাগরিত করিয়া দেন।

চতুর্থ কারণ হইল, কাহারও আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর জন্য ভালবাসা। এই মনে করিয়া যে, তাহার মধ্যে উত্তম গুণাবলী রহিয়াছে। যেমন হজরত আবুবকর ও হজরত আলী (রাঃ), ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) প্রভৃতিকে ভালবাসা অথবা পয়গাম্বরগণকে ভালবাসা। যেহেতু তাহাদের অন্তর ঈমানের নূরে রওশন ছিল। এই বাতেনী সৌন্দর্যের মধ্যে তিনটি সদগুণ নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ এলেম। এলেমের অধিকার অর্থাৎ আলেমকে এই জন্য ভালবাসা হয় যেহেতু তাহারা নেককার এবং সভ্য সংযত হইয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে মুহাব্বতের স্তরও উন্নত হইতে থাকিবে এবং তাহাদের মর্তবা উচ্চ হইতে থাকিবে। সুতরাং বাতেনী সৌন্দর্য ও তাহাদের বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। সুতরাং দেখা যায়

যে, ঐ সকল লোকের প্রতি যে মুহাব্বত উহা বাতেনী সৌন্দর্যের যিনি মূল উৎস—তাহার প্রতিই মুহাব্বত হওয়া উচিত। আর একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে ঐ সকল লোকের প্রতি মুহাব্বতের কারণ হইল যেহেতু তাহাদের মধ্যে আল্লাহর মুহাব্বত ও পূর্ণ মা'রেফত বিরাজমান ছিল।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে অন্যায় কাজ এবং নিজের আভ্যন্তরীণ কদর্যতাকে ঘৃণা করিয়া থাকে। যদি কখনও অসাবধানতা বশতঃ সে উহাতে লিপ্ত হয় তবে উহা মনে মনে ঘৃণা করিয়া থাকে। প্রকৃতিগত ভাবে যাহার মধ্যে এই স্বভাব যত বেশী হইবে নেকী ও সত্যের প্রতি তাহার মুহাব্বত তত বেশী হইবে। উপরোক্ত গুণগুলি মানুষের মধ্যে আংশিক ভাবে বিদ্যমান কিন্তু আল্লাহই হইতেছেন এই সকল গুনের আধার। আল্লাহর জ্ঞানের পূর্ণতার নিকট বান্দা কখনও পৌঁছিতে পারে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন—

وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٥

অর্থাৎ—মানুষকে অতি সামান্যই জ্ঞান দান করা হইয়াছে। এমনকি, মানুষ সামান্য একটি মক্ষিকারও রহস্য জানিতে অক্ষম। যত টুকুই সে জানে, কেবল খোদারই প্রদত্ত জ্ঞানের বলে সে জানিতে পারে। কেননা মানুষও আল্লাহরই সৃষ্টি। আল্লাহর অসীম এবং অফুরন্ত জ্ঞান কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। কিন্তু সকলেই আল্লাহর জ্ঞানের প্রতি মুখাপেক্ষী। শক্তি সামর্থের বেলায়ও সে কথা।

আল্লাহ যাহাকে যৎটুকু শক্তি দান করিয়াছেন উহার চেয়ে এক বিন্দুও অগ্রসর হওয়ার শক্তি কাহারও নাই। একটু লক্ষ্য কর, একটি ক্ষুদ্র মক্ষিকা মানুষের হাত হইতে লইয়া খায়। কিন্তু মানুষ তাহার নিকট হইতে উহা ফিরাইয়া আনিতে অক্ষম। এই মহা বিশ্বের মহা সৃষ্টিতে যাহা কিছু বিচিত্র ও বিস্ময়কর সব আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ তাহার নির্দেশ ব্যতীত একটি পাতাও নাড়াইতে পারে না। এই আসমান জমিনে যাহা দেখিতেছ, উহা ধ্বংশ করিয়া দিয়া পুনঃ হাজার হাজার ছনইয়া পয়দা করিলেও তাহার জ্ঞানের কিছু মাত্র অভাব পড়িবে না। আল্লাহর জ্ঞানের নিকট যত পয়গাম্বর কি ওলী, কি দরবেশ সকলেই অক্ষম। আল্লাহর স্বত্বা এবং কুদরত এমন যে উহাতে কোন দিন ঘাটতি দেখা দিবে না। সুতরাং সেই স্বত্বার দিকে আকৃষ্ট হওয়া এবং তাহাকেই ভালবাসা কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রত্যেক জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহর অসীম মহাত্মা গুণাবলীর ধারণা পরিপক্ক হইলেও তখনই কেবল আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত পুর্ণতা লাভ করিতে পারে। হজরত দাউদ (আঃ)এর প্রতি আল্লাহর তরফ হইতে ওহী নাজিল হইয়াছিল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রবুবিয়তের হক আদায় করে আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন। জুবুর কেতাবে আছে, যে ব্যক্তি শুধু দোজখের ভয়ে এবং বেহেশতের আশায় আমার এবাদত করে ভ্রান্ত। সে মনে করে যে, আল্লাহ যদি বেহেশত এবং দোজখ সৃষ্টি না করিতেন তবে তাহার এবাদত করারই কোন প্রয়োজন ছিল না

পঞ্চম—আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে এক ধরণের নেকসাদৃশ্য হইয়া থাকে। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন—

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي •

অর্থাৎ—রূহ আমারই এক হুকুম।

হাদীস শরীফে আছে—

ان الله خلق ادم على صورته •

অর্থাৎ—আল্লাহ আদমকে তাহার রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার ঠিক তাৎপর্য এখানে বলা না গেলেও আল্লাহ তাহার বান্দার সহিত এক ধরণের সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসে কুদসীতে আছে, বান্দা যেন আমার নৈকট্য অনুসন্ধান করে এবং সে যখন আমার নৈকট্য লাভ করে তখন আমি তাহার কান, হাত, পা সবই হইয়া যাই।

হজরত মুসার প্রতি আল্লাহ ওহী নাযিল করিলেন—

مرضت فلم تعد نى يا موسى •

'হে মুসা! আমি পীড়িত হইয়াছিলাম কিন্তু তুমি আমার পরিচর্যা কর নাই।

হজরত মুসা আল্লাহর নিকট হইতে এই ওহী লাভ করিয়া অবাক হইলেন। তিনি আরজ করিলেন—"হে পাক পরোয়ার দেগার, আপনি সারা জাহানের মালেক মোখতার, আপনি কিরূপে রুগ্ন হইতে পারেন? আল্লাহ বলিলেন—"আমার অমুক বান্দা পীড়িত ছিল, তাহার পরিচর্যাই মুলে আমার পরিচর্যা হইত।"

যাহা হউক, আল্লাহর সহিত কোন বান্দার মুহাব্বত কোন দৈহিক কারণে ঘটে না। তবে আল্লাহর দীদার লাভের কথা আছে। উহার তাৎপর্য নিম্নের চারিটি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে বুঝা যাইবে।

প্রথমতঃ আল্লাহর মা'রেফত দ্বারাই তাহার অধিকতর নৈকট্য অর্থাৎ দীদার লাভ হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর মা'রেফত এবং মুহাব্বত দুন্‌ইয়ার সব মুহাব্বত হইতে উত্তম।

তৃতীয়তঃ মারেফত দ্বারা সকলের শান্তি লাভ হইয়া থাকে। উহার সহিত বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন সম্পর্ক নাই।

চতুর্থতঃ দৈহিক খুশীর তুলনায় রুহের খুশীই অধিকতর আনন্দ দায়ক।

উপরোক্ত চারিটি বিষয় যথা রীতি উপলব্ধি হওয়ার পর আল্লাহর দীদার এবং মুহাব্বত ও মা'রেফত যে দুন্‌ইয়ার সব কিছুর চেয়ে উত্তম এবং উহার সম্মুখে সবই তুচ্ছ ও নগন্য। ইহা যথাযথ ভাবে অনুভব হইতে থাকিবে।

উপরোক্ত চারিটি বিষয় ছাড়া আরও কতিপয় বিষয় আছে, যেগুলির দেল এবং রুহের সহিত সম্পর্ক। উহার সহিত বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন সম্পর্ক নাই বরং উহা হইল সুক্ষ্ম। যে কোন সৃষ্টি অপেক্ষা উত্তম উহা দ্বারা প্রথমতঃ দৈহিক সম্পর্ক ব্যতীত রুহানী মা'রেফত দ্বারা দেল অধিকতর পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর মা'রেফত এবং তত্ত্বগত জ্ঞান দ্বারা দেল

যতখানি আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত লাভ হয়, দৈহিক ইন্দ্রিয়াদী দ্বারা সেই আনন্দ পরিতৃপ্তি লাভ হয় না।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর মা'রেফত জ্ঞানই সর্বোত্তম জ্ঞান ; এইজন্য পার্থিব যে কোন জ্ঞান হইতে মন উহার দিকে অধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

আল্লাহর মা'রেফত ও মুহাব্বতের জন্য মানুষের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক নাই"

উহাও চারিটি নীতিতে বিভক্ত।

(১) দেল কোন বাহ্যিক রূপ ব্যতীত রুহানী খুশীতেই অধিক তৃপ্তিবোধ করে।

(২) মা'রেফত এবং জ্ঞানের সম্যকার স্বাদে দেল আনন্দিত হয়, ততটা জাহেরী বা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের সুখে বিমুগ্ধ হয় না।

(৩) আল্লাহর মা'রেফত হইতেছে হাকিকী মা'রেফত। এই জন্য দেল দুনইয়াবী জ্ঞান ও তত্ত্বের চেয়ে আল্লাহর মা'রেফতের দিকেই বেশী ধাবিত হয়।

(৪) বাহ্যিক দৃষ্টির স্বাদ মা'রেফতের অনুভূতির তুলনায় উত্তম হয়।

উপরোক্ত চারিটি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে। উহার দ্বারা সংসার সৃষ্টি তত্ত্ব জ্ঞানের পার্থক্য বোধগম্য হওয়া সহজ হইবে।

প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ব্যতীতই দেলে আল্লাহর মা'রেফতের স্বাদ অনুভব করা উহা এইভাবে যে, আল্লাহ মানুষকে নানাবিধ বৈশিষ্ট্য ও শক্তি দান করিয়াছেন। যেগুলি পৃথক পৃথক ভাবে এক এক কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে। যেমন চক্ষু দেখার শক্তি। এই শক্তি মানুষের ঘ্রাণ শক্তির তুলনায় অধিক বেশী। এইরূপ লোভ একটি শক্তি। উহা মানুষের খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই শক্তি এবং স্পৃহা চিনিবার জন্য অন্য আর একটি শাস্তি দান করা হইয়াছে। উহা দ্বারা এইসব গতি বিধি অর্থাৎ লক্ষ্য চিনিতে পারা যায়। উহা হইতেছে মানুষের জ্ঞান। একমাত্র জ্ঞানই মানুষের আভ্যন্তরীণ চাহিদাগুলি উপলব্ধি করিতে পারে। এইসব জিনিস বুঝিবার জন্য মানুষের জাহেরী ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ অক্ষম। যেমন জ্ঞান বিজ্ঞান অনুধাবন করা, কিংবা কোন জটীল শাস্ত্র উপলব্ধি করা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের কাজ নহে। এইসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপলব্ধিতে মানুষের এক ধরণের আনন্দ উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি সতরঞ্চ খেলায় রত ব্যক্তিদের কাহাকেও একটি কঠিন চাল হইতে রক্ষা করিয়া দিতে পারিলে উহাতে এক প্রকার মানসিক আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। এই রূপ মা'রেফতকে বুঝিতে হইবে। যাহা উপলব্ধির জন্য বাহ্যিক কোন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নাই। বরং দেল নিজেই সে মা'রেফত অর্জন করিয়া থাকে। এই শক্তি আল্লাহই মানুষের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

এখন আশা করি ইহা বুঝিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে,

মানুষের মধ্যে আল্লাহ এমন রুহানী শক্তি পয়দা করিয়া দিয়াছেন, যাহা জাহেরী শক্তি ব্যতীতই আল্লাহর মা'রেফত অনুধাবনে সক্ষম।

দ্বিতীয় অসুল :—বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সমুহের অনুভূতি অপেক্ষা দেলের অনুভূতি অধিকতর আনন্দদায়ক। এক ব্যক্তি খেলায় মত্ত হইয়াছে। সে এই খেলায় খুব পারদর্শী। এই অবস্থায় সে খানাহার ভুলিয়া খেলায়ই মত্ত থাকিবে। তাহার দিন রাত্রির খেয়াল পর্যন্ত থাকিবে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, দৈহিক আনন্দ ও শান্তির কথা ভুলিয়া গিয়া সে খেলায় আনন্দ লাভের জন্য ব্যাপৃত রহিয়াছে। এইরূপ যদি কাহাকে বলা হয় যে, এই কাজ করিলে রাজ্য লাভ হইবে। সে এই উদ্দেশ্যে রাজ্যলাভের সুখে আত্মহারা হইবে অন্যপক্ষে কেহ যদি জ্ঞানের সাধনায় লিপ্ত থাকে এবং তাহাকে রাজ্যলাভের জন্য চেষ্টা করিতে বলা হয় তবে সে জ্ঞানের সাধনাকেই আনন্দের উৎস বলিয়া মনে করিবে এবং সেই কাজে লিপ্ত থাকিবে। রাজ্যের প্রতি সে ভ্রূক্ষেপ করিবে না। অবশ্য মানুষের এই ইচ্ছা খোদাই সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে রুহানী ব্যাপারে মানুষ যে আনন্দ লাভ করে, বাহ্যিক ব্যাপারে তাহা হয় না। সুতরাং ইলমে মা'রেফতে যে ব্যক্তি পরিপক্ক তাহার দৈহিক ভোগ বাসনার প্রতি তত আকর্ষণ থাকিবে না। এখন আসল কথা হইল এই যে, দেলে আল্লাহর জ্ঞান ও মা'রেফতের দ্বারা যে অনাবিল আনন্দ লাভ হয় উহা পার্থিব ভোগ বাসনার স্বাদ হইতে অধিকতর উচ্চ। যাহা হউক, এই আলোচনায় আর অধিক অগ্রসর না হইয়া এইখানেই শেষ

করিতেছি। কারণ ইহা ক্রমশঃই অধিকতর সূক্ষ্ম বিষয়ে আসিয়া পড়িতেছে। উহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য হইবে না।

আল্লাহর মুহাব্‌বতের উপকরণ

আল্লাহর মুহাব্বতের রহস্য এই জগতে অতি উচ্চ ও মহিমা ব্যঞ্জক। উহা বুঝাও সেই পরিমাণে কঠিন এবং জরুরী। দুন‍ইয়াতে কেহ কাহাকে ভাল বাসিলে বা কাহারও প্রেমে মুগ্ধ হইতে চাহিলে দুন্‌ইয়ার অন্য সব কিছু ভুলিয়া একমাত্র তাহারই প্রতি মন নিবিষ্ট করিতে হইবে। যদি সেই প্রেমাস্পদের চেহেরা নজরে পড়ে, তখন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি এক একটির সাদৃশ্য খুটিয়া খুটিয়া বিচার করিয়া দেখিতে থাকে। এই ভাবে তাহার প্রেমের আগুন আরো উদ্দীপিত হইয়া উঠে। ইহা হইল ইশ্‌কে মাজাজী বা দুন্‌ইয়াবী ইশ্‌ক। এইভাবে ইশ্‌কে হাকিকী বা খোদায়ী প্রেমও বাড়াতে পারে। তবে ইহা মানুষের চেষ্টা সাধ্যের উপর নির্ভরশীল। যথার্থ চেষ্টা করিলে আল্লাহর হাকিকী মুহাব্বত লাভ না হইবার কারণ নাই।

ইশ্‌কে হাকিকীর শর্ত

মুহাব্বতের বেলায় উহার প্রথম সূত্রপাত হওয়ার পর বিভিন্ন স্তর আসে। ইশ্‌কে হাকিকীর এইরূপ স্তরগুলি আদৌ সেই সব

স্তর বা মন্জিলগুলি অতিক্রম না করা পর্যন্ত আসল লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। এবার সেই মঞ্জিল বা আলোচনা করা যাক।

প্রথম মঞ্জিল, দেল একমাত্র আল্লাহর সহিত নিয়োজিত রাখিবে। দুনইয়ার মুহাব্বত একদম বৃথা এবং অর্থহীন খেয়াল করিবে। এবং আল্লাহর মা'রেফতের প্রতি অন্তর রুজু করিবে।

আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত হওয়াই তাহার মা'রেফত অর্জনের সোপান। মা'রেফত অর্জনের চেষ্টা জমিনে বীজ বপনের ন্যায়। বীজ বপনের পরে যেমন উহার পরিচর্যা করিতে হয় এবং পানি সিঞ্চন করিতে হয় এবাদত জিকির ফিকিরকে সেই পরিচর্যা জ্ঞান করিবে। লোকে যখন এই দিকে বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিবে তখন তাহার ভিতরে ক্রমান্বয়ে আল্লাহর মা'রেফত সৃষ্টি হইবে। বস্তুতঃ এমন কোন মুসলমান নাই যাহার অন্তরে আল্লাহর মা'রে-ফতের বীজ নিহিত নাই। তবে এই তারতম্যের কারণ তিনটি।

প্রথমতঃ পার্থিব মমতা এবং সংসারের ব্যস্ততায় লোকে জড়িত ও আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এভাবে একটি জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হইলে অন্য জিনিসের প্রতি মুহাব্বত হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়তঃ লোকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার তারতম্য। যেমন একজন সাধারণ ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে সাধারণভাবে ভালবাসিয়া থাকেন? কিন্তু একজন আলেম তাহার তুলনায় অনেক বেশী ভালবাসিবেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি ইমাম সাহেবের জ্ঞান ও মর্যাদা সম্পর্কে যত বেশী জানেন একজন সাধারণ লোকের তাহা জানার কথা নয়। সেইরূপ আবার ইমাম সাহেবের

খাস সাগরিদ তাহাকে যত ভালবাসিতেন অন্য কাহারও পক্ষে ততখানি ভালবাসা সম্ভব নহে। কেননা তিনি ইমাম সাহেবের জ্ঞান ও মর্তবা সম্বন্ধে তাহার নিকট হইতে যাহা জানিতেন। অন্য কাহারও পক্ষে তাহা জানা সম্ভব ছিল না। আল্লাহর মা'রেফতের বেলায়েতও ঠিক তেমনি। যতই লোকে আল্লাহকে অধিক জানিবে ও চিনিবে ততই তাহার প্রতি মুহাব্বত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। বুঝা যাইতেছে যে, খোদাকে যে মুহাব্বত করে না সে খোদাকে জানেনা বলিলেই হয়। কেননা, মা'রেফত মুহাব্বতেরই ফল।

পূর্ণ মা'রেফত অর্জনের উপায়

প্রথমতঃ তরিকত পন্থীদের নিয়ম হইল যে, নিজকে এবং এই দুনইয়াকে ভুলিয়া আল্লাহরই চিন্তায় নিমগ্ন হইবে। সেই সংগে নফসের মুজাহিদা করিবে। এই ভাবে যখন সে আল্লাহ ব্যতীত দুন্‌ইয়ার সব কিছু বিস্মৃত হইতে পারিবে। তখনই তাহার মা'রেফতের মন্‌জিল নজরে আসিতে থাকিবে। সেই সংগে আল্লাহর মাহাত্ম্য তাহার অন্তরে বিকশিত হইতে থাকিবে। যতই দুনইয়া তাহার নিকট হইতে দূর হইবে, ততই তাহার অন্তরে আল্লাহর মা'রেফত এবং মোহাব্বত বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য সবারই সমান মা'রেফত এবং মোহাব্বত হাসিল হয় না। প্রত্যেকের কিসমত ও প্রচেষ্টার মধ্যে যেমন তারতম্য থাকে। তেমনই মা'রেফতও সেই অনুপাতে হাসিল হয়।

দ্বিতীয় পন্থা হইল মা'রেফতের জ্ঞান অর্জন। এবং উহার নির্দ্ধারিত তরিকা অনুশীলন। ইহাতে এই সৃষ্টি জগতের প্রতি ধ্যান ও মোরাকাবা ক্রমশঃ উন্নত স্তরে হইতে থাকিবে। এমন কি, আল্লাহর নুর ও কামালিয়াতের মোরাকাবায় উন্নত হইতে থাকিবে, ইহার ফলে মোকাশেফা অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয় সমূহ গোচরীভূত হইতে থাকিবে। কামেল পীর ও মোর্শেদ ব্যতীত ইহা হাসিল করা সহজ সাধ্য নহে। এইজন্য আল্লাহর খাস রহমত প্রার্থনা করিবে। ইহা লাভ হইলে আল্লাহর বিশেষ রহমত মনে করিবে। আল্লাহর মা'রেফত অর্জন করা দুন্‌ইয়ার ব্যবসায় বানিজ্য ও কৃষি-কাজের ন্যায়ই মনে করিবে। এই সকল কাজে লাভবান হইবার জন্য মানুষ অফুরন্ত চেষ্টা সাধ্য করিয়া থাকে, এবং পরিনামে ফল লাভ করে, ইহাই তেমনি! চেষ্টা, যত্ন এবং সাধ্য-সাধনা করিলে, অবশ্যই ফললাভ হইবে; যদি চেষ্টা যত্নের পথ পরিত্যাগ করে তবে ফল লাভের আশা কি ভাবে করিতে পারে? উপরোক্ত দুইটি পথ হইতেছে আল্লাহকে পাইবার এক মাত্র পথ। ইহা ব্যতীত মা'রেফত অর্জনের অন্য কোন পথ নাই। আল্লাহর মুহাব্বত অর্জন করা ব্যতীত আখেরাত্ত লাভের ও কোন অন্য পন্থা নাই।

আসল কথা হইতেছে, পথ ধরিয়া চলিতে হইবে। প্রথমে সঠিক পথ চিনিয়া লইতে হইবে। তারপর সেইপথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আল্লাহ এক সময় অবশ্যই সফলতা দান করিবেন। দুন্‌ইয়াতে মন আকৃষ্ট থাকিলে আখেরাতের পূর্ণ সৌভাগ্য অর্জন

করা সম্ভব নহে। সুতরাং কষ্ট-তক্‌লীফ উঠাইতে হইবে। কেননা, আখেরাতে খোদার মোহাব্বত ব্যতীত অন্য কোন সম্বল নাই। সুতরাং সেই সৌভাগ্যশালী যে দুন্‌ইয়ার জেন্দেগী আল্লাহর মুহাব্বতের রঙ্গে রন্‌জিত করে।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন :—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ٭

অর্থাৎ নিজকে যে, পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করিয়াছে সেই কল্যাণ লাভ করিয়াছে। আর যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে, সেই বিফল মনোরথ হইয়াছে।

মুহাব্‌বতের লক্ষণ

সকলের মনেই এইরূপ ধারণা রহিয়াছে যে, সে খোদাকে মুহাববত করে। কিন্তু এইরূপ ধারণা কত দুর সত্য তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা চাই। এই পরীক্ষার জন্য অবশ্যই কোন মাপকাঠি নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। কেননা আল্লাহর মুহাব্বত দুন্‌ইয়ার জেন্দেগীতে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। সুতরাং উহা লাভ করাও সেই পরিমানে কঠিন।

আল্লাহর প্রতি মুহাব্বতের প্রথম পরীক্ষা হইল এই যে, মৃত্যুকে ভয় করিবে না ; বরং আল্লাহর দর্শন লাভের সোপান মনে করিবে। হুজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহকে ভালবাসে সে মৃত্যুকেও ভাল বাসিবে।

হজরত আবুল আলী (রহঃ) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি মৃত্যুকে ভালবাস?" সে ব্যক্তি উত্তর দিতে একটুও ইতস্ততঃ করিল। তিনি বলিলেন—যদি তুমি আল্লাহর খাঁটি প্রেমিক হইতে তবে মৃত্যুকে ভয় করিতে না। তবে আল্লাহর মুহাব্বতের প্রমান দিতে যাইয়া খুব দ্রুত মৃত্যু-কামনা করাও আসলে কোন জরুরী নহে। বরং দুন্‌ইয়াতে দীর্ঘজীবি হইয়া আল্লাহর মুহাব্বত ও মা'রেফত অর্জনে চেষ্টিত থাকা উত্তম। এরূপ ব্যক্তি সর্বদা আখেরাতের ইয়াদে নিমগ্ন থাকিবে।

দ্বিতীয় মাপকাঠি হইল আল্লাহর মুহাব্বতের মুকাবিলায় দুন্‌ইয়ার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। এমন কি, প্রিয়জন পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবে, নিজের প্রিয়বস্তু বিসর্জন দিয়া আল্লাহর প্রিয় বস্তুর প্রতি আগ্রহান্বিত হইবে। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—যে আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে দেখিতে চায় সে যেন আলেমকে দেখে।

অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি গুনাহ করিয়া বসে তবে তাহার যে আল্লাহর মুহাব্বত নাই ইহা প্রমানিত হয় না। অবশ্য আল্লাহর মুহাব্বতে অনেক মলিনতা আসিয়া যায়। নো'মান নামক জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর জমানায় মদ পান করিয়াছিল। তাহাকে অনেক বার সাবধান করা হইল। কেহ তাহার এই আচরণের জন্য তাহাকে অভিশাপ দিল। ইহাতে হজরত (দঃ) বলিলেন—"উহাকে অভিশাপ দিও না, সে আল্লাহ এবং রসূলকে ভালবাসে।"

তৃতীয় মাপকাঠি হইল—"আল্লাহর মুহাব্বতকারীর দেল এবং

জিহ্বা সর্বদা এবাদত ও জিক্‌রে লিপ্ত থাকিবে। উহাতে কখনও শিথিলতা না আসে। কেননা, যতই আল্লাহর মুহাব্বত বৃদ্ধি পাইবে, ততই জিক্‌র ও এবাদতে লজ্জত অনুভব হইবে। এই ভাবে মুহাব্বত পূর্ণতা লাভ করিলে দেল ও জবান সর্বদা আল্লাহর খেয়ান ও জিক্‌রে লিপ্ত হইবে। যদি মুহাব্বত পূর্ণতা লাভ না করে তবে জিক্‌র ও এবাদত ও কম হইতে থাকিবে।

চতুর্থ মাপকাঠি আল্লাহর কালাম এবং সকল জিনিস যাহা খাস ভাবে আল্লাহর সম্পর্কযুক্ত, উহার প্রতি মুহাব্বত রাখিবে। এবং এই দুনইয়ার সব কিছুই যে, আল্লাহর সৃষ্টি এই হিসাবে ইহার প্রত্যেক জিনিসকেই ভাল বাসিবে।

পঞ্চম মাপকাঠি জন মানবের মধ্যে মনের একাকীত্ব বজায় রাখিবে এবং সব কাজ কর্মের মধ্যে থাকিয়াও আল্লাহর প্রতি মন নিবিষ্ট রাখিবে।

ষষ্ঠ—আল্লাহর মুহাব্বতে এমন এক স্তরে উন্নীত হওয়া যে, একটা ভাব ও আনন্দ সৃষ্টি হয়। কেননা, সত্যিকারে প্রিয় জিনিসের প্রতি মানুষ কখনও বিতৃষ্ণ হয় না।

সপ্তম হইল এই যে, আল্লাহর ফরমাঁবরদার এবং নেককার বান্দার প্রতি মুহাব্বত পোষণ করা। এবং আল্লাহর না-ফরমান ও কাফেরদের প্রতি রুষ্ট ও বিতৃষ্ণ থাকা। কেননা, আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন :—

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ •

অর্থাৎ তাহারা কাফেরদের প্রতি খুবই কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল।

কোন পয়গাম্বর এই সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিলেন—"হে পরওয়ারদেগার! এই শ্রেণীর লোক কাহারা? আল্লাহ পাক ইরশাদ করিলেন—তাহারা আমার মুহাব্বতে এমন ভাবে আত্মহারা যেমন শিশু মায়ের দুধের প্রতি এবং পাখী তাহার বাসার প্রতি আকৃষ্ট থাকে। আর তাহারা আমার শত্রুদের প্রতি ক্রুদ্ধ বাঘের ন্যায় নির্ভীক হইয়া আক্রমণ করে।

উপরোক্ত চরিত্রগুলি আল্লাহর প্রতি মুহাব্বতের মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করিবে। যদি এই সব চরিত্রে কোন অভাব লক্ষ্য করা যায় তবে সেই অনুপাতে মুহাব্বতও অপূর্ণ মনে করিবে।

আল্লাহর প্রতি আগ্রহ

হজরত নবী করিম (দঃ) আল্লাহর প্রতি কিরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তাহা নিম্নের উক্তি হইতে বুঝা যায়—

اسئلك الى لقاءك ولذة النظر الى وجهك •

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার দর্শন লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব এবং তোমার দীদারের লজ্জৎ অনুভব করিতে চাই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:—

طال شوق الابرار الى لقاءي وانا لقائهم لاشد شوقا •

"নেককার বান্দারা আমার দীদারের আশায় ব্যাকুল এবং আমিও তাহাদের সাক্ষাতের জন্য আগ্রহী।"

যে ব্যক্তি আল্লাহর মুহাব্বত হইতে দুরে তাহার আগ্রহ হওয়ার কোন কারণ নাই। শওক অর্থাৎ মনের আকুল আগ্রহ কি উহা সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। প্রিয়জন বা প্রেমাস্পদ সম্মুখে অনুপস্থিত থাকিলে তখনই তাহাকে দেখিবার বা ভাল করিবার আকুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যাহাকে চাই না তাহার সম্পর্কে কোন আগ্রহ সৃষ্টির প্রশ্নই আসে না। তারপর যে জিনিস সম্মুখে বিদ্যমান উহা আমার মনপুতঃ না হইতে পারে। সুতরাং তাহার সম্পর্কে আগ্রহের কোন প্রশ্ন আসে না।

মানুষ তাহার প্রেমাস্পদের জন্য তখনই ব্যাকুল হয় যখন সে সম্মুখে অনুপস্থিত থাকে এবং তাহাকে লাভ করিবার আগ্রহ সব সময় অন্তরকে উন্মুখ করিয়া তোলে এবং তাহারই ধ্যান হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক থাকে। সুতরাং "শওক" অর্থ দাঁড়াইতেছে নিজ প্রিয়তমের সন্ধানে। অর্থাৎ প্রেমাস্পদের দর্শন লাভ করিয়া মনের আগ্রহ নিবৃত্ত করা। কিন্তু খোদার প্রেমের আকুলতা নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে। কেননা, খোদার মা'রেফত অর্জন করা সম্ভব; কিন্তু তাহার দর্শন আল্লাহর উচ্চতম মা'রেফত অর্জিত হইলে উহা এক প্রকার আবছা দীদারের সমতুল্য হইতে পারে। যেমন আধার ও আলোকের মধ্যে একটা অস্পষ্ট নূর প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে আবছা দীদার অনুভব হইয়া থাকে। ইহা দীদারের স্পৃহা আরো জাগ্রত করিয়া তুলে,

কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে ইহা কখনও পূর্ণ হইবার নয়। এই আকৃষ্ট এবং আবছা আলোই কেয়ামতে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হইয়া দেখা দিবে।

দ্বিতীয়—কেহ নিজ প্রেমাস্পদের মুখ মণ্ডল দেখিল। উহাতে তাহার প্রেমাস্পদের পূর্ণ রূপ সৌন্দর্যের ধারণা জন্মে না। এই ব্যক্তি তাহার প্রেমাস্পদের পূর্ণ অবয়ব দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইবে। কিন্তু আল্লাহর রূপ অসীম ও অফুরন্ত। মানুষ মা'রেফতে যতই পূর্ণতা লাভ করুক এবং কামেল হউক না কেন, আল্লাহর রূপ সৌন্দর্যের কোন কিনারা দেখিতে পাইবে না। কেননা, মানুষের অনুভূতি ও জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আল্লাহর জাতের রূপ সীমা হীন অনন্ত।

উন্‌স ও এশ্‌তিয়াকের পার্থক্য

উন্‌স আরবী শব্দ ইহার অর্থ ভালবাসা বা প্রেম। এবং এশ্‌তিয়াকও আরবী শব্দ। ইহার অর্থ চরম আগ্রহ বা কোন কিছু লাভ করার জন্য ব্যাকুলতা।

মানুষ যখন কোন কিছু দেখিয়া মুগ্ধ হয় এবং উহাকে আপন করিতে চায় তখন উহাকে উন্‌স বা মুহাব্বত বলে। আর এই উন্‌স বা মুহাব্বত যখন অপূর্ণ থাকার কারণে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে তখন উহাকে এশ্‌তিয়াক বা আগ্রহ বলে। খোদা-প্রেমিকগণের এই আকাঙ্ক্ষা দুনইয়া ও আখেরাতে সমান ভাবেই থাকিবে। ইহা কখনও শেষ হইবে না। আখেরাতে ঈমানদার ব্যক্তিগণ এই বলিয়া চীৎকার দিবে—

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا ٥

"হে পরওয়ারদেগার। তুমি আমাদেরকে তোমার পূর্ণ নূর দেখাও।" কিন্তু তাহারা কখনও সেই নূরের পূর্ণতা দেখিতে পাইবে না এবং আল্লাহর জাতের পূর্ণতা কখনও উপলব্ধি করিতে পারিবে না আর পূর্ণরূপে দেখিতেও পারিবে না। তবে আল্লাহর নূরের দর্শনাকাঙ্ক্ষীগণে আল্লাহর দীদারের আগ্রহ বাড়িতে থাকিবে এবং ক্রমশ: উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে থাকিবে। এই ভাবে তাহারা বেহেশতের সর্বোচ্চ দরজায় আরোহণ করিবে। সেখানেও তাহারা আল্লাহর দীদারের আশায় অধিকতর ব্যাকুল হইবে। এই ব্যকুলতার আনন্দ ইহাই হইবে বেহেশতবাসীর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত ও আনন্দ। ইহা কখনও শেষ হইবে না।

আল্লাহ কোন এক পয়গাম্বরের প্রতি এই মর্মে অহী নাজিল করিয়াছিলেন যে, যাহারা আমাকে ভালবাসে. আমি তাহাদিগকে ইয়াদ করি। যাহারা আমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল, আমিও তাহাদিগকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল।

রেজার ফজিলত ও হকিকত

মুহাব্বত দুনইয়াতে এমন একটি মাপকাঠি যে, উহা দ্বারা সব কিছুরই পরীক্ষা হইয়া থাকে। আল্লাহর মুহাব্বত দুনইয়ার সব কিছুর উর্দ্ধে। সুতরাং এই মুহাব্বত প্রমান হইবে আল্লাহর আনুগত্যের ভিতর দিয়া। যাহাকে ভালবাসা যায়, জান প্রাণ দিয়া

তাহার সন্তুষ্টি সাধন করাই হইতেছে ভালবাসার পরিচয়। এইটাই হইবে মুহাব্বতের আদর্শ এবং প্রেমের প্রেমাস্পদের প্রতিদান। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—

الرضاء بالقضاء باب الله الاعظم ٭

অর্থাৎ—আল্লাহর ইচ্ছায় রাজী থাকাই হইতেছে মুহাব্বতের বড় দরজা।

হজরত (দঃ) এক কওমের লোকদিগকে ঈমানের মাপকাঠি কি জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা জওয়াব দিলেন যে, "আল্লাহর প্রদত্ত মসিবতে ছবর করি, তাহার নেয়া'মতের শোকর আদায় করি এবং তাহার হুকুমের সম্মুখে মস্তক নত করি।" হজরত (দঃ) বলিলেন, "ইহারা আলেম। ইহাদের মর্যাদা পয়গাম্বরদের তুল্য।" হজরত (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"আমার উম্মতের এক শ্রেণী এমন হইবে যে, কেয়ামতে তাহাদের ডানা হইবে, তাহারা বেহেশতের দিকে উড়িয়া চলিবে। ফেরেশতারা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা হিসাব নিকাশ দেওয়া ব্যতীতই বেহেশতে দাখিল হইতেছ? এই মর্যাদা তোমরা কিরূপে লাভ করিয়াছ? তাহারা বলিবে, দুইটি নেকীর পরিবর্তে। এক হইল নিজেও খোদাকে হাজির নাজির জানিয়া গুনাহ হইতে পরহেজ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ যাহা কিছু রেজেক দান করিতেন উহারই শোকর আদায় করিতাম।

হজরত মুসা (আঃ) এর নিকট উম্মতেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি কি ভাবে অর্জন করা যায়? তাহার প্রতি ওহী নাজিল হইল যে, আমার হুকুমের সম্মুখে মাথা নত করা দ্বারা।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন :—"আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন, আমিই একমাত্র খোদা। আমি ব্যতীত আর কেহই মা,বুদ নাই। যদি আমার দেওয়া মসিবতে ছবর করিতে না পার তবে খোদা তালাশ কর।' হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ বলিতেন, "আমার জন্য আল্লাহ যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন আমি উহাতেই রাজী" কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি চান?' তিনি বলিলেন—"আল্লাহ আমার জন্য যাহা হুকুম করিয়াছেন, আমি উহাতেই রাজী। একজন আবেদ ব্যক্তি দীর্ঘ দিন যাবত আল্লাহর এবাদত বান্দগীতে লিপ্ত ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—অমুক স্ত্রী লোকটি বেহেশতে তোমার সংগিনী হইবে। আবেদ খোঁজ নিয়া জানিতে পারিলেন যে, সে নফল রোজাও রাখে না, তাহাজ্জুদ নামাজও পড়ে না। তবে আল্লাহর ফরজগুলি যথারিতী আদায় করে। তাহার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, —রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে আরোগ্য লাভের জন্য দোওয়া করি না। যদি রৌদ্রে থাকি তখন ছায়ার প্রত্যাশা করি না এবং ছায়ায় থাকিলে রৌদ্রের প্রত্যাশাও করি না। আবেদ ইহা শুনিয়া বলিলেন—"ইহা সামান্য কথা নহে। ইহা অতি উচ্চ চরিত্রের পরিচয়।'

রেজায়ে এলাহীর হাকিকত

মুহাব্বত প্রবল এবং খাঁটি হইলে অন্য কিছু সেখানে দাঁড়াইতে পারে না। মুহাব্বতই প্রধান্য লাভ করে। উহার কারণ দুইটি

এক তো মুহাব্বত প্রবল হইলে উহাতে মানুষ আপনা হইতেই বিভোর হইয়া যায়। যেমন কোন লোক নিজ শত্রুর সহিত প্রবল যুদ্ধের সময় নিজ শরীরে জখম লাগিলেও উহার প্রতি লক্ষ্য করে না। এইরূপ জঙ্গলে শিকার বা কোন প্রার্থিত দ্রব্য অনুসন্ধানের বেলায় পায়ে কাটা বিদ্ধ হইলেও উহাতে কষ্ট অনুভব করে না। এমনকি, ক্ষুধা তৃষ্ণায় ভুলিয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দুন্ইয়ায় সাধারণ ব্যাপারে যখন এই সব সম্ভব তখন আল্লাহর মুহাব্বতের দরজা কি হইতে পারে ?

দ্বিতীয় কারণ হইতেছে এই যে, লোকের ব্যথা ও জখমের বেলায় কষ্ট অনুভব হয়, কিন্তু নিজ মাহবুবের খাতিরে উহা সহ্য করিয়া লয়—এমন, কি উহু পর্যন্ত করে না বরং মাহবুব যদি রক্ত ও চায় তবে তাহাও দিতে রাজী হয়।

ইহার উদ্দেশ্য হইল প্রিয়জনের খুশী অর্জন করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি যে চায় এবং সেই মর্তবায় যে পৌছে সেও যে কোন কোরবানীর পরিবর্তে আল্লাহর রেযামন্দী তলব করে, এবং দুনইয়ার যে কোন কষ্ট ও মসিবতে অম্লান বদনে রাজী থাকে। এবং আল্লাহর হুকুমগুলি নিখুঁত ভাবে পালন করে।

দুন্ইয়ার ধন দৌলত উপার্জন করার উদ্দেশ্যেও সেইরূপ নানা বিপদ ও কষ্ট মসিবৎ সহ্য করিয়া সাগর মরুভূমি পাড়ি দিয়া থাকে।

যাহারা আল্লাহর কাজে সর্বাবস্থায় রাজী দুন্ইয়াতে আল্লাহর এমন বান্দা বিরল নহে। একবার হজরত মুসেলী (রঃ) এর স্ত্রীর আংগুলীর একটি নখ উপড়িয়া গিয়াছিল। তিনি এই অসহ্য

যন্ত্রনার মধ্যে থাকিতে লাগিলেন। মুসেলী জিজ্ঞাসা করিলেন— যন্ত্রণা বোধ হইতেছে না? তিনি বলিলেন—"এই কষ্টের তুলনায় ইহার পুরষ্কারের খুশী অনেক বেশী।"

হজরত সহল তশ্‌তরী (রহঃ)এর শরীরে একবার বেদনা হইল, লোকে চিকিৎসার কথা বলিল। তিনি বলিলেন—"দোস্তের দেওয়া জিনিসে কোন কষ্ট অনুভব হয় না।

হজরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) হজরত সরী সখতী (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আল্লাহর প্রেমিক ব্যক্তি কখনও মসিবতে অস্থির হয়?" তিনি বলিলেন—"না তা হয় না। তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—যদি তরবারী দ্বারা সত্তরটি আঘাত করা হয়? তিনি বলিলেন—উহাতেও সে অধীর হইবে না।

হজরত বশর হাফী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে—বাগদাদে এক ব্যক্তিকে এক হাজার লাঠির আঘাত করা হইল; কিন্তু লোকটি একটুও কাতরতা প্রকাশ করিল না। আমি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—আমার মাহবুব সম্মুখেই ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি তোমার মাহবুবের আসল রূপ দর্শন করিতে তবে কি করিতে? লোকটি শোনা মাত্র একটি চীৎকার দিল এবং সেই সংগে তাহার রুহ বাহির হইয়া গেল।

হজরত বশর হাফী (রহঃ) কর্তৃক আরও একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। তিনি বলেন—"প্রথম জীবনে আমি একবার আবাদানের পথে রওয়ানা হইয়াছি। পথে এক কুষ্ঠ রোগী পাগলের সাথে দেখা হইল। তাহার দেহের গোশতে কীট পড়িয়াছিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে দয়ার উদয় হইল। আমি তাহার মাথাটি তুলিয়া হাঁটুর উপর রাখিলাম। সেই কুষ্ঠ রোগী ইহাতে রাগান্বিত হইয়া বলিল—কে আমার এবং আমার মাহবুবের মধ্যে অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে ?"

কোরআন শরীফে সূরায়ে ইউনুসে আছে—হজরত ইউসুফ (আ:)কে দেখিয়া মিশরীয় রমণীগণ এতাদৃশ্য আত্মহারা হইয়াছিল যে, তাহারা নিজ নিজ অংগুলী কাটিয়া ফেলিয়াছিল। মিশরে দুর্ভিক্ষ পড়িলে লোকে দলে দলে হজরত ইউসুফকে দেখিতে আসিত। ইহাতে লোকে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইত।

সুতরাং চিন্তা করিবার বিষয় এই যে, যখন আম্বিয়া এবং আওলিয়াগণের নূর এতদূর উজ্জ্বল হইতে পারে, তখন খোদার নূরের ছটায় যদি কেহ আত্ম বিস্মৃত হইয়া যায় তবে দুনইয়ার লোক তখন কেন তাজ্জব করে।

একটি ঘটনা :—এক ব্যক্তি জঙ্গলে বাস করিত। সে সব কাজে খোদার প্রতি রেজামন্দী প্রকাশ করিত। সে বলিত :—আল্লাহর তরফ হইতে যাহা কিছু ঘটে ভালাইর জন্যই ঘটিয়া থাকে। তার ছিল একটি কুকুর এবং ঘুম হইতে জাগাইবার একটি মোরগ আর সাংসারিক কাজের জন্য একটি গাধা। এক দিন বাঘ আসিয়া গাধাটিকে মারিয়া খাইল। সে ব্যক্তি কোন প্রকারে দুঃখিত না হইয়া খোদার শোকর আদায় করিল। পরে আর একদিন কুকুর মোরগটিকে মারিয়া ফেলিল। সে ব্যক্তি অম্লান বদনে খোদার শোকরিয়া আদায় করিল। একদিন কুকুরটিও

রোগাক্রান্ত হইল এবং মরিয়া গেল। লোকটি এবারও খোদার শোকর আদায় করিল। লোকটির স্ত্রী-পুত্রেরা বলিল 'হায়'! আমাদের রুজী রোজগারের উসিলাগুলি সব শেষ হইয়া গেল, আমরা প্রত্যেক বারই খোদার শোকর আদায় করিলাম। লোকে আমাদিগকে মন্দ বলিল। উহার পর একরাত্রিতে প্রতিবেশীর লোকগুলি ডাকাতের হাতে মারা পড়িল এবং তাহাদের ধন-দৌলত লুট হইল। কিন্তু ইহাদের কুকুর, মোরগগুলি না থাকাতে তাহাদের ঘরে কোন সাড়া শব্দ হইল না এবং ডাকাতেরাও এদিকে লক্ষ্য করিল না। তাহারা ডাকাতের হামলা হইতে বাঁচিয়া গেল। আবেদ ব্যক্তি বলিল—যেহেতু আমরা আল্লাহর কাজে রাজী ছিলাম। এই জন্য আল্লাহ আমাদের ভালাই করিলেন।

হজরত ঈসা (আঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন। তাহার দেহ অবশ হইয়া গিয়াছে এবং চক্ষু অন্ধ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। অথচ সে আল্লাহর শোকর আদায় করিতেছে এবং বলিতেছে "হে পরওয়ারদেগার। তোমার নেয়ামতের শোকর আদায় করিতেছি।" হজরত ঈসা (আঃ) বলিলেন—তুমি কোন নেয়ামতের শোকর করিতেছ? লোকটি বলিল—"আল্লাহকে সে চিনিতে পারিয়াছি, ইহাই বড় নেয়ামত।" হজরত ঈসা (আঃ) তাহার কাছে বসিলেন এবং তাহার অংগে হাত বুলাইলেন। লোকটি সুস্থ হইয়া আরও গভীর ভাবে এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত হইলেন।

হজরত শিব্‌লী (রহঃ) আল্লাহর প্রেমে এতদুর আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, লোকে তাহাকে পাগল মনে করিয়া

পাগলা গারদে আবদ্ধ করিল। একদিন তাহার দোস্ত এগানার কিছু লোক তাহাকে দেখিতে গেলে তিনি তাহাদিগকে পাথর উঠাইয়া মারিলেন এবং বলিলেন "তোমরা আমার বন্ধু হইলে অবশ্যই ছবর করিবে।"

কাজায়ে এলাহীর প্রতি ভিন্ন ধারণা

আল্লাহর কাজার প্রতি রাজী থাকা সম্পর্কে এক শ্রেণীর লোকের ভিন্ন ধারনা রহিয়াছে। তাহাদের ধারণা এই যে, যাহা কিছু আছে এবং চলিতেছে উহা নিয়াই সন্তুষ্ট থাকা ও উহার ভাল মন্দে কোনরূপ বাদ প্রতিবাদ না করা। এমনকি, যদি চারিদিক গুনাহে ভরপুর দেখিতে পায় উহাতে কোন প্রকার উদ্বিগ্ন না হওয়া। তাহাদের ধারণা উহাও আল্লাহর মরজী মোতাবেক ঘটিতেছে। অথবা কোথাও ওবা অর্থাৎ মহামারী বিস্তার লাভ করিলে উহাতেও ভীত না হওয়া, কেননা, উহা করা তাহাদের মতে কাজায়ে এলাহীর বিরুদ্ধাচারণ করা।

উপরোক্ত ধারণা সম্পর্কে ভিন্ন মত ও রহিয়াছে। কেননা, হজরত (দঃ) নিজে দোওয়া করিতেন এবং অন্যকেও দোওয়ার জন্য তরগীব দিতেন। কেননা, দোওয়া এবাদতের বুনিয়াদকে মজবুত করে। দোওয়ার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিনয়ভাব ও নম্রতা সৃষ্টি হয়। দোওয়া প্রার্থনা নেক-চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। লোক যেমন ক্ষুধায় রুটী এবং পিপাসায় পানি তালাশ করে তেমনি বিপদও

মসিবত হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা রেজায়ে এলাহীর খেলাফ নহে। এবং গুনাহের কাজ দেখিয়া কিছু না বলা এবং চুপ থাকাও একটি গুনাহ। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ দেখিয়া খামুশ থাকে, সে ব্যক্তি ঐ গুনাহেরই শরীকদার। তিনি আরও ইরশাদ করিয়াছেন, কোন লোক দুনইয়ার এক প্রান্তে অন্যায় ভাবে কতল হইলে, দুনইয়ার অন্য প্রান্তে কোন লোক উহা শুনিয়া রাজী থাকিলে সেও সেই হত্যাকার্যে শামিল বলিয়া গণ্য হইবে।

তবে ইহাও প্রমাণিত আছে যে, যেখানে গুনাহ অত্যধিক ছড়াইয়া পড়ে, সেখান হইতে দুরে থাকাই শ্রেয়।

কালাম পাকে একটি আয়াতে প্রমানিত আছে :—

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا •

অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার। আমাদিগকে এই জালেমের দেশ হইতে উদ্ধার কর।"

বুজুর্গানে দ্বীনের নীতি দেখা যায়, তাহারা এই সকল স্থান হইতে দূরে সড়িয়া থাকিতেন। কেননা, ঐ সকল স্থানে আল্লাহর গজব অবতীর্ণ দেখা দেয় সে স্থান পরিত্যাগ করাও দোষের নহে। কিন্তু কোন স্থানে মহামারী ছড়াইয়া পড়িলে সে স্থান ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নহে, কেননা, উহাতে রোগ পরিচর্যার লোকের অভাব হইয়া পড়ে। তবে সব বিপদ ও মসিবতের সময় একই হুকুম নয়। অবস্থা

দৃষ্টে ভিন্ন ভিন্ন হুকুম হইবে এবং সর্বাবস্থায় কাজায়ে ইলাহীর প্রতি মাথানত করিয়া দিবে। মানুষের মুক্তি ইহাতে নিহিত।

মৃত্যুর ইয়াদ

মৃত্যু জীবনের শেষ পরিণাম। জীবনের সব লীলাখেলা, আশা-আকাঙ্ক্ষা মৃত্যুর দ্বারা শেষ হইয়া যাইবে। এই মৃত্যু জীবনের সাথে সাথে ছায়ার ন্যায় ফিরিতেছে। ইহা এমনই এক সত্য যে, ইহা হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। অথচ এমন এক চরম ঘটনাকে মানুষ বিস্মৃত হইয়া থাকে। কারণ মানুষ জীবনের আশা আকাংখা ও স্বপ্নে এতই বিভোর ও আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়ে যে, মৃত্যুর ন্যায় এমন ভয়াবহ, এমন নির্মম ঘটনাকে সব মানুষ ভুলিয়া থাকে। অথচ মুসলমান মাত্রকেই একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মৃত্যুর পরেই তাহাকে মুনকার-নকীরের সওয়ালের জওয়াব দিতে হইবে। আমলনামা গ্রহণ করিতে হইবে, দুন্‌ইয়ার ধন-সম্পদ, বন্ধু বান্ধব, মাল-আসবাব, ঘর-দরজা, সব কিছু হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। মৃত্যুর সাথে সাথেই আরেক জীবন শুরু হইবে, সে জীবন কখনও শেষ হইবে না। দুন্‌ইয়ার জীবনের সব কাজ-কর্মের প্রতিফল সেখানে ভোগ করিতে হইবে। যদি দুন্‌ইয়ার জীবনে আল্লাহকে ইয়াদ করিয়া থাকে এবং আল্লাহর হুকুম আহকাম প্রতিপালন করিয়া থাকে তবেই আখেরাতের জীবনে

নাজাত এবং সুখ-শান্তি লাভ হইতে পারে। আর যদি দুন্‌ইয়ার জেন্দেগী হেলা-খেলায়, অসহযোগিতায় এবং না-ফরমানীতে কাটিয়া থাকে তবে আখেরাতে নাজাত লাভ কঠিন হইবে; যদি আল্লাহ মাফ না করেন। এই সকল চিন্তা করিয়া মৃত্যুকে স্মরণ রাখিতে হইবে। মৃত্যুর স্মরণই মানুষকে গুনাহের পথ হইতে রক্ষা করে। কেননা, মৃত্যুর স্মরণের সাথে আখেরাতের সম্বন্ধ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে স্মরণ রাখিতে পারে সে গুনাহ হইতে বাঁচিতে পারে।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—সেই ব্যক্তি জ্ঞানী, যে নিজের মনকে সংযত করিয়াছে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য আমল সঞ্চয় করিতেছেন। মৃত্যুকে যতই স্মরণ রাখিবে ততই নেক আমল করিবার বাসনা হইবে। এইরূপ কবরকে আরামের বাগিচা রূপে দেখিতে পাইবে। যে ব্যক্তি মৃত্যু হইতে পলাইয়া থাকিতে চায় এবং দুন্‌ইয়া নিয়া সর্বদা মশগুল থাকে, সে কবরকে এক অন্ধকার গর্ত ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারে না। এইজন্য মৃত্যুকে ইয়াদ করা এক অতি ফজিলতের কারণ। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, "তোমরা সর্বসুখ-হারী মৃত্যুকে স্মরণ কর।"

বুজুর্গানে দ্বীনের মৃত্যুর স্মরণ

হজরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "আমি একদিন হজরত (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম—শহীদের মর্যাদা কে

লাভ করিবে? হজরত (দঃ) ইরশাদ করিলেন—যে প্রত্যহ বিশ বার মৃত্যুকে স্মরণ করিবে সেই এই মর্য' দা লাভ করিবে।"

হজরত (দঃ) একদল লোককে অট্টহাস্য করিতে শুনিয়া বলিলেন— "তোমরা এমন কিছু স্মরণ কর যাহাতে তোমাদের এই আনন্দ চিন্তায় পরিণত হয়।" তাহারা বলিলেন—"উহা কিসের জিকির?" হজরত (দ) বলিলেন, "উহা মত্যু।"

হজরত (দঃ) একবার ইরশাদ করিলেন—লোকের জন্য বড় উপদেশ দানকারী হইতেছে মৃত্যু।

কোন একজন স্ত্রীলোক আসিয়া হজরত আয়েশা (রাঃ) কে বলিলেন—"আমার মন বড় কঠিন।" তিনি তাহাকে উপদেশ দিলেন মৃত্যুর স্মরণ কর। মন নরম হইবে। স্ত্রীলোক উহাই করিল এবং কিছুদিন পর পুনরায় আসিয়া জানাইল যে, সত্যই তাহার মনের কাঠিন্য দূর হইয়াছে। সুতরাং স্ত্রীলোকটি খোদার শোকরিয়া আদায় করিল।

হজরত রবি' বিন খাসীম (রাঃ) নিজের ঘরে একটি কবর খুঁড়িয়া রাখিয়াছিলেন। দিনের মধ্যে কয়েকবার গিয়া সেই কবরে গড়াগড়ি দিতেন যেন কখনও মৃত্যুকে ভুলিয়া না যান। তিনি বলিলেন, এক মুহূর্তের জন্যও মৃত্যুকে ভুলিয়া গেলে উহা আমার জন্য গোমরাহী মরণ হইবে।

হজরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আজীজ এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর স্মরণ করিতে উপদেশ দিলেন। বলিলেন, উহাতে দুইটি ফায়দা রহিরাছে। একটি হইল—যদি বিপদ মছিবতের মধ্যে মৃত্যুকে

স্মরণ করে তবে উহাতে কিছুটা শান্তি লাভ হইবে—কেননা, মৃত্যুর মোকাবিলায় সব মছিবতই সামান্য মনে হইবে। আর যদি সুখ-শান্তির মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণ করে তবে শান্তির ঘোর অনেকটা কাটিয়া যাইবে এবং আখেরাতে ইয়াদ হইবে।

আবু সোলাইমান দারানী উম্মে হারুনের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি মৃত্যুকে পসন্দ কর? তিনি বলিলেন, না। আবু সুলাইমান জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? তিনি বলিলেন, কোন মানুষের নিকট অন্যায় করিয়া তাহার নিকট যাইতে লজ্জা বোধ হয়, সুতরাং আল্লাহর সাথে গুনাহ করিয়া তাহার সম্মুখে যাওয়া পসন্দ করিব কি প্রকারে?

মৃত্যুকে ইয়াদ করার উপায়

তিনভাবে মৃত্যুকে ইয়াদ করা যাইতে পারে। (১) দুন্ইয়ার ধন-দৌলত ও জীবনের সুখ শান্তি একদিন পরিত্যাগ করিতে হইবে। মৃত্যু নিকটেই বসা রহিয়াছে। একদিন এই সব ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, ইহা মনে স্থান দিতে দিতে মৃত্যুর চিন্তায় অভ্যাস জন্মিবে। (২) দ্বিতীয় গুনাহ হইতে বারংবার তওবা ইস্তেগফার করিবে, এবং যাহারা তাহার পূর্বে মরিয়া গিয়াছে—তাহাদের কথা স্মরণ করিবে, (৩) তৃতীয়—আল্লাহর প্রিয় বান্দা যাহারা দুনইয়াতে ছিলেন। তাহাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিবে। তাহারা

আল্লাহর দীদারের আশা করিতেন। তাহারও আল্লাহর দীদার নসীব হইতে পারে। সুতরাং মৃত্যুকে ভয় না করিয়া উহাকে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন। যাহারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর উচ্চস্তরের ওলী তাহারা মৃত্যুর জন্য শঙ্কিত নহে এবং উহার স্মরণও তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করে না। তাহারা দীর্ঘ জীবনের জন্যও লালায়িত নহে এবং শীঘ্র মৃত্যুও কামনা করেন না। বরং আল্লাহর যাহা মর্জী তাহাই ঘটুক ইহাই কামনা করিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট জীবন ও মৃত্যু বরাবর হইয়া থাকে। ইহারা দুন্‌ইয়াতেই আল্লাহর মোশাহেদায় বিভোর থাকেন। সুতরাং তাহাদের সঙ্গে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে খুব পার্থক্য নাই। তাহারা মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যু বরণ করিয়া থাকেন।

মৃত্যুর ভীতি অন্তরে স্থান লাভ করা

দুন্‌ইয়া মানুষকে এমনভাবে গ্রাস করে যে, মৃত্যুর কথা কখনও কখনও স্মরণ হইলেও উহা অন্তরে কোন দাগ কাটে না এবং ভয়ের সঞ্চার হয় না। ইহা খুবই বিপদের কথা। কেননা, মৃত্যু ভয়ই হইতেছে আখেরাতের জন্য সজাগকারী। সেই ভয় অন্তরে স্থান না পাইলে আখেরাতের কথাও ইয়াদ থাকে না। সুতরাং এই ধরণের লোক এবাদত বন্দেগী অল্প বিস্তর যাহাই করুক না কেন, উহাতে তাহাদের মন বসে না। কোন রকম দায়ে সাড়া

গোছের এবাদত করিয়া মনকে বুঝ দেয় অথবা লোক সমাজে মুখ রক্ষা করে। ইহাতে বস্তুতঃ কোন ফলোদয় হয় না। সুতরাং যতক্ষণ মৃত্যু চিন্তাকে অন্তরে ভালভাবে স্থান দেওয়া যাইতেছে ততক্ষণ আখেরাতের চিন্তা তাহার অন্তরে বদ্ধমুল হইবে না এবং এবাদত বন্দেগীতেও পুরোপুরি মন বসিবে না।

সুতরাং মৃত্যু চিন্তা অন্তরে বদ্ধমুল করিবার জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করিবে :—

(১) নির্জ্জনতা অবলম্বন করিবে। নির্জনে এবাদত বন্দেগী করিবে। মাঝে মাঝে এরূপ ধারণা করিবে যে, "আজই আমার মৃত্যু হইতে পারে। সুতরাং হে দেল! যদি এক অন্ধকার কোঠায় তোমাকে নিক্ষেপ করা হয়, তখন কি অবস্থা হইবে? হয়তো বা কোন কুয়া বা পাথুরে চটান হইবে কে জানে? ভয়ে তখন কি অবস্থা দাঁড়াইবে? এই ধরনের চিন্তা ভাবনা দ্বারা মনকে মৃত্যু চিন্তায় অভ্যস্থ করিবে।

অন্য পন্থা—যে সকল লোক দুন্‌ইয়াতে মহা প্রতাপে জীবন যাপন করিত। যাহাদের সংগে অগণিত লোক চলাফেরা করিত। কত আরাম আয়েশের সমান তাহাদের ছিল। কত না সুখ শান্তির আয়োজন তাহারা করিয়াছিল।

———

হাদীস শরীফের নসিহত

হজরত (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন—

১। আল্লাহর কাজায় রাজী থাক, ২। হারাম কাজ হইতে বাঁচিয়া থাক, ৩। সবচেয়ে বেশী আবেদ হও ৪। প্রতিবেশীর উপকার কর ৫। যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর অন্যের জন্যও তাহাই পসন্দ কর তবেই মুসলমান হইতে পারিবে। ৬। বেশী হাসিওনা অধিক হাসিলে অন্তর মৃত হইয়া পড়ে।

২। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন:—সকল সুখ হরণকারীকে স্মরণ কর অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ করা দুন্ইয়ার সব সুখ ও স্বাদ মিটাইয়া দেয়।

৩। হজরত ওসমান (রাঃ) যখন কবরের নিকট দাঁড়াইলেন তখন তিনি খুব বেশী কাঁদিলেন। কেহ বলিল—"আপনি বেহশত বা দোজখের স্মরণে এত কাঁদেন না যত কবরের নিকট দাঁড়াইয়া কাঁদেন। তিনি বলিলেন—"হজরত (দঃ) বলিয়াছেন কবর আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল অন্যান্য মঞ্জিলগুলি ইহার পরে যদি কেহ কবরে নাজাত লাভ করে তবে অন্যান্য মঞ্জিলগুলি তাহার পক্ষে সহজ হইবে। আর যদি কবরে যে নাজাত না পাইবে অন্যান্য মঞ্জিলগুলি তাহার জন্য কঠিন হইবে। হজরত (দঃ) আরোও বলিয়াছেন কবরের মঞ্জিলই সবচেয়ে ভয়াবহ।

৪। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে আল্লাহর দীদার কামেল কারে আল্লাহ ও তাহার দীদার কামেল করেন। আল্লাহর দীদার হইতে যে বিমুখ আল্লাহ ও তাহার প্রতি বিমুখ।

৫। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, হে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা ছফীয়া হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা। তোমরা যদি আল্লাহর না ফরমানী কর তবে তোমাদের দায়ীত্ব নিবার কত আল্লাহর নিকট আমার কোন এখতিয়ার নাই। তোমরা আমার মাল-মাত্তা যাহা খুশী নিতে পার।

৬। হজরত (দঃ) বলেন :—"আমি যাহা দেখিতেছি তোমরা তাহা দেখিতে পাও না। আমি যাহা শুনিতেছি যদি তোমরা শুনিতে আসমানে এখন চারি অঙ্গুলিস্থান খালি নাই যেখানে ফেরেশতা সাজদায় পতিত না আছে। আল্লাহর কসম আমি যাহা জানি যদি তোমরা উহা জানিতে তবে খুব কমই হাসিতে এবং বেশী কাঁদিতে। এবং স্ত্রীর বিছানায় কোন সুখ অনুভব করিতে না, তোমরা গৃহ ছাড়িয়া জংগলে পলায়ন করিতে এবং আল্লাহর নিকট তোমরা জারজার হইয়া কাঁদিতে, হায়! আমি যদি মানুষ না হইয়া একটি গাছ হইতাম এবং কেহ একদিন কাটিয়া ফেলিত।

হাসাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলা ঃ

৭। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন :—লোকে না জানিয়া এমন কথা বলে যাহার জন্য তাহাকে সত্তর বৎসর দোজখে ভুগিতে হইবে।

৮। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—তাহার জন্য বরবাদী যে লোক হাসাইবার জন্য কথা বলে এবং উহাতে মিথ্যা বলে তাহার জন্য ধ্বংশ ও বরবাদী।

৯। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—অনাবশ্যক এবং অমূলক বিষয় হইতে দূরে থাকা। ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্যে গণ্য।

দুন্ইয়া ঘৃণিত :

১০। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, এই দুন্ইয়া ঘৃণিত। আর ইহার মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই ঘৃণিত তবে আল্লাহর জেকর এবং যাহাকে আল্লাহর পসন্দ করেন এবং কোন আলেম এবং এলেম শিক্ষার্থী ব্যতীত।

১১। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, আখেরাতের তুলনায় দুন্ইয়া কিছুই নহে, তুমি যদি সমুদ্রে অঙ্গুলি ডুবাইয়া উঠাও তবে তোমার অঙ্গুলিতে কি থাকে? কিছুই না আখেরাতের তুলনায় দুন্ইয়াও তেমনি।

১২। এই দুন্ইয়া মুসলমানদের জন্য বন্দীখানা এবং কাফেরদের জন্য জান্নাত।

১৩। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা তিনটি কথা স্মরণ রাখ—(১) সদকা খয়রাতে কাহারও মাল কমে না (২) মজলুম ব্যক্তি যদি সবর করে তবে আল্লাহ তাহার সম্মান বাড়াইয়া দিবেন। (৩) যে পরের নিকট হাত পাতিবে আল্লাহ তাহার জন্য পরমুখাপেক্ষিতার দরজা খুলিয়া দিবেন।

১৪। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, কেহ অভাব গ্রস্ত এবং দারিদ্র হইয়া পড়িলে উহা যদি সে লোকের ঘরে পৌঁছাইয়া

দেয় অর্থাৎ উহা লোকের নিকট ব্যক্ত করে তবে তাহার অভাব কখনও মোচন হইবে না।

১৫। এক ব্যক্তি হজরত (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সবচেয়ে উত্তম লোককেই হজরত (দঃ) বলিয়াছেন যে দীর্ঘ জীবি এবং যাহার নেক আমল অধিক। লোকটি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে—"হে রসূলুল্লাহ সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক কে? হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—"যাহার আয়ু দীর্ঘ এবং সারা জীবন অসৎ কাজে ভরা।

১৬। ইবনে ওমর হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (দঃ) আমার শরীরে হাত রাখিয়া বলিলেন, দুন্‌ইয়াতে এমন ভাবে বাস কর যেন তুমি একজন মুসাফির যেমন তুমি কোন পথে চলিয়াছ, এবং নিজকে মৃতদের শামিল গণ্য কর যখন সকালে ঘুম হইতে উঠ তখন সন্ধ্যার আশা করিওনা যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচিয়া থাক তবে ভোরের কথা চিন্তা করিও না। রুগ্ন হইবার পুর্বে স্বাস্থ্যের দ্বারা যতটা সম্ভব কাজ নেও আমার মৃত্যু আসার পুর্বে যথা সম্ভব জীবনের দ্বারা কিছু কাজ নেও। হে আবদুল্লাহ! আগামীদিন তোমারি নাম কি হইবে (জীবিত কি মৃত তাহা জানা নাই।

১৭। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক উম্মতের জন্যই বিপদ ছিল আমার উম্মতের বিপদ হইল মাল দৌলত।

১৮। হজরত আনাস হইতে বর্ণিত আছে—হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, লোকের নিকট যদি স্বর্ণের একটা খাঁটি থাকে তবে

সে আরও একটি ঘাটি চাহিবে। তাহার মুখকে কেবল মাটিই পূর্ণ করিতে পারিবে আর কিছু নহে, আর যে তওবা করে আল্লাহ তাহার তওবা কবুল করেন।

১৯। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষ যখন বৃদ্ধ হয় তখন তাহার মধ্যে দুইটি আশা প্রবল হয়, একটি হইল দীর্ঘ জীবনের আশা আর একটি হইল মাল দৌলতের আশা।

তর্কে দুন্ইয়ার অর্থঃ •

২০। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, দুন্ইয়ার প্রতি অনাশক্তি কেবল উহার নাম নহে যে, হালাল জিনিসকে হারাম করা বা মাল দৌলৎ ধ্বংস করা বরং দুন্ইয়া তরকের অর্থ— হইতেছে নিজের মালের প্রতি ভরসা না করিয়া আল্লাহর প্রতি ভরসা অধিক করা এবং কোন মসিবত আসিলে সেই মসিবতের সওয়াবের জন্য আগ্রাহান্বিত হওয়া এবং সেই মুসিবত স্থায়ী হওয়ার কামনা করা।

২১। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষের থাকার ঘর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, খাওয়ার জন্য বিনা তরকারীর রুটী আর পানি ব্যতীত আর কোন জিনিসের দাবী নাই।

২২। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঠিক ভাবে তাওয়াক্কুল করিতে যেমন করা চাই তবে অবশ্যই তোমাদিগকে রুজী দেওয়া হইত। যেমন পাখি সকালে খালি পেট বাহির হয় আল্লাহর সন্ধ্যা বেলা পেট ভরিয়া বাসায় ফিরে।

২৩। হজরত (দঃ) বলেন, সব দোস্তের মধ্যে আমার সেই দোস্তের প্রতি ইর্ষা হয়। যাহার পেট হাল্কা (অর্থাৎ মাল দৌলতের বোঝাকম) নামাজের ভাগী, সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে আল্লাহর ইবাদত সম্পন্নকারী, চুপে চুপে আল্লাহর আনুগত রত লোকের মধ্যে ছোট ও বিনয়ী হইয়া থাকে, প্রকৃতিতে একান্ত নীরিহ, তাহার দিকে বিশিষ্টতার কারণে কেহ অঙ্গুলি নির্দেশ না করে, পরিমিত রুজী, কাহারও নিকট মুখাপেক্ষী নহে।

২৪। হজরত (দঃ) বলিলেন—"আমার পরওয়ারদেগার আমার জন্য মক্কার পাথুরে জমীনকে সোনায় পরিণত করিয়া দিতে চাহিলেন—"আমি বলিলাম—"হে পরওয়ারদেগার! আমি তাহা চাইনা—আমি একদিন খাইব আর একদিন ভুখা থাকিব। অথবা তিন দিন অথবা এইরূপ কোন শব্দ বলিলেন—"যখন ভুখা থাকিব তখন তোমার দরবারে কাকুতি মিনতি করিব, তোমার দিকে নাচার অক্ষম হিসাবে মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব এবং তোমার জিকর করিব। আর যখন খাইব তোমার শোকর ও প্রশংসা করিব।

২৫। হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, যে মুসলমান হইয়াছে এবং যাহাকে আবশ্যক পরিমান রুজী দেওয়া হইয়াছে এবং সবর ও তুষ্টি দান করিয়াছেন সে সফলকাম হইয়াছে।

২৬। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ) এর দরবারে আসিয়া বলিল, —"হে রসূলুল্লাহ। আমি আপনাকে মোহাব্বৎ করি। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ বুঝিয়া শুনিয়া বল"—সে ব্যক্তি বলিল—"হাঁ। রসূলুল্লাহ আমি আপনাকে মোহাব্বৎ

করি।" রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—"যদি তুমি আমাকে মোহাব্বত কর তবে সত্বর গরীবি ও উপবাসের জন্য তৈয়ার হইয়া যাও, কেননা আমার প্রতি যে—মোহাব্বত রাখে গরীবি তাহার নিকট স্রোতের ন্যায় অতি বেগে ধাবিত হয়।

২৭। হজরত (দঃ) বলেন—"দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনী মুহাজির-গণ অপেক্ষা পাঁচশত বৎসর আগে বেহেশ্‌তে দাখিল হইবে।

২৮। হজরত (দঃ) বলিতেন—"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দুনইয়াতে মিস্‌কীন রাখ, মিস্‌কীন হিসাবে দুনইয়া হইতে উঠাও এবং কেয়ামতের দিন মিস্‌কীনদের সাথে যেন উঠি।" হজরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন—"হে রসূলুল্লাহ! আপনি এইরূপ কেন দোওয়া করিতেছেন? হজরত (দঃ) বলিলেন—হে আয়েশা। গরীব ধনী ব্যক্তির চল্লিশ বৎসর পুর্বে বেহেশতে দাখিল হইবে। হে আয়শা। মিস্‌কিনদের খাওয়ান ফিরাইও না যদি আধখানা খিজুরও হয় উহা দিবে। হে আয়শা। মিস্‌কীনগণকে ভালবাস, তাহাদিগকে কাছে ডাক, আল্লাহ কেয়ামতে তোমাকে নিকটে ডাকিবেন।"

২৯। হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ—রসূলুল্লাহ (দঃ) সারা জীবনে একাধারে দুই বেলা যবের রুটী এবং গোশত পেট পুর্ণ করিয়া খান নাই এই ভাবেই তিনি দুনইয়া হইতে বিদায় হইয়াছেন।

৩০। আবু হোরেরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হজরত (দঃ) এর পরিবার বর্গ একাধারে তিনদিন পেট ভরিয়া আটার রুটি ভক্ষণ করেন নাই। এই অবস্থায় রসূলুল্লাহ (দঃ) দুনইয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

৩১। হজরত আনাস (রাঃ) বলেন—"হজরত (দঃ)এর গৃহে পর দিনের জন্য কোন খাদ্য জমা থাকিতনা।

৩২। হজরত আনাস (রাঃ) বলেন—"রসূলুল্লাহ (দঃ) কখনও দস্তর খান বিছাইয়া খানা খান নাই। এবং কখনও পাত্‌লা রুটী খান নাই। এই ভাবে তিনি দুন্‌ইয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

———

আল্লাহর মা'রেফতের রহস্য

হজরত যুন্নন মিস্‌রী বলিয়াছেন :—মারেফতের রহস্য হইতেছে ঐ জিনিস যাহা দ্বারা আল্লাহর লুপ্ত ভেদ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। আল্লাহর কোন কাজই এমন নাই যাহার ভিতরে কোন গভীর রহস্য না আছে। এবং ইহার ফল এই হয় যে, আল্লাহর মারেফত অন্বেষণ কারীর নিকট এই দুন্‌ইয়া একটি শরিষা পরিমানও মূল্য থাকে না। তাহার এক মাত্র উদ্দেশ্য হয় তখন আল্লাহর বন্দেগীর সীমার মধ্যে অবস্থান।

হজরত শিবলী (রহঃ) বলিয়াছেন, মারেফত হইতেছে একটি স্থায়ী ব্যাকুলতা। কেননা, মারেফতের পথে যতই অগ্রসর হইবে ততই আল্লাহর মহিমা এবং শান অনুভূত হইতে থাকিবে ইহাতে নিজকে আল্লাহর দরবারে একান্ত হীন এবং সমুদ্র অনুভব করিতে থাকিবে। তাহার সর্বদা এই আশঙ্কা থাকিবে যে, সে আল্লাহর ইবাদত, বন্দেগী এবং আনুগত্য আরও অধিক কি ভাবে করা যায় এবং

কি ভাবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। ইহাই হইবে মারেফত পন্থীর পেরেশানীর কারণ। হজরত আবু ইয়াযিদ (রহঃ) বলিয়াছেন :—মা'রেফত অর্থ হইতেছে এই জ্ঞান লাভ করা যে, সৃষ্টির সকল গতিবিধি এবং কাজ-কর্ম সকলই আল্লাহর তরফ হইতে। আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কিছুই হইতেছে না। ভালমন্দ যাহা কিছুই ঘটে সকলই আল্লাহর তরফ হইতে। ইহা জানার পরেই আল্লাহর ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি নিজকে সোপর্দ সম্পূর্ণ করার শক্তি জানেন। অতঃপর তাহার মনে কোনও অভিযোগ বা প্রশ্ন আসিবে না। সুতরাং একমনে এক ধ্যানে আল্লাহর হুকুম পালনে রত হইবে।

জনৈক ওলী আল্লাহ বলিয়াছেন :—মারেফত পন্থীর লক্ষন হইল এই যে, সে কথা খুব কম বলিবে এবং সর্বদা ব্যাকুল ও পেরেশান থাকিবে। কেননা কথা বলার শক্তি থাকিলেই কথা বলা যায়। মারেফত পন্থী যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি নিজকে পূর্ণ ভাবে সম্পূর্ণ করিয়া দেন এবং আল্লাহর মোরাকাবা ও ধ্যানে নির্দিষ্ট থাকেন। সুতরাং তাহার কথা বলার অবকাশ থাকে না।

জনৈক আল্লাহর ওলী বলেন, যিনি সত্যিকার ভাবে আল্লাহকে চিনিতে পারিয়াছেন তিনি অন্য সবকিছু হইতে পৃথক হইয়া পড়েন। বোকা হইয়া যান, বিচ্ছিন্ন হইয়া যান। কেননা আল্লাহর অসীম মহিমা এবং মর্যাদা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—"হে খোদা! আপনার প্রসংশা করা আমার সাধ্যের বাহিরে।" সুতরাং একজন লোক যখন

মা'রেফতের পথে অগ্রসর হয়, এবং আল্লাহর অপার মহিমার কুল কিনারা দেখিতে না পায় তখন সে অবাক হইয়া যায়, তাহার ভাষা হারাইয়া যায় যেন সে আল্লাহর মহিমা সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। একজন অলী আল্লাহ বলিয়াছেন, আমি আল্লাহকে জানার পর আমার মধ্যে হক্ ও বাতেলের কোন দ্বন্দ্বই উপস্থিত হয় নাই।" অর্থাৎ তিনি আল্লাহর প্রেমে আল্লাহর খেয়ালে এতই আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, একমাত্র আল্লাহর চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই তাহার অন্তরে ছিল না। অন্য চিন্তায় অন্য কাজে লেস্ত হওয়ার অর্থ হইল এই যে, আল্লাহর মারেফতের অভাব। আল্লাহর মারেফত যাহার হাসিল হয় তাহার কোন চিন্তা বা কোন তর্কের অবকাশই থাকে না। আল্লাহর নৈকট্য এবং মা'রেফতের পথে প্রথম পর্দা এবং অন্তরায় হইল আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা। উহার প্রতিকার হইল আল্লাহর খাঁটি এলেমের জন্য আল্লাহর কেতাব এবং রসূলের হাদীস হইতেছে প্রধান অবলম্বন। উহা ব্যতীত আল্লাহকে চিনার অন্য কোন পথ নাই।

তাসাওয়াফের পরিচয়

হজরত মুহাম্মদ বিন আলী বিন হোসাইন (রাঃ) বলেন—তাসাউফ হইতেছে সৎ-স্বভাবের নাম সৎ-স্বভাবের দিকে লোক যত বেশী অগ্রসর সে তাসাউফের দিকে তত বেশী অগ্রসর।

সৎ স্বভাবের দুই দিক। এক হইল আল্লাহর সহিত সৎ ব্যবহার, দ্বিতীয় আল্লাহর সৃষ্টির সঙ্গে। আল্লাহর সাথে সৎ ধারনার অর্থ এই যে, বান্দা আল্লাহর ইচ্ছায় রাজী থাকিবে। আল্লাহর কোন কাজ ইচ্ছার বিপরীত হইলে কোন অভিযোগ মনে স্থান দিবে না। আল্লাহর যে কোন কাজ বিনা দ্বিধায় সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করিবে। মানুষের সাথে সদ্ব্যবহারের অর্থ হইল, লোকের জন্য যাহা কিছু করিবে উহা একান্ত নিঃস্বার্থ ভাবে আল্লাহর জন্য করিবে উহাতে কোন গরজ বা স্বার্থ যেন না থাকে। জনৈক দরবেশ বলিয়াছেন, তাসাওফ সৎ গুণাবলীর নাম উহা তিন শ্রেণীর।

এক হইল, খোদার সহিত সদ্ব্যবহার। উহার অর্থ হইল আল্লাহর যাবতীয় হুকুম আহকাম পুর্ণ আন্তরিকতার সহিত আদায় করা।

দ্বিতীয় হইল, আল্লাহর সৃষ্ট বান্দাগণের সহিত সদ্ব্যবহার। উহার অর্থ বুজর্গ এবং মুরুব্বীগণকে যথা-বিহিত সম্মান করা, ছোটদের প্রতি রহম ও স্নেহ করা, এবং সমবয়স্কদের সহিত সৌহার্দ বজায় রাখা।

তৃতীয় প্রকার হইল, শয়তান এবং নফসের সহিত যুদ্ধ করা অর্থাৎ কখনও উহার অনুগত না হওয়া।

———

আটটি বশেষ গুণ

তাসাওফের আটটি গুণ রহিয়াছে :—

১। বদান্যতা, দানশীলতা। ২। আল্লাহর কাজে রাজী থাকা। ৩। সবর অর্থাৎ ধৈর্য্য। ৪। ইশারা। ৫। দারিদ্র। ৬। সুফী লেবাস পরিধান করা। ৭। ভ্রমণ। ৮। ফকীরি এখ্‌তিয়ার করা।

সাখাওয়াত অর্থাৎ দানের সেরা দৃষ্টান্ত হজরত ইবরাহীম (আঃ) তিনি নিজের জীবন ও পুত্রের জীবন পর্যন্ত আল্লাহর জন্য দান করিয়া দিয়াছিলেন।

২। রেজা অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তুষ্টির দৃষ্টান্তে হজরত ইসমাইল (আঃ)। তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় নিজের জীবন পর্যন্ত দান করিয়া দিতে রাজী হইয়াছিলেন।

৩। সবরের নমুনা হজরত আয়ুব (আঃ)। তাঁহার সর্বশরীরে যখমে কীট জন্মিয়া যাওয়া স্বত্বেও তিনি তিলেকের জন্য ধৈর্যহারা হন নাই।

৪। ইশারার দৃষ্টান্ত ছিলেন হজরত জাকারিয়া (আঃ)। তিনি আল্লাহর হুকুমে কথা পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এবং কয়েক দিন পর্যন্ত শুধু ইশারায় কথা বলিতেন।

৫। গোরবত বা বন্ধু স্বজন হীনতার দৃষ্টান্ত ছিলেন হজরত ইয়াহিয়া। যিনি নিজ দেশে নিজ আত্মীয়-স্বজন হইতে বিছিন্ন ছিলেন।

৬। সুফী লেবাস পরিধানের নমুনা হজরত মুসা (আঃ)। তিনি পশমের জামা কাঁপড় পরিধান করতেন।

৭। আল্লাহর রাস্তায় সফর ও ভ্রমণের আদর্শ হইলেন, হজরত ঈসা (আ:)। তিনি একটি পেয়ালা এবং একখানা চিরুনী ব্যতীত আর কিছুই সংগে রাখিতেন না। অতঃপর যখন তিনি এক ব্যক্তিকে হাত দ্বারা পানি পান করিতে দেখিলেন, তখন পেয়ালাটি নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। এবং এক ব্যক্তিকে যখন দেখিলেন যে, অঙ্গুলী দ্বারা চুল খেলাল করিতে দেখিলেন, তখন চিরুনী খানা নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

৮। ফকীরের শ্রেষ্ঠ নমুনা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। যাহাকে আল্লাহর সারা জমীনের ধন-সম্পদের কুঞ্জিত দিতে চাহিলেন যে, তিনি মনে শান-শওকতে আরাম আয়েশে জীবন যাপন করিবেন। কিন্তু আল্লাহর নিকট চাহিলেন, একদিন আসুদা খাই-বেন এবং একদিন ভূখা থাকিবেন। তিনি আল্লাহর নিকট এই দোওয়া করিলেন—"হে খোদা! আমাকে ফকীরের হালে জীবিত রাখুন, ফকীরির হালতে মওত দান করুন এবং ফকীরদের সাথে হাশর করুন।"

প্রকৃত সুফীর পরিচয়

'তাসাওফ' ও 'সুফী' মূলে 'সাফা' শব্দ হইতে আসিয়াছে। উহার বিপরীত অর্থ হইল কলুষ, অপবিত্র। সুতরাং সে নিজ চরিত্র এবং কাজ কারবার পরিশুদ্ধ পরিপাটি করিয়াছে এবং কলুষতা ও অপবিত্রতা হইতে শুদ্ধ করিয়া লইয়াছে আর আল্লাহর

খাটি বান্দা রূপে নিজকে গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছে। সেই প্রকৃত স্থফী এবং আছুলে তাসাওফ বলিয়া কথিত হইবার যোগ্য অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত দুন্‌ইয়ার অন্য সব কিছু হইতে দেলমুক্ত করা এবং কলুষ চিন্তা ও কাজ হইতে অন্তর পাক করাই তাসাওফ। চরিত্রের উচ্চতম আদর্শ হজরত (দঃ) এর উম্মতের মধ্যে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের মধ্যে বিরাজমান ছিল।

হজরত আবু বকরের দেল একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু হইতে কিরূপ মুক্ত ও পাক ছিল উহার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্ন ঘটনার মধ্যে। হজরত নবী করীম (দঃ) ইন্তেকাল করিলে সাহাবাগণ সকলেই অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এমনকি, তাহাদের অনেকের বিবেক বুদ্ধি যেন লোপ পাইয়া গেল। এমনকি, হজরত ওমর (রাঃ) তো এতদুর বিচলিত হইয়া ছলেন তিনি খোলা তরবারী নিয়া বলিতে লাগিলেন যে, হজরত (দঃ) ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইহা যে বলিবে তাহার গর্দান উড়াইয়া লওয়া হইবে। এই সময় হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) উপস্থিত হইলেন এবং সাহাবীগণের বে-সামাল অবস্থা দেখিয়া উচ্চ আওয়াজে পাঠ করিলেন, যাহারা মোহাম্মদ (দঃ) এর পুজা করিতে জানিয়া রাখ, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে আর সে মোহাম্মদের খোদার ইবাদত করিতে তিনি অমর, তাহার কখনও মৃত্যু হইবে না। অতঃপর তিনি কোরআনের নিম্ন আয়াত পাঠ করিলেন— মোহাম্মদ রসুল ব্যতীত নন, তাঁহার পুর্বে রসূলগণ গত হইয়াছেন, অতঃপর যদি তিনি মৃত হন অথবা নিহত হন তোমরা কি তবে বিপরীত

ধাবিত হইবে ?" আল্লাহর এই বাণী শুনা মাত্র সকলের চেতনা ফিরিয়া আসিল। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, হজরত আবু বকর সিদ্দীকের অন্তরে আল্লাহর চেতনা কিভাবে সজাগ ও জাগ্রত ছিল। এমনকি, প্রিয়তম রসূলকে হারাইয়াও তিনি শোকে মুহ্যমান হন নাই বরং তাঁহার অন্তরে আল্লাহর প্রভাব পুর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর অন্য একটি ঘটনায়ও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দুনইয়ার মাল-আসবাব ও তাহার বন্ধন হইতে তাঁহার হৃদয় কিরূপ মুক্ত ছিল। তবুকের যুদ্ধের সময় তিনি তাঁহার গৃহে মাল-সামান বলিতে যাহা কিছু ছিল সব নিয়াই রসূলুল্লাহর দরবারে হাজির হইয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিবারবর্গের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ ? তিনি বলিলেন, "আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলকে রাখিয়া আসিয়াছি।" অর্থাৎ আল্লাহর নাম আর রসূলের ইয়াদ ছাড়া গৃহে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, দুনইয়ার মাল-মাত্তা এবং অর্থ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর জন্য অকাতরে বিলাইয়া দিতে পারিতেন। উহার জন্য তিনি অন্তরে বিন্দুমাত্র দুঃখ অনুভব করিতেন না। কেননা আল্লাহর মুহাব্বত এবং প্রভাব তাঁহার অন্তরে সবকিছু হইতে উর্দ্ধে ছিল। ইহাই হইতেছে খাঁটি তাসাওফের পরিচয়।

সূফী যখন কথা বলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে সত্যই প্রকাশিত হয় এবং যখন তিনি চুপ থাকেন তখন তাঁহার শরীরের

প্রতিটি লোম পর্যন্ত সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁহার মধ্যে দুন্‌ইয়ার কোন চেতনা কোন খেয়াল নাই।

সুফীদের শ্রেণী

তাসাওফ্‌ পন্থী সুফীদের তিন শ্রেণী রহিয়াছে।

১। প্রথম প্রকার হইলেন যাহারা নিজদিগকে আল্লাহর মধ্যে বিলীন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন কলুষতা বা দুন্‌ইয়ার সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে না।

২। দ্বিতীয় প্রকারের সুফী হইল যাহারা উচ্চ দরজা অর্জন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও মোজাহেদায় লিপ্ত থাকে না।

৩। তৃতীয় হইল ভণ্ড সুফী। যাহারা দুন্‌ইয়া অর্জন করিবার গরজে সুফী বেশ ধারণ করে, তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ ভাব ভঙ্গী এবং চাল-চলন অবলম্বন করিয়া অজ্ঞ মানুষকে ধোকা দেয়। মূলে বা আসল তাসাওফের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

সত্যিকার যাহারা সুফী তাহাদের দৃষ্টিতে ইহারা মাছির ন্যায় অর্থাৎ নেহায়েত জঘন্য। ইহারা সাধারণ লোকের বেলায় শৃগাল তুল্য ইহারা তাহাদের ঈমান চিড়িয়া কাড়িয়া ভক্ষণ করে।

তাসাওফের জরুরত

তাসাওফ একান্ত জরুরী বিদ্যা হইলেও বর্তমানে উহার বিশেষ অবনতি লক্ষ্য করা যায়। উহা নামে খুব প্রচার হইয়াছে। কিন্তু সত্যিকার তাসাওফ বলিতে আজ আর কিছু অবশিষ্ট নাই। অথচ পূর্বের বুজুর্গানের মধ্যে তাসাওফ, নামে প্রচলিত না থাকিলেও উহা কাজে পূর্ণ মাত্রায় ছিল।

জনৈক বুজুর্গ বলিয়াছেন, আসল দ্বীন হইল ইসলামে ও সরলতার সাথে আল্লাহর হুকুম পালন করা। যদি উহা সঠিকভাবে পাওয়া না যায় তবে তাসাওফ বলিতে কোন জিনিস নাই। আর যদি আল্লাহর তাবেদারী থাকে এবং উহার প্রতি একাগ্রতা ও মোহাব্বৎ থাকে তবে উহাই তাসাওফ ইহার চেয়ে উত্তম তাসাওফ আর কিছুই হইতে পারে না। হজরত আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, তাসাওফ তখন বিশেষ ধরণ ধারণ এবং কোন বিশেষ ইলেমের সনদের নাম নহে। উহা বিশেষ চরিত্রের নাম।

হজরত আবুল হাসান নূরী (রহঃ) বলেন—"প্রবৃত্তির লোভ লালসা হওয়া, বাতেল এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে দাঁড়াইয়া উহার মুকাবেলা করা, ভোগ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কষ্ট না করা, নিজের সম্বল দ্বারা অভাব গ্রস্তের সাহায্য করা, দুনইয়াকে দুনইয়াদারদের ভোগের জন্য পরিত্যাগ করাই হইতেছে খাঁটি তাসাওফ।"

তাসাওফ অর্থ নীতি নিষ্ঠা

হজরত আবু হাফ্স হাদ্দাদ নিশাপুরী (রহঃ) বলেন—"তাসাওফ অর্থ আদব বা নীতি নিষ্ঠা এবং আল্লাহর হুকুমের পা-বন্ধীর নাম। এবং সব সময় সর্বস্থানের এবং সর্বাবস্থায় নির্দিষ্ট নিয়ম ও আল্লাহর হুকুম পালন করাই হইতেছে আদব বা তাসাওফ। যে ইহা পালন করে সে সফলকাম হয় এবং যে উহা পালন না করে সে ব্যর্থ হয়।

সুফীদের পোষাক পরিচ্ছদ

আল খেল্লা জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে সুফীদের মত এই যে, উহা পরিধান করা সুন্নত। এই সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে।

হজরত (দঃ) পশমী পোষাক পরিধান করিতেন এবং গাধায় সওয়ার হইতেন। হজরত (দঃ) হইতে আরও বর্ণিত আছে, তোমরা পশমী পোষাক পরিধান কর। ইহাতে তোমরা দেলে ইমানের মাধুর্য অনুভব করিতে পারিবে।

হজরত (দঃ) বিবি আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে আয়শা! কাপড়ে তালি না লাগান পর্যন্ত উহা পরিত্যাগ করিওনা। হজরত ওমর (রাঃ) এর কাপড়ে প্রায় ত্রিশটি করিয়া তালি দেওয়া থাকিত।

হজরত হাসান বসরী (রাঃ) বদরের যুদ্ধে যোগদান কারী সত্তর জন সাহাবীকে তালিযুক্ত পোষাক পরিধান করিতে দেখিয়াছেন।

হজরত ওয়ায়েস করণী (রহঃ) সম্পর্কে হজরত ওমর, হজরত আলী এবং হকম বিন হাব্বান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহাকে তাঁহারা পশমী লেবাস পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছেন এবং উহাতে তালী ছিল।

হজরত হাসান বস্‌রী (রাঃ) মালেক বিন দীনার, এবং সুফীয়ান সওরী (রাঃ) সকলেই তালিযুক্ত পশমী পোষাক পরিধান করিতেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) প্রথমে জুব্বা পরিধান করিতেন এবং নির্জন বাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। অতঃপর হজরত (দঃ) কে তাঁহাকে স্বপ্ন যোগে বলিলেন, আমার সুন্নৎ প্রচার করার জন্য তোমার প্রকাশ্য লোক সমাজে থাকা উচিত সুতরাং তিনি অবিলম্বে নির্জন বাস পরিত্যাগ করেন। ইহার পরেও তিনি কখনও খুব মুল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন না।

হজরত ইবরাহীম আদ্‌হাম (রঃ) তালিযুক্ত পশমী পোষাক পরিধান করিতেন। ঐরূপ বেশে তিনি এক সময় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। দরবারের লোকগণ তাঁহাকে ঘৃনার দৃষ্টিতে দেখিল। ইমাম সাহেব তাঁহার পরিচয় দিয়া বলিলেন—"ইনি আমাদের সরদার ইবরাহীম আদ্‌হাম। শাগুরেদগণ ইহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বলাবলি করিতে

লাগিলেন, ইমাম সাহেব তো আমাদের সহিত কখন হাসি-ঠাট্টা করেন না। তিনি আমাদের সরদার হওয়ার যোগ্যতা কিভাবে লাভ করিলেন? ইমাম সাহেব তাহাদের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তিনি তো সর্বক্ষণ আল্লাহর বন্দেগীতে রহিয়াছেন আর আমরা আমাদের খেদমতেই নিয়োজিত রহিয়াছি।"

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি ছাড়াও রসূলুল্লাহ (দঃ) এর একটি হাদীস এই লোকের পক্ষে দলীল স্বরূপ গণ্য করা হয়। যেমন হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, মান্ তাশাব্বাহা বে কওমেন ফাহুয়া মিন্‌হুম।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে দলের অনুকরণ করিবে সে সেই দলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। অধিকাংশ বুজুর্গ লোক এবং আল্লাহর খাস্ বান্দাগণ ছেঁড়া কাটা পোশাক পরিধান করিয়া কাটাইতেন। সুতরাং ঐ ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ আল্লাহ নেককার বান্দাগণের অনুকরণ বলিয়া উহা আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ হইতে পারে। তাঁহারা ইহাও বলেন—আমরা আল্লাহর খাস্ বান্দাগণের জাহেরী রূপ ধারণ করিতেছি এবং যতদুর সাধ্য আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করি যেন আমাদের ভিতরও তাহাদের ন্যায় আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়।" তাঁহারা ইহাও বলেন যে, আল্লাহ্ ওয়ালাদের লেবাস পরিধান করার সুফল এই যে, সকলেই তাহাদের নেগাবান এবং সতর্ককারী হয়। অর্থাৎ আল্লাহ ওয়ালাগণের লেবাস পরিধান করার পর যদি কোন অসঙ্গত কাজ করা হয় এবং আল্লাহর হুকুমের খেলাফ কোন কাজ করিলে লোকে নিন্দা করিবে যে, যে আল্লাহ ওয়ালাদের লেবাস পরিধান করিয়া অন্তরে

কাজ করিতেছে। সুতরাং লজ্জা-শরমে ও আমরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিব। আমরা আমাদের নিকট পশমী জুব্বা (গুদড়ী) পরিধান করা এইসব কারণে এখতিয়ার করিয়া থাকি।"

এই সব দলীলি প্রমাণের ভিত্তিতে এই তরিকার পীরগণ নিজেরাও পশমী জুব্বা পরিধান করিতেন এবং তাহাদের মুরীদগণকেও উহা পরিধান করার নির্দেশ দিতেন। উদ্দেশ্য এই যে, লোক তাহাদিগকে আহলুল্লাহ অর্থাৎ খোদা পন্থী বলিয়া মনে করিবে এবং সকলেই তাহাদের রক্ষক হইবে যেন তাহারা আল্লাহর রাস্তা হইতে ভিন্ন রাস্তায় এবং দ্বীনের খেলাফ কাজে রত না নয়।

তবে এই ধরনের পোষাক পরিচ্ছদ যে তরিকত পন্থী বা সুফীদের সকল শ্রেণী অপরিহার্য মনে করেন তাহা নয়। দাতা গঞ্জ বখশ হজরত আলী হুজাইরী বলেন—"তাসাওফ, তরিকত এবং মা'রেফতের রাস্তা কোন নির্দিষ্ট ধরনের পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। উহা মু'মিনের আমল এবং দেলের উৎকর্ষ অপকর্ষের উপর নির্ভর করে। যিনি তরিকতে অভিজ্ঞ এবং পাকা পোখ্‌ত তাহার আমীরানা লেবাসও ফকিরীর মধ্যে গণ্য। আর যে তরিকত ব্যতীত আলখেল্লা আর কম্বল ধারন করে কেয়ামতের দিন উহা বদ্‌বখতী দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি আল্লাহ চিনিবেন এই উদ্দেশ্যেই যদি গুদড়ী পরিধান করা হয় তবে আল্লাহ উহা ব্যতীতই তাহার যে কোন বান্দার আসল রূপ চিনিতে পারেন। আর যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে, লোক এই ধরনের লেবাসের জন্য তাহাকে আল্লাহর ওলীগণের শ্রেণীভুক্ত

১৭—

বলিয়া মনে করিবে—উহাও দুইটি অবস্থা হইবে। যদি সে প্রকৃতই আল্লাহর ওলী বা ফকীর হয় তবে উহা বিজ্ঞাপীত করা 'রিয়া' অর্থাৎ লোক দেখান হইবে—ইহা গুনাহ। আর যদি সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর ওলী বা দরবেশ না হয় তবে উহা গুরুতর গুনাহ বলিয়া গণ্য হইবে। কেননা যে ব্যক্তির চরিত্র তাহার বাহ্যিক বেশ ভুষার অনুরূপ নহে। অর্থাৎ লেবাসে পরম সাধু কিন্তু মূলে সাধু নহে সে মিথ্যা বেশ ধারী এবং প্রচারক। উহাতে প্রমানিত হয় যে, উহা কখনও সাধুতা বা ফকীরের ভূষণ নহে এবং উহা লোককে প্রতারিত করারই লেবাস এবং কলা কৌশল। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন :—যাহাদিগকে তাওরাত দান করা হইয়াছে অথচ উহার দায়ীত্ব পালন করে না তাহাদের দৃষ্টান্ত ঐ গাধার ন্যায় যাহার পিঠে কিতাবের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, বাহ্যিক বেশ ভূষা যাহাই হউক না কেন, ভিতরের চরিত্র এবং গুণাবলীই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর নিকট কাম্য।

দ্বিতীয়তঃ হজরত নবী করিম (দঃ) উম্মতের জন্য কোন বিশেষ ধরনের লেবাস নির্দ্ধারিত করেন নাই। সাহাবা গণের জীবনই ইহার দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের যাহার যখন যে লেবাস জুটিয়াছে উহা পরিধান করিয়াছেন। অবশ্য লেবাস পোষাক যেন তাক্ওয়া পরহেজগারীর হয় এই বিষয় তাকিদ ছিল। অর্থাৎ লেবাস দুনইয়া দারী গর্ব অহংকার প্রকাশ না পায়। আর উহাতে লজ্জা স্থান পূর্ণরূপে আবৃত হয় এবং খুব সাজ সজ্জা ও ঠাট

ঠমক না হয়। পুরুষের পোষাক স্ত্রী-লোকের ঠং না থাকে। এবং অপর জাতির কোন অনুকরণ না হয়। যাহাতে অন্যের অনুকরণ এবং চিন্তার দাসত্ব এবং হীনমন্যতা প্রকাশ পায়। কৃত্রিম দারিদ্র প্রকাশ করা, এবং লেবাস পোষাক দ্বারা নিজেকে ভণ্ড রূপে প্রকাশ করা ইসলাম কখনও পসন্দ করে না।

হজরত (দঃ) ইরশাদ করিয়াছেন:—"আল্লাহ যদি কোন বান্দাকে কোন দান অবদান দ্বারা ধন্য করিয়া থাকেন, তবে আল্লাহর বান্দার মধ্যে উহার চিহ্ন দেখিতে ভালবাসেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন:—আল্লাহ তাহার বান্দার জন্য যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন বল যে, উহাকে হারাম করিয়াছে এবং যে রুজী আল্লাহ হালাল করিয়াছেন। বল! উহা দুনইয়াকে ঐ সকল লোকদের জন্য যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং কেয়ামতের দিনও বিশেষ করিয়া তাহাদের জন্যই হইবে।

হজরত আলী বিন ওসমান জিলাবী বলেন—"আমার নীতি হইল এই যে, লেবাস পোষাকের বেলায় কোন বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। যেমন জুটে তেমনই—ব্যবহার করা চাই। পোষাক পরিচ্ছদ বা কোন ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট অভ্যাসের বশবর্তি হওয়া চাইনা। কেননা কোন জিনিসে অভ্যস্থ হইয়া পড়িলে মানুষের উহার প্রতি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয় সুতরাং চরিত্রগত হইয়া সত্যের পথে একটা আবরণ বা পর্দা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণে হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—"আমার ভাই দাউদ (আঃ)এর রোজার নীতিই উত্তম।" সাহাবাগণ ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে

তিনি বলিলেন, তিনি এক দিন রোজা রাখিতেন এবং একদিন ভাঙ্গিতেন। যেন রোজা রাখার বা আদৌ না রাখার অভ্যাস সৃষ্টি না হয়।

বিখ্যাত ওলী শেখ হজরত আবুল ফজল মুহম্মদ বিন হাসান খাত্‌লী (রহঃ) সম্পর্কে আলী হুজুবেরী (রহঃ) বলেন যে, তিনিও সুফী হিসাবে কোন নির্দিষ্ট পোষাক পরিধান করিতেন না। যখন যে পোষাক জুটিত তাহাই পরিধান করিতেন।

আত্ম-নিগ্রহ ও নিন্দার পথ

সুফী দরবেশদের এক শ্রেণী আত্ম-শুদ্ধির পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাহারা এমন কাজ কর্ম করেন, এবং এমন পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন যে, লোক তাহাদিগকে দেখিয়া ঘৃণা করে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং নিন্দা ভর্ৎসনা করে। তাহারা বলেন যে, আল্লাহর খাস্‌ বান্দাগণ এই দুনইয়াতে নিন্দা ভর্ৎসনার জন্য নির্দিষ্ট কাহারও কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট না করা সত্ত্বে নিন্দা ভর্ৎসনার পাত্র হওয়াই আল্লাহর দরবারে কবুল বান্দা হওয়ার আলামত। তাহারা ইহার প্রমান স্বরূপ বলেন যে, হজরত (দঃ) এর প্রতি যতদিন ওলী নাযিল না হইয়াছে ততদিন তাহার কোন দুশমন ছিল না তাঁহার প্রতি কোন নিন্দা, ভর্ৎসনা ও হয় নাই। যখনই তাহার প্রতি ওহী নাযিল হইল অমনি তাহার প্রতি চতুর্দিক হইতে নানা দোষারূপ. নিন্দা ও ভর্ৎসনা হইতে

লাগিল। তাঁহাকে যাদুকর, গনক, পাগল প্রভৃতি বলা হইল। ইহা তাহার আল্লাহর দরবারে উচ্চ মর্যাদা লাভেরই পরিচয়। ইহা ব্যতীত মুমেনদের একটি বিশেষ চরিত্র সম্পর্কে কোরআন মজীদে বলা হইয়াছে —"এবং তাহারা নিন্দুকের নিন্দাকে পরওয়া করে না। ইহা আল্লাহর বিশেষ দান তিনি যাহাকে ইচ্ছা দান করেন।" সুতরাং নিন্দা ভৎসনা আল্লাহর খাস্ লোকের পরিচয় হিসাবে তাঁহারা উক্ত পথ অবলম্বন করেন।

তাঁহারা বলেন যে, যে কেহ দুনইয়া হইতে মুখ ফিরাইয়া আল্লাহর পথে নিয়োজিত হইবে আর দুনইয়া তাহাদের মন্দ জানিবে এবং তাহাদের নিন্দা ভর্ৎসনা করিতে শুরু করিবে। তাঁহারা বলেন, এই ভাবে আল্লাহ তাহার সাথে লোক দিগকে সাধারণ লোকের দৃষ্টি হইতে গোপন রাখেন। এমনকি, আল্লাহ তাহাদিগকে এতদুর গোপন রাখেন যে, তাহারা নিজেরা পর্যন্ত নিজেদের পরিচয় জানিতে পারে না। যাহাতে তাহাদের মনে কোন প্রকার গর্ব বা বড়াইর ভাব সৃষ্টি হয়। এ কারণে আল্লাহ তাহাদের মধ্যে নফ্‌সে লাওয়্যামা অর্থাৎ ভর্ৎসনা কারী আত্মাও দিয়াছেন। উক্ত আত্মা ভিতরে থাকিয়া ভর্ৎসনা করিতে থাকে। যদি তাহারা কোন গুনাহ করে তবে সে জন্য আত্মা ভিতরে থাকিয়া গুনাহের জন্য লজ্জা দিতে থাকে। আর যদি কোন সৎ কাজ এবং নেক কাজ করে তবে উহার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যও সেই আত্মা ভিতরে থাকিয়া লজ্জা দিতে থাকে। আল্লাহ এই ব্যবস্থা করার কারন এই যে, গর্ব এবং আত্ম অহংকারের ন্যায় আল্লাহর

রাস্তায় কোন বাধা এবং অন্তরায় নাই। অহংকার এবং গর্বের প্রধান চিকিৎসা হইল নিন্দা ও ভৎর্সনা। কেননা, মানুষের মধ্যে দুই কারণে গর্ব অহংকার পয়দা হয়। এক হইল এমন কোন কাজ করা যাহার কানে লোকের নিকট খুব প্রিয় ও পরিচিত হওয়া, এবং সেজন্য প্রসংশা ও সম্মান লাভ করা। দ্বিতীয়তঃ নিজের কাজে নিজে খুব সন্তুষ্ট হওয়া ও গর্ব অনুভব করা। সুতরাং আল্লাহ তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের জন্য গর্বিত ও অহংকারী হওয়ার উভয় রাস্তাই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং যিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা হইবেন লোকের দৃষ্টিতে তিনি তুচ্ছ ও নিন্দিত হইবেন।

ইবলিস নিজকে খুব বড় মনে করিয়াছিল। সে বলিল:— "আনা খাইরুম্ মিন্হু।" অর্থাৎ আমি আদম হইতে উত্তম। অতঃপর সে আল্লাহর দরবারে নিন্দিত ও ঘৃনিত হইল এবং বেহেশত হইতে বিতাড়িত হইল। আর আদম সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ যখন ফেরেশতাদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন ফেরেশতাগণ পসন্দ করিলেন না। শয়তান আমাদের বিরোধিতা করিল সুতরাং আল্লাহ আদমকে পসন্দ করিলেন।

সাধারণ লোকের নিন্দা ভৎর্সনার কারণ হইল যে, তাহারা নিজের অজ্ঞতা ও মুর্খতার কারনে আল্লাহর খাস বান্দা দিগকে চিনিতে পারে না। হাদীস শরীফে আছে হজরত (দঃ) জিব্রাইল (আঃ) হইতে এবং তিনি আল্লাহর নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়াছেন। আল্লাহ বলেন—"আওলিয়াগণ আমার কাবার (জুব্বা)-নীচে তাহাদিগকে আমি এবং আমার আওলিয়াগণ ব্যতীত কেহই চিনে না।

নিন্দা ভাজন হওয়ার শর্ত

তরিকার মশায়েখগণ এই নিন্দা ভর্ৎসনা কুড়াইবার ব্যাপারে শর্ত ধার্য করিয়াছেন যে, উহার জন্য যেন এমন কোন পথ অবলম্বন করা না হয় যাহাতে শরীয়তের কোন বিরুদ্ধ কোন কাজ না হয়। লোকের নিন্দা কুড়াইবার জন্য সামান্য সগীরাহ গুনাহ ও করা জায়েজ হইবে না। যে কোন অবস্থায় শরিয়তের সীমা লঙ্গন করা যাইবে না। হজরত বায়েযীদ বুস্তামী (রহঃ) সম্পর্কে একটি ঘটনা আছে। তিনি হেজাজ হইতে ফিরিতেছিলেন। পথে তিনি যে স্থান দিয়া যাইতেছিলেন সেই সব স্থানে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার ধুম পরিয়া গেল। অসংখ্য লোক তাহার সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য সমবেত হইল। হজরত বায়েযীদ বোস্তামী এই সম্বর্দ্ধনার আয়োজন দেখিয়া ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, না জানি জনতার এই সম্মান ও সম্বর্ধনা তাঁহার সর্বনাশের কারন হয়। অর্থাৎ আল্লাহর দিক হইতে তাহার দেল এই বিরাট মান সম্মানের দিক রুজু হইয়া পড়ে। সুতরাং তিনি যখন জনতার ভীড়ের মধ্যে উপস্থিত হইলেন তখন নিজের জামার আস্তিনের ভিতর হইতে একখানা রুটী বাহির করিয়া প্রকাশ্যে খাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন রমজান মাস ছিল। লোকে ইহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। তাঁহার সাথে একটি মুরীদ ছিল কেবল মাত্র সেই-ই সংগে থাকিল। অবশ্য ইহা তাঁহার জন্য শরিয়তের খেলাফ কোন কাজ ছিল না; কেননা,

তিনি মুসাফির ছিলেন, মুসাফিরের জন্য রোজা ভাংগা জায়েজ ছিল। তবে বর্তমান যুগে ইহার কোন প্রয়োজন নাই। কেহ সামান্য নিয়ম নিষ্ঠার সহিত কোন শরিয়তের কাজ শুরু করিলে তাহার জন্য নিন্দা ভৎ'সনা, বা ঠাট্টার কোন অন্ত থাকে না। কাজেই আয়োজন করার কোনও প্রয়োজন নাই। নিন্দা, কুৎসা অতি সহজেই লাভ করা যায় এই যুগে।

খাঁটি পথ

হজরত আলী বিন ওসমান জিলাবী বলেন—"নিন্দা ভৎ'সনার আকাংখা এবং উহা প্রার্থনা করা জায়েজ নহে। উহা তালাশ করা এবং উহার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে ব্যবস্থা করা রিয়াকারী এবং কপটতা। কিন্তু কোন ভণ্ড ব্যক্তি লোকের নিকট প্রিয় হইবার জন্য কোন বেশ ধারণ করে ঠিক ইহাও তেমনি। এমন কোন বেশ ধারণ করা, বা এমন এমন কোন কাজ করা যাহাতে লোক তাহাকে নিন্দা করে এবং প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং ইহাও একটা ভান মাত্র। দেখা যায় ইহারা উভয়ই খোদার দিক হইতে মানুষের দিক নিবিষ্ট। সত্যিকার ওলী এবং দরবেশ তো সেই যিনি অল্লাহ ব্যতীত অন্য সব দিক হইতে বিমুখ। তাহার উদ্দেশ্য হইল, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহর খাঁটি প্রেমিকগণ একমাত্র আল্লাহর রাস্তা ছাড়া অন্যদিকে কোন খেয়ালই করেন না। তাঁহা-

দের নিবিষ্টতা, একাগ্রতা, ধ্যান, চিন্তা সব খোদাকে নিয়া। খোদা ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন ফিকির ফন্দি, সাজ সজ্জা প্রভৃতি থাকিতে পারে না। অবশ্য শরিয়তের সকল কাজ খুব নিষ্ঠা এবং নিবিষ্টতার সহিত করায় তাহারা কাহারও কোন পরওয়া করেন না, চাই ইহাতে কেহ সন্তুষ্ট হউক বা কেহ তাঁহাদিগকে নিন্দা করুক। নিন্দা অর্জন করার জন্য কোন ব্যবস্থা করা কোন পন্থা অবলম্বন করা ইহা একান্তই বেহুদা কৃত্রিমতা। "আল্লাহর কালাম—"তাহারা নিন্দুকের নিন্দা ভর্ৎসনায় কোন পরোয়া করে না—" ইহার অর্থ উহাই। লোকে নিন্দা করিবে এই ধারনা নিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) কখনও কোন কাজ করেন নাই। বরং তিনি আল্লাহর হুকুম মানুষের সামনে নির্ভয়ে প্রচার করিয়াছেন উহাতে কে ভাল বলিবে কে নিন্দা করিবে ইহার কোনও পরোয়া করেন নাই।

চারি তরিকার সবক ও ওজিফা

মুরীদগণের কর্তব্য

১। আপনারা ঈমান ঠিক রাখিবেন। নামাজ, রোজা, কালেমাঃ হজ্ব ও জাকাৎ যথারীতি আদায় করিবেন।

২। পায়খানা-প্রস্রাব করিয়া কুলুখ ব্যবহার করতঃ যথারীতি ওজু-গোছল করিয়া পাক-ছাফ ভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জমাআতে ও জুমার নামাজ পড়িবেন।

৩। নিজ স্ত্রী, মা ও বোনদের পূর্ণ পর্দায় রাখিবেন।

৪। হালাল খানা খাইবেন। সুদ, ঘুষ ও হারাম ব্যবসা বাণিজ্য ত্যাগ করিবেন। যাহারা সুদ, ঘুষ খায় ও ফাছেকে মোলায়েন্ তাহাদের খানা খাইবেন না। এমন কি, তাহাদের দান খয়রাতও গ্রহণ করিবেন না।

৫। হুক্কা, বিড়ি ও চুরুটের অভ্যাস ত্যাগ করিবেন।

৬। দাঁড়ি খাট করিবেন না, ঝুটি রাখিবেন না, পাতলা কাপড় ও খাট কোরতা ব্যবহার করিবেন না।

৭। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাংসারিক কার্য করিবেন। তাহাতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করিবেন না। সুদ দিবেন না। মেয়ের পণের টাকা লইবেন না বা অন্যের হক ঠকাইয়া খাইবেন না; গীবত, চোগলখুরী ও ফজুল ব্যয় করিবেন না। যাবতীয় হালাল চাকুরী করিতে পারেন, কিন্তু নামাজ রোজা ও ছুন্নৎ-তরিকা ঠিক রাখিয়া চলিবেন। যাবতীয় শের্‌ক-বেদ্‌আত ত্যাগ করিবেন।

৮। যে যে দোওয়া দরূদ ও নিয়ত শিক্ষা দিব, তাহা যথা-রীতি পড়িবেন ও আমল করিবেন; আল্লাহ-তায়ালা আপনাদিগকে দোজাহানে উন্নতি দান করিবেন।

———

নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার

সংক্ষিপ্ত ওয়াজিফা

ফজরের নামাজ পড়িয়া চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া কেবলামুখী হইয়া দো-জানু ভাবে ব'সিয়া অতি বিনম্রভাবে নিম্নের দরূদ একশত বার পড়িবেন—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

وَعَلٰى مُحْيِيْ سُنَّتِهٖ مُجَدِّدِ اَلْفِ ثَانِيْ رَحْمَةُ اللّٰهِ

عَلَيْهِ ٭

আ'ল্লা'হুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদিন ছাইয়্যেদেল মোরছালিনা ওয়া আলা মোহিয়ে সুন্নাতিহী মোজাদ্দেদে আল্‌ফে-ছানী রাহমাতুল্লাহে আলায়হে।

তৎপর পাঁচশত বার কিম্বা তিনশত বার পড়িবেন—

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ٭

লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্।

পুনঃ উক্ত দরূদ একশতবার পড়িবেন।

এশার নামাজ পড়িয়া :বেতেরের নামাজ পড়ার পর প্রত্যহ নিম্নের দরূদ শরীফ পাঁচশত বার পড়িবেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسِيْلَتِيْ اِلَيْكَ

وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ٭

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়োদেনা মোহাম্মাদেউঁ ওয়াছিলাতি এলাইকা ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লেম।

দরূদ শরীফ পড়িবার নিয়ত

আমি আমার কলবের তরফ মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার কলব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলা হইয়া হজরত নবী করীম (দঃ)-এর কেবলার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। হজরত নবী করীম (দঃ)-এর কলব মোবারক হইতে মোহাব্বত ও নুরের ফায়েজ আমার নছিব হয়।

ছওয়াব রেছানীর নিয়ম

মোরাকাবা কিংবা জিকির করার আগে সমস্ত বোজর্গানে দ্বীনের রূহে ছওয়াব রেছানী করা ভাল। প্রথমে তিনবার ছুরা ফাতেহা দশবার ছুরা এখলাছ ও এগারবার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া সমস্ত পয়গাম্বর ও অলি-আল্লাহগণের রূহে বখশিয়া দিবে। তৎপর নিয়ত করতঃ মোরাকাবা কিংবা জিকির আজ্‌কার করিবে।

যিনি নক্শবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় মুরীদ ; তিনি প্রত্যেক রোজ ফজরের বাদ ও এশার বাদ উক্ত ওজিফা যথানিয়মে পড়িতে থাকিবেন। যদি কোন বিশেষ ওজরে নির্দিষ্ট সময়ে পড়িতে না পারেন, তবে অবসর মত অন্য সময়ে আদায় করিবেন, নচেৎ দেল শক্ত হইয়া যাইবে। দরূদ শরীফে দেল পরিষ্কার করিবার রেত স্বরূপ। হাদিছ শরীফে আছে—একবার দরূদ শরীফ পড়িলে দশটি নেকী আমলনামায় লেখা যায়, দশটি বদী দুরীভূত হয় ও দশটি দরজা বলন্দ হয়। এতদ্ব্যতীত হজরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের ও অলি-আল্লাহদের মহব্বত ও দোওয়া পাওয়া যায়।

লা হাওলা পড়ার ফজিলত

লা হাওলা পড়ার ফজিলত হাদিছ শরীফে বহুত আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এই যে,—

(১) শীতকালে যেরূপ গাছের পাতা ঝড়িয়া যায়, "লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পড়িলে তদ্রূপ গোনাহ সমূহ ঝড়িয়া যায়।

(২) একবার লা হাওলা পড়িলেই নিরানব্বই প্রকার পীড়া হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ছোট পীড়া চিন্তারোগ।

অতএব, সকলে যথারীতি ওজিফা পড়িবেন। সাবধান! কেহ হারাম ও সন্দেহের মাল খাইয়া শরীয়তের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া

ওজিফার বদনাম না করেন যে ওজিফা পড়িয়া কোন ফল পাই-লাম না।

লতীফা সমূহের পরিচয়

১। ক্বলব—বাম দুধের দুই অঙ্গুলী নীচে, রং জরদ।

২। রূহ—ডান দুধের দুই অঙ্গুলী নীচে, রং লাল।

৩। ছের—বাম দুধের দুই অঙ্গুলী উপরে, রং সাদা।

৪। খফি—ডান দুধের দুই অঙ্গুলী উপরে, রং কাল।

৫। আখ্‌ফা—বক্ষস্থলের মধ্যভাগে, রং সূর্যের কিরণের ন্যায়।

এতদ্ব্যতীত সর্বশরীর ব্যাপিয়া চারিটি লতীফা আছে। যথা—আব (পানি), আতস (আগুন), খাক (মাটি), বাদ্ (বায়ু)। এই মোট দশ লতীফা।

লতীফার মোরাকাবার নিয়ম

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কলব-হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আল্লাহ নামের ফায়েজ আমার কলবে আসে, আমার কলবে আল্লাহ জেকের মালুম হয়।

লতিফার রং দেখা মোরাকাবার উদ্দেশ্য নহে। যদি কেহ রং না দেখেন ও ছাবের মালুম না হয় তাহাতে কেহ চিন্তা করিবেন না, মোরাকাবায় বসা চাই, যেহেতু যে ব্যক্তি এক ঘন্টা আল্লাহ্ তায়ালার ধেয়ানে বসিবে, জেকের মা'লুম হউক আর না হউক, ষাট বৎসরের এবাদতের চেয়ে বেশী নেকী তাহার আমল নামায় লেখা যাইবে।

উল্লেখিত ছয় লতিফা হজরত পীর ছাহেবের নিকট পাইয়া পরে আব, আতশ, খাক, বাদ এই চারি লতিফায় ছবকে বসিবেন।

ছোল্‌তানুল আজকার

তাহার পর দশ লতিফায় একত্রে জেকের করিতে হইবে, ইহার নাম "ছোলতানুল আজকার।"

একরূপ সকল লতিফায় বসিবেন। কিন্তু নিয়তে লতিফার নাম উল্লেখ করিবেন।

পাছে-আন্‌ফাছ

তাহার পর পাছে আনফাছ করিবেন। শ্বাস টানিতে "আল্লাহ" ছাড়িতে "হু" খেয়াল করিবেন মুখে কিছু বলিতে হইবে না। ইহাকে পাছে-আনফাছ বলে।

তরিকত পন্থীদের নিম্ন বিষয় সমূহের প্রতি খেয়াল রাখিতে হইবে

(১) হুশ দরদম। (২) নজর বরকদম। (৩) ছফর দর ওয়াতন। (৪) খেলওয়াৎ দর আঞ্জুমান। (৫) ইয়াদ কারদ। (৬) বাজেগাশ্‌ৎ। (৭) নেগাহ্‌দাশ্‌ৎ। ( ) ইয়াদদাশ্‌ৎ। (৯) আকুফে জমানী। (১০) আকুফে আদাদী। (১১) আকুফে কাল্‌বী।

তওবার ফায়েজের নিয়ত

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কলব হজরত আদম (আঃ) এর কলবের অছিলায়, আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে, আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তওবার ফায়েজ আমার কলবে আসে, হজরত আদম (আঃ)-এর যেরূপ তওবা নছিব হইয়াছিল, আমারও সেইরূপ তওবা নছিব হয়।

মোরাকাবায় বসিয়া নিম্ন আয়াত মনে মনে পড়িবে ও আয়াতের অর্থের দিকে খেয়াল করিবে।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ •

রাব্বানা যালামনা অন্‌ফুছানা ওয়া ইল্লাম তাগ্‌ফের-লানা ওয়া তারহাম্‌না লানাকুনান্না মিনাল খাছেরীন।

অর্থাৎ: "হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপর জুলুম করিয়াছি, যদি তুমি মা'ফ না কর ও রহম না কর তাহা হইলে আমি ক্ষতিগ্রস্থ হইব।" সেই সঙ্গে স্বীয় কৃত যাবতীয় গুনাহের কথা মনে করিবে।

নফি এছবাত করিবার তরতীব

(১) শ্বাস বন্ধ করতঃ নাভিদেশ হইতে "লা" শব্দ কপালের উর্দ্ধ ভাগ নফছ পর্যন্ত নিয়া তথা হইতে "ইলাহা" শব্দ খফীর উপর দিয়া রূহুতে আনিয়া তথা হইতে "ইল্লাল্লাহ" শব্দ আখফার উপর দিয়া কলব মোকামে পৌঁছাইবে, যেন ইল্লাল্লাহ "হে" শব্দ ছের দিয়া বাহির হইয়া যায় ও জেকেরের তাছির সকল লতীফায় পৌঁছে। আর দুই প্রকার নফি এছবাত আছে। একশত বার নফি এছবাত করার পর পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ رِضَاكَ وَمَعْرِفَتَكَ وَمَحَبَّتَكَ ۰

আল্লাহুম্মা আ'তেনী রেদাকা ওয়া মা'রেফাতাকা ওয়া মোহা-ব্বাতাকা।

অর্থাৎ—আয় আল্লাহ! আমাকে তোমার ইচ্ছার উপর রাজী

থাকার শক্তি দান কর, আমাকে তোমার মা'রেফত ও মোহাব্বত দান কর।

•

তাহার পর পড়িবে

"লা মা'বুদা ইল্লাল্লাহ"

لَا مَعْبُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ

(আল্লাহ ব্যতীত বন্দেগীর উপযুক্ত কেহ-ই নাই)

"লা মাক্‌ছুদা ইল্লাল্লাহ"

لَا مَقْصُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ

(আল্লাহ ব্যতীত কোন আশা নাই)

"লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ"

لَا مَوْجُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ

(আল্লাহ ব্যতীত কেহই নাই)

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কলব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহ তা'য়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে, আল্লাহ তা'য়ালার তরফ হইতে নফি এছবাতের নুর ও মোহাব্বতের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

নফি এছবাতের পাছে আন্ ফাছ

শ্বাস টানিতে "লা এলাহা" শ্বাস ছাড়িতে "ইল্লাল্লাহ" সর্বদা খেয়াল রাখিতে হইবে।

১। দায়েরায়ে এম্ কানের মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি, আমার কলব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহ তা'য়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে, (অথবা আরশে মোআল্লার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে)। আল্লাহ তাআলার (আরশ মোআল্লার) তরফ হইতে দায়েরায়ে এমকানের ফায়েজ আমার কলবে আছে।

নিম্নলিখিত মোরাকাবার নিয়তেও এইরূপ ছবকের নাম উল্লেখ করিবেন।

দায়েরায়ে এম্কানের মধ্যে নিম্ন ছবক সমুহ আছে :—

(২) আনওয়ারে ছায়েরে আফাকীর মোরাকাবা।

(লা জাহেরা ইল্লাল্লাহ)

لَا ظَاهِرَ اِلَّا اللّٰهُ

তাজাল্লিয়ে আফআলী (লা ফায়েলা ইল্লাল্লাহ)

لَا فَاعِلَ اِلَّا اللّٰهُ

(৩) তাওহীদে আফ্আলী (লা ফায়েলা ইল্লাল্লাহ)

لَا فَاعِلَ اِلَّا اللّٰهُ

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ٭

অর্থাৎ :—যাহারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং লোকদিগকে ক্ষমা করে, (তাহারাই সৎকার্যকারী) আল্লাহ সৎকার্যকারীদিগকে ভাল বাসেন।

এই আয়াতের অর্থানুযায়ী উক্ত মোরাকাবায় দেল হইতে ক্রোধ বিদুরিত হইবে এবং লোকের অপরাধ ক্ষমা করিবার ক্ষমতা জন্মিবে।

(৪) জজ্‌বায়ে মোম্‌মিন্ জজবাতিল্লাহ (লা-মাওজুদা ইল্লাল্লাহ)

لَا مَوْجُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ

(৫) আন্‌ওয়ারে-ছায়েরে-আন্‌ফোছী (লা-বাতেনা ইল্লাল্লাহ)

لَا بَاطِنَ اِلَّا اللّٰهُ

(৬) রহমতের ফায়েজ (ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাহ্মানু, ইয়া রাহিমু, ইয়া হুয়াল হাইউল কাইউম)।

يَا اَللّٰهُ - يَا رَحْمٰنُ - يَا رَحِيْمُ - يَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ -

মন্তব্য :—রহমতের ফায়েজ দ্বারা কাশ্‌ফোল কুবুর মা'লুম হইয়া থাকে ও পীড়া দফে হইয়া থাকে।

রহমতের ফায়েজের নিয়ত

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার কলব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহ তা'য়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জাহ আছে, আল্লাহ তা'য়ালার তরফ হইতে ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাহ্মানু, ইয়া রাহিমু, ইয়া হুয়াল হাইউল কাইউমু, এই নাম সমূহের ফায়েজ আমার কলবে আসে। এই নাম সমূহের রহমতের ফায়েজ আমার কলবে আসিয়া বুজুর্গানের রুহ মোবারকে পৌঁছে ও তাঁহাদের জেয়ারত আমার নছিব হয়।

পীড়া দফের জন্য জাহেরী বাতেনী যাবতীয় পীড়া দফের নিয়ত করিবে। খোদার ফজলে পীড়া দফে হইবে।

২। দায়েরায়ে বেলায়েতে ছোগরার নিয়ত

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার

কলব হজরত পীর ছাহেবের কলবের অছিলায় আল্লাহ তাআলার জাত, যাহা মোছতাজমে জামিয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে, সেই আছমা ও ছেফাতের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। উক্ত আছমা ছেফ্যাতের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

নিম্ন মোরাকাবা সমুহেও উক্তরূপ নিয়ত করিবে, কেবল মাত্র নাম পরিবর্তন করিয়া বলিতে হইবে।

১ম ,, মোরাকাবা—জেলালে-আছমা ও ছেফাত।
ظلال اسماء وصفات

২য় ,, মাইয়্যাতের মোরাকাবা—معیت

৩য় ,, মাইয়্যাতে হুব্বি—معیت حبی

৪র্থ ,, নেছিয়ানে আম্মা ছেওয়ায়ে আল্লাহ
نسیان عن ما سواء الله

৫ম ,, গালাবাতু-ন্নেছবাৎ—غلبة النسبة

৬ষ্ঠ ,, তাওহিদে মোয়াল্লা—توحید معلی

৭ম ,, তাজাল্লীয়ে বারকী—تجلی برقی

৮ম ,, ওয়াহদাৎ দরকাছরৎ—وحدت در کثرت

৯ম ,, ওয়াহদানিয়াৎ—وحدانیت

১০ম ,, ছামদানিয়াৎ—صمدانیت

১১শ ,, জালালী—جلالی

১২শ ,, ফানা—فناء

يَا اَللهُ - يَا قَهَّارُ - يَا جَلِيْلُ - يَا جَبَّارُ

১৩শ ,, বাকা—بقاء

১৪শ ,, ওয়ারেদাৎ—واردات

১৫শ ,, এস্তেগরাক্—استغراق

১৬শ ,, বেখুদী—بے خودی

১৭শ মোরাকাবা—দাওয়ামে হুজুর—دوام حضور

১৮শ ,, এন্‌কেশাফে শরীয়ত—انکشاف شریعت

১৯শ ,, কাশফুল-কুলুব—کشف القلوب

২০শ ,, কাশফুল-আরওয়াহ—کشف الارواح

এতদ্ব্যতীত এই দায়রায় আরও মোরাকাবা সমূহ আছে। যথা—(১) তওবা, (২) এনাবত, (৩) জোহদ, (৪) কানাআত, (৫) অরা, (৬) শোকর, (৭) তছলীম, (৮) রেজা, (৯) ছবর, (১০) তাওয়াকোল।

নিয়ত

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার কলব হজরত আদম (আঃ)-এর কলবের অছিলায়, আমার কলবের অছিলায় আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আমার কলব হজরত আদম (আঃ)-এর কলবের অছিলা হইয়া আল্লাহ তাআলার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তওবার ফয়েজ আমার কলবে আসে।

এইরূপ ছবকের নাম পরিবর্তন করিয়া অন্যান্য মোরাকাবায় বসিবে।

৩। দায়েরায়ে-বেলায়েতে কোব্‌রা

তন্মধ্যে নিম্ন ছবক সমূহ আছে :—

(১) বেলায়েতে-কোবরা, (২) জাত ও ছেফাত, (৩) তাক্‌রারিয়াত, (৪) মোহাব্বত।

উক্ত ছবক সমুহের নিয়ত

আমি আমার নফছের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার নফছ হজরত পীর ছাহেব কেবলার নফছের অছিলায় আল্লাহ তা'য়ালার জাত, যাহা মোছতাজমে জামিয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে, সেই আছমা ও ছেফাতের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। উক্ত আছমা ও ছেফাত হইতে বেলায়েতে নফছে কোবরার ফায়েজ আমারও লতীফা সমুহে আসে।

এইরূপ বাকী নিয়ত, কেবলমাত্র ছবকের নাম পরিবর্তন করিয়া বলিতে হইবে।

কওছ বা শরহোচ্ছুদুরের মোরাকাবার নিয়ত

আমি আমার নফছের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার নফছ হজরত পীর কেবলা ছাহেবের নফছের অছিলায় আল্লাহ

তাআলার জাত. যাহা মোছ্তাজমে জামিয়ে আছমা ও ছেফাত হইতেছে, সেই আছমা ও ছেফাতের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। উক্ত আছমা ও ছেফাত হইতে হজরত (দঃ) এর ছিনা মোবারকের অছিলায় আমার অছিলায় শরহোচ্ছুদুরের ফায়েজ আসে।

৪। দায়েরায়ে-বেলায়েতে উল্ইয়ার নিয়ত

আমি আমার আব, আতশ, খাক ও বাদের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার আব, আতশ ও বাদ হজরত পীর ছাহেব কেবলার আব, আতশ ও বাদের অছিলায় আল্লাহ তা'য়ালার তরফ মোতা-ওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তা'য়ালার জাত, যাহা আছমা ও ছেফাতের বাতেনের মূল তাহার তরফ হইতে আছমা ও ছেফাতের বাতেনে মোছাল্লার ফায়েজ আমার আব, আতশ ও বাদে আসে। বেলায়েতে-উল্ইয়ার ফায়েজ আমার নছিব হয়।

৫। দায়েরায়ে কামালাতে নবুয়তের নিয়ত

আমি আমার খাকের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। খাক হজরত পীর ছাহেব কেবলার খাকের অছিলায় আল্লাহ তা'য়ালার জাতে বা-হাতের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তাআলার

জাতে বা-হাত হইতে কামালাতে নবুয়তের ফায়েজ আমার লতীফায়ে খাফে আসে।

৬। দায়েরায়ে-কামালাতে রেছালাতের নিয়ত

আমি আমার হাইয়াতে-ওয়াহদানিয়তের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার হাইয়াতে-ওয়াহদানিয়ত হজরত পীর ছাহেব কেবলার হাইয়াতে-ওয়াহদানিয়তের অছিলায় আল্লাহ তা'য়ালার জাতে বা-হাতের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তাআলার জাতে বা-হাত হইতে কামালাতে রেছালাতের ফায়েজ আমার হাইয়াতে-ওয়াহদানিয়তে আসে।

প্রকাশ থাকে যে, ৭ম দায়েরা হইতে ২৩শ দায়েরা পর্যন্ত ঐরূপ নিয়ত. কেবল মাত্র ছবকের নাম পরিবর্তন করিয়া বলিতে হইবে।

৭ম দায়েরা—কামালাতে উলুল আজম।
৮ম ,, কামালাতে-হাকিকাতে কাইউমিয়াৎ।
৯ম ,, হাকিকাতে ঈছুওয়ী—حقيقت عيسوى
১০ম ,, ইব্রাহিমী—ابراهيمى
১১শ ,, ,, মুছাওবী—موسوى
১২শ ,, ,, মোহাম্মদী—محمدى
১৩শ ,, ,, আহমদী—احمدى
১৪শ ,, হোব্বে মোহাম্মদী-ছোরফা—حب محمدى صرفه

১৫শ ,, হোব্বে আহমদী-ছোরফা— حب احمدی صرفۃ

১৬শ ,, ,, ছোরফা— حب صرفۃ

১৭শ ,, দায়েরাও-লাতাই-উন— لا تعین

১৮শ ,, হাকিকাতে কাবা— حقیقت کعبۃ

১৯শ ,, ,, কোরআন— قران ,,

২০শ ,, ,, ছালাত— صلوۃ ,,

২১শ ,, ,, ছাওম— صوم ,,

২২শ ,, ,, ছোরফায়ে মাবুদিয়াৎ— صرفۃ معبودیۃ

২৩শ ,, হাকিকাতে মোহাব্বতে-জজবায়ে-জাতি ও হোব্বে এশ্ক।

—حقیقت محبت جذبۂ ذاتی و حب عشق

২৪শ দায়েরা হাকিকাতে ছায়ফিল্লাহ— حقیقت سیف اللہ

এই মোরাকাবায় বসিয়া নিম্নের দরূদ পড়িবেন—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيْفِ اللّٰهِ الْقَاطِعِ

وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ۔

———

চিশ্‌তিয়া তরিকার ওয়াজিফা

চিশ্‌তিয়া তরিকার মুরীদগণ ফজরের নামাজের বাদে নিম্নের দরূদ শরীফ একশত বার পড়িবেন :—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

وَعَلٰى مُحْيِ سُنَّتِهٖ الشَّيْخِ وَالْخَوَاجَةِ مُعِيْنِ الدِّيْنِ

الْچِشْتِىْ اِمَامِ الطَّرِيْقَةِ وَاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ رَضِيَ

اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ۝

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন ছাইয়্যেদিল মোরছালিন। ওয়া-আলা মুহিয়ে ছুন্নাতিহিশ শায়খে ওয়াল খাওয়াজাতে মুঈনুদ্দীনেল চিশ্‌তি ইমামিত্তারিকাতে ওয়া আওলিয়ায়েল কামিলীনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হু।

এশার নামাজ বাদ নিম্ন দরূদ একশত বার পড়িবেন :—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ۝

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদেনিন্ নাবিয়েল উম্মিয়ে ওয়া আলেহী ওয়া ছাল্লেম।

দরুদ শরীফ পড়িবার নিয়ম

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার কলব হজরত নবী করীম (দঃ)-এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। হজরত নবী করীম (দঃ) এর কলব মোবারক হইতে মোহাব্বত ও নুরের ফায়েজ আমার কলবে আসে। তাওয়াজ্জুহ ও জেয়ারত আমার নছিব হউক।

চিশ্‌তিয়া তরিকার লতীফা সমুহ

কলব—বাম দুধের দুই অঙ্গুলী নীচে।

রূহ—ডাইন দুধের দুই অঙ্গুলী নীচে।

ছের—বাম দুধের দুই অঙ্গুলী উপরে বক্ষের দিকে ঝুকান।

খফি—কপালের মধ্যভাগে (ছজদার স্থান)

আখফা—মাথার তালুতে নরম স্থান, যাহাকে সাধারণ কথায় দুগ্‌দুগী বলে।

নফছ—নাভিস্থল।

নফি এছবাতের নিয়ত

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তাআলার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ-

তা'য়ালার তরফ হইতে চিশ্‌তিয়া তরিকার নেছবত অনুযায়ী নফী এছবাতের জেকের ফায়েজ আমার কলবে আসুক।

জেকের করিবার তরতীব

নামাজের বৈঠকের ন্যায় বসিয়া চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ লা শব্দ নাভিমূল হইতে আরম্ভ করিয়া ডাইন স্কন্ধ পর্যন্ত পৌঁছাবে, তথা হইতে এলাহা শব্দকে মস্তিস্ক পর্যন্ত পৌঁছাইবে, মস্তিস্ক হইতে ইল্লাল্লাহ শব্দ টানিয়া নিয়া সজোরে কলবে ছাড়িবে। জেকের-কালে ছয় লতীফার দিকে খেয়াল করিবে। আল্লাহ ব্যতীত কেহই নাই। আল্লাহ তাআলাই মকছুদ, এইরূপ খেয়াল করিতে থাকিবে। খফি জেকেরও এইরূপ, কিন্তু চুপে চুপে নফি এছবাত করিবে।

চিশ্‌তিয়া তরিকার পাছে-আন্‌ফাছ

শ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে লাএলাহা শ্বাস টানিয়া ইল্লাল্লাহ। খেয়ালের সহিত শ্বাস প্রশ্বাস করিবে।

———

চিশ্‌তিয়া তরিকার দশ মোকামের

মোরাকাবা

১। কলবে—তওবার মোরাকাবা।
২। রুহতে—এনাবাতের মোরাকাবা
৩। ছেরে—জোহদের ”
৪। খফিতে—অরার ”
৫। আখ্‌ফায়—শোকরের ”
৬। নফছে—তাওয়াক্কোলের ”
৭। আতশে—তছলীমের ”
৮। বাদে—ছবরের ”
৯। আবে—কানাআতের ”
১০। খাকে—রেদার ”

নিয়ত :—আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার কলব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলা হইয়া আরশে মোআল্লার তরফ মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আরশে মোআল্লার তরফ চিশ্‌তিয়া তরিকার নেছবত মোতাবেক তওবার ফায়েজ আমার কলবে আসে। হজরত আদম (আঃ) এর যেরূপ তওবা নছিব হইয়াছিল আমার সেইরূপ তওবা নছিব হউক।

এই মোরাকাবায় বসিয়া রাব্বানা যালামনা আন্‌ফুছানা ওয়া ইল্লাম তাগফেরলানা ওয়াতারহামনা লানকুনান্না মিনাল খাছেরীন। এই আয়াতের মানির দিকে খেয়াল করিবে এবং মোরাকাবার

সময় মৃদুস্বরে আল্লাহু আল্লাহু জিকির করিবে (অন্যান্য লতিফায়ও এই নিয়ত করিবে)। কেবল মাত্র ছবকের নাম পরিবর্তন করতঃ তওবা স্থলে এনাবত, জোহদ ইত্যাদি বলিবে। এই সকল ছবকেও আল্লাহু আল্লাহু জিকির করিবে। বাকী ছবক লইবার সময় জানিয়া লইবে।

এই আয়াতের মানির দিকে খেয়াল করিবে এবং মোরাকাবায় সময় মৃদুস্বরে আল্লাহু আল্লাহু যিকির করিবে। অন্যান্য লতিফায়ও ঐরূপ নিয়ত করিবে। কেবলমাত্র ছবকে নাম পরিবর্তন করতঃ তওবা, এনাবত, জোহদ ইত্যাদি বলিবে। এই সকল ছবকেও আল্লাহু আল্লাহু যিকির করিবে। বাকী ছবক লইবার সময় জানিয়া লইবে।

চিশতিয়া তরিকার আয়াতের মোরাকাবা

اَللّٰهُ حَاضِرِىْ - اَللّٰهُ نَاظِرِىْ - اَللّٰهُ شَاهِدِىْ -

اَللّٰهُ مَعِىْ ۔

১। আল্লাহু হাজেরী, আল্লাহু নাজেরী, আল্লাহু শাহেদী, আল্লাহু মায়ী।

নিয়াৎ—আমি আমার কলবের তরফ মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার কলব হজরত পীর ছাহেবের কলবের অছিলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উক্ত কালাম সমূহের ছুরুরী ও মাইআতের ফায়েজ চিশতিয়া তরিকার নেছবত মোতাবেক আমার কলবে আসুক।

أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ۝

২। আলা ইন্নাহু বেকুল্লে শাইয়েম্ মুহিত্ব।

অর্থ—নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় বস্তু বেষ্টনকারী। উক্ত-রূপে নিয়ত করিবে। কেবল আয়াতের মর্মের দিকে খেয়াল করিবে।

নিয়ত—আমি আমার কলবের তরফ মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার কলব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উক্ত আয়াতের মজমুনের ফায়েজ চিশতিয়া তরিকার নেছবৎ মোতাবেক আমার কলবে আসুক।

নিম্নলিখিত ছবকগুলির নিয়ত ও উক্তরূপ। শুধু ছবকের নাম পরিবর্তন করিয়া আয়াতের মর্মের দিকে খেয়াল করিবে।

كَأَنَّهُ حَاضِرٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ قِبْلَتِكَ تُشَاهِدُهُ ۝

৩। কা-আন্নাহু হাদেরুন বাইনাকা ওয়া বাইনা কেবলাতেকা তুশাহেদুহু।

ভাবার্থ—আল্লাহ যেন তোমার ও তোমার কেবলার মধ্যে আছেন, তুমি তাহাকে দেখিতেছ।

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ ۝

৪। ওয়াহুয়া মাআকুম আইনামা কুনতুম।

অর্থ—(আল্লাহ বলিয়াছেন) এবং তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তোমরা যখন যে অবস্থায় থাক।

اَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۝

৫। আইনামা তুওয়াল্লু ফাছাম্মা ওয়াজহুল্লাহে।

ভাবার্থ—যে দিকে তাকাও, সেইদিকেই আল্লাহ তাআলার প্রমাণ পাইবে।

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝

৬। আলাম ইয়ালাম বেআন্নাল্লাহা ইয়ারা।

অর্থাৎ—(আল্লাহ বলিয়াছেন) সে (মানুষ) কি জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সকলকে দেখিতেছেন।

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۝

৭। নাহনো আক্‌রাবু ইলাইহে মিন্‌ হাবলিল ওয়ারীদ।

ভাবার্থ—আল্লাহ বলিয়াছেন, আমি মানুষের শাহ্ রগ (গর্দানের একটি শিরা) হইতেও সন্নিকটে আছি।

اَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيْطٌ ٭

৮। আল্লাহু বেকুল্লে শাইয়েম মুহিত্ব।

ভাবার্থ—আল্লাহ বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় দ্রব্যকে বেষ্টন করিয়াছেন (কুদ্‌রত দ্বারা)।

اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ٭

৯। ইন্না মায়িয়া রাব্বি ছায়াহ্‌দীন।

ভাবার্থ—আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা আমার সাথে আছেন, অবশ্য আমাদিগকে অতি শীঘ্র হেদায়েত করিবেন।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ٭

১০। হুয়াল্ আউয়্যালো, ওয়াল আখেরু, ওয়াজ্জাহেরু, ওয়াল বাতেনু।

অর্থ— আল্লাহ তায়ালা প্রথম হইতে আছেন, সর্বশেষও থাকিবেন। তাহার সৃষ্ট জিনিস দর্শন দ্বারাই অনুভব হয় যে, তিনি প্রকাশ এবং আল্লাহ তায়ালার জাত হিসাবে তিনি অ-প্রকাশ।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ

ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ٭

১১। কুল্লু মান আ'লাইহা ফানেওঁ ওয়া ইয়াব্‌কা ওয়াজহু রাব্বেকা যুল-জালালে ওয়াল একরাম।

ভাবার্থ—যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ বিনষ্ট হইবে। কিন্তু মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত জগত প্রতিপালিত আল্লাহ তায়ালাই চিরস্থায়ী থাকিবেন।

إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ أَيْنَمَا

تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ •

১২। ইন্নাল মাওতাল্লাজি তাফেরূনা মিন্‌হু ফাইন্নাহু মোলাকীকুম আইনামা তাকুনু ইয়ুদ্‌রেক্‌কুমুল মাওতু ওয়ালাও কুনতুম ফি বুরুজীম মোশাইয়াদাহ।

ভাবার্থ—অবশ্য তোমরা যে মৃত্যু হইতে পলায়ন করিতেছ, নিশ্চয় উহা তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তোমরা যে স্থানে থাক, যদিও তোমরা সুরক্ষিত দুর্গসমূহে থাক, তবুও মৃত্যু তোমাদিগকে ধরিবে।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ •

১৩। ফাজ্‌কুরুনী আজকুরুকুম ওয়াশ্‌কুরুলী ওয়ালা তাক্‌ফুরুন।

ভাবার্থ—তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব এবং আমার শোকর কর, না-ফরমানী করিও না।

তৌহিদে আফ্‌য়া'লীর মোরাকাবা

১৪। এই মোরাকাবায় 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ' এই কালামের মতলবের দিকে খেয়াল করিবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত গোনাহ হইতে বাঁচিবার ও এবাদত করিবার শক্তি নাই।

কাদেরিয়া তরিকার ওজিফা

এশার নামাজের বাদ নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ একশত বার পড়িবে :—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُوْدِ

وَالْكَرَمِ وَآلِهٖ وَسَلِّمْ ۔

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন মা'দানিল জুদে ওয়াল কারামে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লেম।

ফজরের নামাজের বাদ নিম্ন দরূদ শরীফ একশত বার পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

وَعَلٰى اَرْشَدِ اَوْلَادِهٖ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيْلَانِىْ اِمَامِ

الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ۔

আল্লাহুম্মা ছালে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদিন সাইয়েদিল মোরছালীনা ওয়া আলা আরশাদে আওলাদিহিশ শায়খ আবদুল কাদের জিলানী এমামিত্তারিকাতে ওয়াল আওলিয়ায়েল কামেলিনা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

দরূদ শরীফ পড়িবার নিয়ৎ

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার কলব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় হজরত নবী করীম (দঃ)-এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ আছে। হজরত নবী করীম (দঃ)-এর কলব মোবারক হইতে মুহাব্বত ও নূরের ফায়েজ আমার আসে এবং তাওয়াজ্জুহ ও জেয়ারৎ আমার নছিব হউক।

কাদেরিয়া তরিকার লতিফার বিবরণ

কাদেরিয়া তরিকার লতিফা সমূহেও চিশতিয়া তরিকার মত। তাহা চিশ্‌তিয়া তরিকায় দেখিয়া লইবেন।

এক জরবী জেকেরের নিয়ম

চিশতিয়া তরিকায় উল্লেখিত নিয়মানুসারে ছওয়াব রেছানী করিয়া নিম্নরূপে এক জরুরী জেকের করিবে। 'আল্লাহ' শব্দ

ও গলা হইতে উঠাইয়া মুখ হইতে 'হু' শব্দ ছাড়িবে। মুখ কিঞ্চিৎ খোলাভাবে রাখিবে।

নিয়ত—আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরিকার নেছবত মোতাবেক এক জরুরী জেকেরের ফায়েজ আমার আসুক।

দুই জরবী জেকেরের নিয়ম

'আল্লাহ'' শব্দ কলব হইতে উঠাইয়া 'হু' শব্দ ডাহিন রাগে ও দ্বিতীয়বার কলব হইতে উঠাইয়া 'হু' শব্দ কলবে ছাড়িবে। নিয়ৎ উক্তরূপ, শুধু এক জরবী স্থলে দুই জরবী বলিবে।

তিন জরবী জেকের

প্রত্যেকবার 'আল্লাহ' শব্দ কলব হইতে উঠাইয়া 'হু' শব্দ প্রথমবার ডাইন রাগে, দ্বিতীয়বার বাম রাগে এবং তৃতীয়বার কলবে ছাড়িবে। নিয়ৎ উক্তরূপ. কিন্তু এক জরবী স্থানে তিন জরবী বলিবে।

চারি জর্‌বী জেকের

উক্তরূপ 'আল্লাহ' শব্দ কলব হইতে উঠাইয়া 'হু' শব্দ প্রথমে ডাইন রাণের উপর, দ্বিতীয়বার বাম রাণের উপর, তৃতীয়বার কলবে ও চতুর্থবার সম্মুখের দিকে ছাড়িবে। নিয়ৎ উক্তরূপ। তিন জর্‌বী স্থলে চার জর্‌বী বলিবে। এই জেকের ফরজ ও মগরেবের বাদ এক ঘন্টা করিবে। বিশেষ কোন ওজর থাকিলে আধ ঘন্টা করিতে পারে।

নফি এছবাত পাছে-আনফাছ

কাদেরিয়া তরিকার নফি এছবাত ও পাছ-আন্‌ফাছ চিশ্‌তিয়া তরিকার মত। তাহা চিশতিয়া তরিকায় দেখিয়া লইবেন। নিয়তও সেইরূপ। শুধু চিশ্‌তিয়া তরিকার নেছবৎ স্থলে কাদেরিয়া তরিকার নেছবৎ মোতাবেক বলিবে।

রহমতের ফায়েজ

নিয়ৎ—আমি আমার কলবের তরফ মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার কলব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায়

আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরিকার নেছবৎ মোতাবেক ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহিমু, ইয়া হাইও, ইয়া কাইউম, এই নাম সমুহের রহমতের ফায়েজ আমার কলবে আসে। ইহার পর চিশতিয়া তরিকার নিয়মানুযায়ী দশ লতিফার দশ ছবকে বসিবে। শুধু নিয়তে চিশতিয়া তরিকার পরিবর্তে কাদেরিয়া তরিকার নেছবৎ মোতাবেক বলিবে।

হাকিকাতে ছোলতানান্নাছিরা

নিয়ৎ—আমি আমার কলবের তরফ মোতাওয়াজ্জাহ আছি। আমার কলব হজরত পীর ছাহেব কেবলার কলবের অছিলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জাহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরিকার নেছবত মোতাবেক ছোলতানান্নাছিরার ফায়েজ আমার কলবে আসুক।

হাকিকাতে মাকামাম্ মাহমুদা

নিয়ৎ—উক্তরূপ, শুধু ছবকের নাম পরিবর্তন করিয়া বলিবে।

———

খাছ তাওয়াজ্জোহ ইল্লাল্লাহ

নিয়ৎ—উক্তরূপ শুধু ছবকের নাম পরিবর্তন করিয়া বলিবে। এই মোরাকাবার নিয়ম ও নিয়ত জলী নফি-এছবাতের ন্যায়ই করিবে। কেবল জেকের এইরূপ আস্তে আস্তে করিবে যেন শব্দ নিজ কানে শুনিতে পায়।

পাছে আন্‌ফাছ

কাদেরিয়া তরিকার পাছ-আন্‌ফাছ ও চিশতিয়া তরিকার পাছ-আন্‌ফাছের ন্যায়।

দাওরে কাদেরী

اَللّٰهُ سَمِيْعٌ - اَللّٰهُ بَصِيْرٌ - اَللّٰهُ عَلِيْمٌ - اَللّٰهُ قَدِيْرٌ *

জেকেরের তরতিব—আল্লাহু ছামিউন অন্তরে চিন্তা করিয়া নাভি হইতে ছিনা পর্যন্ত, পুনঃ আল্লাহু বাছিরোন দেলে খেয়াল করিয়া ছিনা হইতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত, পরে আল্লাহু আলীমুন মস্তিষ্ক হইতে খেয়াল করিয়া আছমানের কিনারা পর্যন্ত, পরে আল্লাহু কাদীরোন আছমানের কিনারা হইতে আরশ পর্যন্ত, খেয়ালের সহিত টানিয়া দিবে। পুনঃ আল্লাহু কাদীরোন বলিয়া আরশ হইতে আছমানের কিনারা পর্যন্ত তথা হইতে আল্লাহু আলীমুন

বলিয়া খেয়ালের সহিত মস্তিষ্ক পর্যন্ত আনিবে। মস্তিষ্ক হইতে আল্লাহু বাছিরোন বলিয়া খেয়ালের সহিত ছিনা পর্যন্ত। তথা হইতে আল্লাহু ছামিউন বলিয়া খেয়ালের সহিত নাভি পর্যন্ত আনিবে। এই নিয়মের ফজর ও মাগরের বাদ এক ঘণ্টা বা কমপক্ষে অর্দ্ধ ঘণ্টা জেকর করিবে।

হুজুরী ও মাইয়াতের মোরাকাবা

নিয়ৎ—চিশ্‌তিয়া তরিকার ন্যায়। কিন্তু চিশতিয়া তরিকার নেছবৎ স্থলে কাদেরিয়া তরিকার নেছবৎ বলিতে হইবে। এই মোরাকাবায় বসিয়া আল্লাহু হাজেরী, আল্লাহু নাজেরী, আল্লাহু শাহেদী, আল্লাহু মায়ী, এই কালামের মজমুনের দিকে খেয়াল করিবে।

মাইয়াতের মোরাকাবা

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ۝

ওয়াহুয়া মায়া'কুম আইনামা কুন্‌তুম

পরবর্ত্তী ছবক সমূহ চিশতিয়া তরিকার ন্যায়। কিন্তু নিয়তের মধ্যে চিশতিয়া তরিকার নেছবৎ স্থলে কাদেরিয়া তরিকার নেছবৎ বলিবে।

———

ওজিফার তাৎপর্য

ওজিফা অর্থ নিয়মিত খাদ্য। খাদ্য ব্যতীত শরীর রক্ষা হয়না। শরীরের খাদ্য ভাত, মাছ, সাক-সবজী প্রভৃতি। মানুষকে উহা নিয়মিত খাইতে হয়। অন্যথায় বাঁচিয়া থাকা যায় না। এইরূপ মানুষের আত্মার জন্যও খাদ্য প্রয়োজন। উহা ব্যতীত আত্মাও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। মানুষের আত্মা অতি সূক্ষ্ম, এবং নূরানী পদার্থ। উহা আত্মার ইবাদত, জিক্র এবং নেক কার্য্যে-দ্বারাই জীবিত থাকিতে পারে। উহা ব্যতীত আত্মা অন্ধকার হইয়া যায়। গুনাহ খাতার কাজ ত্যাগ করিয়া নিয়মিত ইবাদত বন্দেগী ও জিক্র ওজিফা বহাল রাখিলে আত্মা জীবিত থাকে, বরং নিয়মিত ওজিফা ও জিক্র দ্বারা আত্মা রওশন হয়। এই জন্যই ওজিফা পাঠ করিতে হয়।

ওজিফা ও জিক্‌রের ফজিলত

জিক্র ও ওজিফার বহু ফজিলত হাদীসে বর্ণিত আছে :—

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে ;—"আমি আমার বান্দার ধারণার অনুরূপ হইয়া থাকি। যখন সে আমার জিক্র করে থাকি তখন তাহার সংগে থাকি। যদি সে একাকী নির্জ্জনে আমার জিক্র করে তবে আমিও তাহাকে ,র্জনে স্মরণ করি। আর যদি সে লোক সমাজে আমার জিক্র রে তবে আমি তাহার চেয়ে উত্তম সভায় তাহার জিক্র করি (ফে.. শতাদের সভায়)

হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে একটি উত্তম আমলের কথা বলিতেছি। উহা তোমাদের আমলের মধ্যে উত্তম কাজ, এবং আল্লাহর নিকট অতি পবিত্র এবং উহা তোমাদের মর্যাদা বহু বৃদ্ধি করিবে। উহা সোনা-রূপা দান করা অপেক্ষাও উত্তম। উহা ময়দানে শত্রুর মোকাবিলায় জিহাদ করা অপেক্ষাও উত্তম। যেখানে তোমরা শত্রুর গর্দান কাট এবং তাহারা তোমাদের গর্দান কাটে। "সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি আমল? হে রাসূলুল্লাহ। তিনি বলিলেন, উহা আল্লাহর জিক্‌র।

হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, "কোন সদকা খয়রাতই আল্লাহর জিক্‌রের চেয়ে উত্তম নয়।"

হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, একদল ফেরেশতা আল্লাহর জিক্‌রকারী লোকদিগকে জমীনে খোঁজ করিয়া ফিরিতে থাকে। যখন তাহারা কোন জিক্‌রকারীকে দেখিতে পায় তখন তাহারা একে অন্যকে ডাকিয়া সমবেত করে এবং তাহারা জেকেরকারীকে জমীন হইতে আসমান পর্যন্ত তাহাদের পাখা বিস্তার করিয়া ঢাকিয়া লয়।

হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জিক্‌র করে এবং যে করে না, তাহাদের তুলনা জীবিত এবং মৃত ব্যক্তির ন্যায়। অর্থাৎ—যে আল্লাহর জিক্‌র করে সে জীবিত এবং যে জিক্‌র করে না সে মৃত্যুর তুল্য।"

রুগ্ন মানুষের যেরূপ পানাহার করার শক্তি থাকে না সুতরাং ক্রমশঃ দুর্বল হইতে হইতে এক সময় মরিয়া যায়। তেমনি আত্মাও রুগ্ন হইলে উহা ইবাদত ও জিকির আজকার করিতে মোটেই

উৎসাহ বোধ করে না। ফলে এক সময় আত্মা মৃত্যুর ন্যায় দুর্বল হইয়া পড়ে, ফলে গুণাহের কার্যে আর কোন ভয় থাকে না। আত্মা একেবারে অন্ধকার হইয়া পড়ে, এই অবস্থা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আত্মার এই দুর্গতি না হয় এই জন্যই নিয়মিত ভাবে আল্লাহুর জিক্‌র এবং ওজিফা পাঠ করতঃ আত্মাকে সঞ্জীবিত এবং শক্তিশালী রাখা দরকার।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—এক সাহাবী হজরত (দঃ)-কে বলিলেন—"হে রসূলুল্লাহ! সওয়াব ও নেকীর অনেক কাজই রহিয়াছে, আপনি আমাকে এমন কোন আমল বাতলাইয়া দেন, যাহা আমি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে পারি।" হজরত (দঃ) বলিলেন, তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর জিক্‌র দ্বারা সজীব থাকে।

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে—এক সাহাবী রসূলুল্লাহ্কে বলিলেন, হে রসূলুল্লাহ। সবচেয়ে উত্তম আমল কি? হজরত (দঃ) বলিলেন—"উত্তম আমল হইতেছে এই যে, আল্লাহুর নাম মুখে থাকিতে থাকিতে যেন তোমার মৃত্যু হয়।

সাহাবী মা'য়াষ (রাঃ) বলিলেন—হে রসূলুল্লাহ! আপনি আমার জন্য কিছু উপদেশ দিন। হজরত (দঃ) বলিলেন—সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর, সর্বদা সর্বস্থানে আল্লাহ্কে জিক্‌র কর, কোন মন্দ কাজ হঠাৎ করিয়া বসিলে আল্লাহর নিকট কায়মনে তওবা কর, পুশিদা গুণাহের জন্য পুশিদা তওবা এবং প্রকাশ্য গুণাহের জন্য প্রকাশ্য তওবা।"

হজরত (দঃ) বলিলেন—আল্লাহর আজাব হইতে নাজাত লাভের জন্য আল্লাহর জিক্‌র অপেক্ষা উত্তম কোন আমল নাই।

একটি হাদীসে উল্লেখ আছে—যদি এক ব্যক্তি আছল ভরা টাকা-পয়সা থাকে এবং সে উহা অনবরত দান করিতে থাকে এবং যদি শুধু আল্লাহর জিক্‌র করে সে উক্তদানকারীর অপেক্ষা উত্তম হইবে।

হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—তোমরা যখন বেহেশতের বাগানে বিচরণ কর, তখন উত্তমরূপে বিচরণ কর। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিল, বেহেশতের বাগান কি? হজরত বলিলেন—উহা জিক্‌রের বৈঠক।

জেক্‌র ও ওজিফা

দেলের শয়তান বিতারিত করে

হজরত (দঃ) বলিলেন—প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দুইটি কোঠা আছে। একটিতে ফেরেশতা থাকে—আরেকটিতে শয়তান। লোকটি যখন আল্লাহর জিক্‌রে লিপ্ত হয় তখন শয়তান পিছে হটিয়া যায়, আর যখন আল্লাহর জিক্‌র হইতে মনোযোগ হারায় তখন শয়তান তাহার চক্ষু মানুষের সকলের উপর স্থাপন করে, এবং ধীরে ধীরে ওস্‌ওয়াসা দিতে থাকে।

ওজিফা তরককারীদের আফসুস

বেহেশতবাসীদের কোন কিছুতে আফসুস, থাকিবে না—কেবল আল্লাহর জিক্‌র ও ওজিফা ব্যতীত যে সময়টি গত হইয়াছে

উহার জন্যই আফসুস হইতে থাকিবে। অর্থাৎ বেহেশতে নেক কাজের বিশেষ করিয়া আল্লাহর জিকুর আজাবের বিনিময়ে অফুরন্ত সওয়াব ও নেয়ামত দেখিয়া তাহারা এতই মুগ্ধ হইবে যে, যদি তাহারা দুন্‌ইয়াতে সময় ব্যয় না করিয়া আরও বেশী আল্লাহর জিকুর করিত—তবে আরও অধিক নেয়ামত লাভ হইত। এই একটি বিষয় তাহাদের আফ্‌সুস হইবে।

গণনা করিয়া তসবীহ পাঠ

হজরত (দঃ) সাহাবীদিগকে ইরশাদ করিতেন—তাহারা যেন আল্লাহু-আকবর, সুব্‌হানাল মালেকিল কুদ্দুস এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু গণনা করিয়া পাঠ করে। কেননা, কেয়ামতের দিন যে অংগুলির সাহায্যে তসবীহ গণনা করিয়াছে উহা ডাকা হইবে এবং উহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে যে, কত সংখ্যক তসবীহ পাঠ করিয়াছে।

অন্য একটি হাদীসে আছে—হজরত (দঃ) স্ত্রী লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তসবীহ (সুবহানাল্লাহ) তক্‌দীস (সুব্‌হানাল মালিকুল কুদ্দুস) ও তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহে) অবশ্য পাঠ করিবে, ইহাতে কখনও অমনোযোগী হইবে না—যেন তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়া যাও।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর তসবীহ পাঠ

হজরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর বর্ণনা করেন—আমি রসূলুল্লাহকে ডাহিন হাতের অংগুলিতে তসবীহ পাঠ গণনা করিতে দেখিয়াছি।

হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—একাকী সফরকারীগণ অগ্রগামী হইয়া গেল। সাহাবীগণ বলিলেন—তাঁহারা কে? হজরত (দঃ) বলিলেন, অধিক সংখ্যায় আল্লাহর জিকরকারী নারী। তিনি আরও বলিয়াছেন—আল্লাহর জিকর গুণাহের বোঝা হালকা করিয়া থাকে, সুতরাং তাহারা কিয়ামতের দিন আল্লার দরবারে হালকা হইয়া উঠিবে।

ওজিফা নিয়মিত পাঠ

জিক্‌র ও ওজিফার সম্পর্কে আরও বহু হাদীস বর্ণিত আছে :—ইহার সওয়াব ও ফজিলত বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এইজন্য নেককার ব্যক্তি, বোজর্গানে দ্বীন, আল্লাহর ওলী-আওলিয়া কোন না কোন ওজিফা পাঠ করিবেন। কেননা, উহা ব্যতীত রুহ তাজা ও লজ্জত হয় না।

ওজিফা যথা সম্ভব নিয়মিত পাঠ করিতে হয়। প্রত্যহ কোন নির্দিষ্ট সময়ে ওজিফা পাঠ করিবে।

ফজরের নামাজের বাদ, জোহরের বাদ অথবা মাগরিবের বাদ কিছু সময় ওজিফা পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লইবে। কখনও উহা কামাই দিবে না। যদি কখনও কামাই হইয়া পড়ে তবে অন্য সময় উহা পুরণ করিয়া লইবে।

সর্বদা ওজুর সংগে একমনে ওজিফা পাঠ করিবে।

ওজিফা পাঠের পর উহার সওয়াব নবী-ওলী-আওলিয়া এবং দুনইয়ার মৃত সব মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ, এবং এবং নিজ মৃত আত্মীয়

এগানা পিতা-মাতাগণের রুহের প্রতি বখ্‌শেশ করিয়া দিবে। অতঃপর নিজের গুনাহ খাতার জন্য বখ্‌শেশ প্রার্থনা করিবে। ইহা নিয়মিত আমল করিলে অশেষ সওয়াবের অধিকারী হইবে এবং নিজ আত্মা ক্রমশঃ উজ্জল হইবে এবং নেকীর আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে।

আওলিয়াগণের ওজিফা

প্রত্যেক ওলী-আওলিয়া নিয়মিত কোন না কোন ওজিফা পাঠ করিতেন। বর্তমান দুনইয়াতে যাহারা বিদ্যমান আছেন, সেই সকল ওলী আওলিয়া ও পীর বুজর্গ নিয়মিতভাবে কোন না কোন ওজিফা পাঠ করেন। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগই তেলাওয়াতে কোরআন কেহবা প্রত্যেহ সমগ্র কোরআন এক খতম পাঠ করেন। কেহ বা তিনদিনে এক খতম করিতেন। কথিত আছে—ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এশার বাদ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত একখতম কোরআন পাঠ করিতেন। এইরূপ কেহবা সূরা ইয়াসিন, এবং কোরআন শরীফের মর্যাদা ও অধিকতর ফজিলত পূর্ণ সূরা নিয়মিত পাঠ করিতেন।

ইহা ব্যতীত নিজ নিজ পীর ও ওস্তাদের শিক্ষানুযায়ী ইস্‌মে জাত অর্থাৎ আল্লাহের নামের জেকর ও কলেমা তৈয়্যেবার জিকর করিতেন।

সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনুদ্দীন আজমিরী (রহঃ) বিখ্যাত ওলী ছিলেন। তাহার নিয়মিত ওজিফা অনেক কিছু ছিল—তন্মধ্যে সূরা ফাতেহা, সূরা বাকারার কতিপয় আয়াত, তওবা ইস্‌তিগফার,

লা-হাওলা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, সূরা ইয়াসিন, রসূলে করীমের নিরানব্বই নাম, আয়াতুল কুরসী প্রভৃতি বহু কিছু পাঠ করিতেন।

হজরত বড় পীর গওছে আজম মহীউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ) নিয়মিত ওজিফা পাঠ করিতেন, তন্মধ্যে কোরআন পাক ও জিকর এ দরূদ বেশী পাঠ করিতেন। বস্তুতঃ ওজিফার বিষয় বস্তুই হইল কোরআনের অংশ বিশেষ, নির্দিষ্ট সূরা জিকরে ই-লাহী এবং দরূদ শরীফ। ইহা সকল ওলী আওলিয়ারই নিয়মিত ওজিফা ছিল। তবে উহার মধ্যে পার্থক্য ছিল। কোরআনের নির্দিষ্ট সূরা সকলেই পাঠ করিতেন।

ওজিফার সওয়াব রেছানী

ওজিফা পাঠের পর উহার সওয়াব হজরত রসূলে করীম (দঃ) চারি আসহাব, পাক বিবিগণ, তামাম সাহাবী, শহীদানে বদর, শুহুদে কারবালা, ইমাম মুজাহেদ-মুহাদ্দেস, ওলী-আওলিয়া বিশেষ করিয়া গওছে আজম আবদুল কাদের জিলানী, খাজা শাহাবউদ্দীন নক্সবন্দী, খাজা গরীব নওয়াজ মুইনুদ্দীন চিশতী, শেখ ছৈয়দ আহমদ ছিরহিন্দী, মুজাদ্দিদ আল্‌ফি ছানী, এবং সব আলেম ওলামা নিজ পীর মুরশিদ এবং নিজ পিতা-মাতার (মৃত হইলে তাহাদের রূহের প্রতি সওয়াব রেছানী করিবে)। তৎপর নিজ গুণাহ খাতা বখশেশ চাহিবে। এইভাবে নিজ মকসূদ প্রার্থনা করিবে। আল্লাহ রহম করিবেন।

দোওয়া-মোনাজাতের ফজিলত ও নিয়ত

দুনইয়া আখেরাতে সর্বপ্রকার ভালাই না চায় এমন কেহই নাই। আল্লাহ তায়ালা দুনইয়া ও আখেরাতের ভালাইর জন্য বহু উপায় রাখিয়াছেন। যাহাতে হাজতমন্দ লোকেরা সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া দুনইয়া ও আখেরাতের সব মকছুদ লাভ করিতে পারে। সেই জন্য দোওয়া মোনাজাতের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে।

কোরআন শরীফ এবং হাদীছ শরীফে মোনাজাত করার জন্য বার বার তাগিদ আসিয়াছে।

যথা :—১। আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদে বলিয়াছেন :— তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি সাড়া দিব।

২। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন। দোওয়া হইতেছে বড় এবাদত।

৩। হজরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন : যে দোওয়া করিতে শিখিয়াছে- তাহার জন্য দোওয়া কবুলের দরজা খুলিয়া গিয়াছে। আর এক জায়গায় বলা হইয়াছে যে,—যে দোওয়া করিতে জানে, তাহার জন্য বেহেশতের দরজা খোলা হয়। অন্য জায়গায় আছে যে—তাহার জন্য রহমতের দরজা খোলা হয়।

৪। তিনি আরও বলিয়াছেন যে—মানুষ কত কিছুই প্রার্থনা করে, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার চেয়ে আর কিছুই অধিক প্রিয় নয়।

দুনইয়ার অভাব অভিযোগের জন্যও আল্লাহর নিকট মোনাজাত করিতে বলা হইয়াছে।

৫। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন : দোওয়া দ্বারা তক্‌দীর পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়।

৬। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—চেষ্টা ও তদবীর দ্বারা বালা দুর হয় না, কিন্তু যে বালা নাযেল হইয়া গিয়াছে তাহার জন্যও দোওয়া উপকারী! আর যদি উহা নাযেল হইতে থাকে এবং অন্যদিক দিয়া দোওয়া করা হইতে থাকে তবে দোওয়া এবং বালার সঙ্গে কেয়ামত পর্যন্ত লড়াই হইতে থাকে।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, দোওয়া করা সকল চেষ্টা তদবিরের চেয়ে উপকারী। ইহাও জানা যায় যে, মছিবত আসিয়া গেলেও দোওয়া দ্বারা উহা রদ হইয়া থাকে। দোওয়া কবুল হওয়ার আলামত এই যে, বালা দুর হইয়া যাইবে। যদি দোওয়া দ্বারা বালা-মছিবত দুর না হয় তবুও দোওয়া সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করা চাই না।

হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—আল্লাহর নিকট দোওয়ার ন্যায় আর কোন সম্মান ও মর্যাদার জিনিষ নাই!

৭। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—বিপদের সময় আল্লাহর দরবারে দোওয়া পৌঁছাইতে হইলে তাহার উচিত যে, সে শান্তির সময় যেন আল্লাহর নিকট বেশী দোওয়া করিতে থাকে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, মছিবতের সকল সময় দোওয়া করিলে উহা আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়া থাকে।

৮। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—দোওয়াতে কোনও সময় নিরাশ হইতে নাই। কেননা দোওয়া নষ্ট হয় না।

৯। হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—দোওয়াতে মুসলমানের জন্য হাতিয়ার স্বরূপ, দ্বীনের স্তম্ভ স্বরূপ এবং আছমান জমীনের নূর স্বরূপ।

১০। হজরত (দঃ) একবার এক বিপদগ্রস্ত কওমের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি বলিলেন, ইহারা আল্লাহর নিকট কেন দোওয়া করে না ?

১১। হজরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি দোওয়ায় মনোযোগী হয়, তাহাকে আল্লাহ বিফল করেন না। হয়তো তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে না দেওয়া হউক, কিংবা তাহার জন্য জমা করিয়া রাখা হউক।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, দোওয়া অবশ্যই কবুল হয়, তবে উহা বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে।

মোট কথা, আল্লাহর নিকট দোওয়া করিলে উহা ব্যর্থ হয় না। কখনও প্রার্থনা অনুযায়ী ফল লাভ হইয়া থাকে আর কখনও উহা আল্লাহর দরবারে জমা হইয়া থাকে।

১২। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ লোকই দোওয়া করা হুইতে গাফেল হইয়া থাকে। পাঞ্জেগানা নামাজের পরে যে সামান্য একটু হাত উঠান হয় উহাও বুঝিয়া না বুঝিয়া কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি আদায় করা হয়। লোকে বেশী বিপদে পড়িলে তখন হয়তো কোন উপায় না দেখিয়া বাজে ওজিফা

ও আমল ইত্যাদি করিতে থাকে। উহা ঠিক শরীয়ত মত হইতেছে কিনা তাহার কোন ঠিক থাকে না।

কিন্তু আল্লাহ্ ও তদীয় রছুল দোওয়া করার জন্য যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন অন্যান্য দোওয়া সেইরূপ ফল লাভ হয় না।

সেই জন্য দোওয়ায় সাধারণ ত্রুটিগুলি এখানে উল্লেখ করা হইল।

১। নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত দোওয়া করা।

২। আল্লাহ ও রছুলের শিক্ষা দেওয়া দোওয়া ব্যতীত বাজে দোওয়া করা।

৩। আগ্রহ এবং মনোযোগ ব্যতীত ও অনিচ্ছার সঙ্গে দোওয়া করা।

৪। দোওয়া কবুল হওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হওয়া।

৫। দোওয়ার ফলাফলের জন্য অধীর হওয়া এবং ফল লাভে বিলম্ব হইলে দোওয়া করা ছাড়িয়া দেওয়া ইত্যাদি।

৬। এই সকল ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এখানে কোরআন শরীফের যে সকল দোওয়া নাযেল হইয়াছে উহা লিখিয়া দেওয়া হইল। উহার অর্থের দিকে খেয়াল করিলে উহা কবুল হওয়া সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। বিশেষতঃ উহাতে মানুষের সারা জেন্দেগী ও আখেরাতে সকল বিষয়ই উক্ত রহিয়াছে। সেই জন্য আল্লাহর দরবারে মোনাজাতের জন্য আল্লাহর শিখানো ভাষাই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

নিজে নিজে মোনাজাত তৈয়ার করিতে গেলে উহাতে অনেক সময় হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। যেমন এক ছাহাবী আল্লাহর নিকট ছবরের জন্য দোওয়া করিয়াছেন। হুজরত (দঃ) শুনিয়া বলিলেন। ইহাতে তো আরও বালার জন্যই দোওয়া হইয়াছে।

সুতরাং দোওয়ার জন্য পবিত্র কোরআন শরীফে যে ভাষা এবং শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, উহাই সব চেয়ে নিরাপদ এবং উত্তম। উহার অর্থও বুঝা দরকার।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

মোঃ শামছুল হক
প্লাম্বার
করিম চেম্বার
৯৯, মতিঝিল, বা/এ,
ঢাকা—১০০০